সূচী।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন।

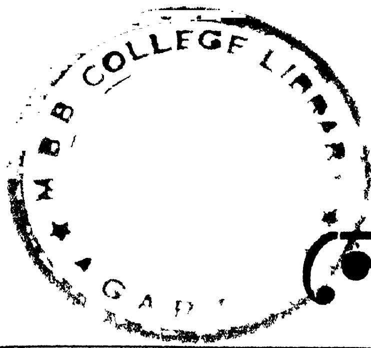
আমরা যথাসময়ে 'নোয়াখালী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত করিতে পারি নাই, তজ্জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আর এই বিলম্ব হেতু যদি "নোয়াখালীর" কলেবর [illegible] সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে সকলের অনুগ্রহ [illegible] কৃপা দৃষ্টি লাভে আমাদের অধিকার আছে, এ কথা বলিতে পারি। যাহা হউক আগামী বৈশাখে আমরা দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করিব মনে করিয়াছি। তৎপর শ্রাবণ ও কার্ত্তিক মাসে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য প্রবন্ধাদি আগামী ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। তাহা না হইলে প্রকাশে বিলম্ব হয়। সেই কারণে এবারও আমরা অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতে পারি নাই। যাঁহারা নোয়াখালীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন কেবল মাত্র ইংরেজী গ্রন্থাদির অনুবাদে মনোনিবেশ না করিয়া প্রচলিত জনশ্রুতি, প্রবাদ বাক্য ও সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং যে সকল বিবরণ ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ার অথবা ষ্টাটিসটিকেল একাউণ্ট অব্ বেঙ্গল প্রভৃতি ইংরেজী পুস্তকাদিতে লিপিবদ্ধ

হয় নাই, এমন সকল বিষয় অনুসন্ধানপূর্ব্বক সংগ্রহ করেন ও তৎসঙ্গে স্থান বিশেষের ফটো পাঠাইলে আমরা মুদ্রণ করিতে চেষ্টিত হইব। স্থানাভাবে অনেক প্রবন্ধ এবারে প্রকাশিত হয় নাই। সকলের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে ও গ্রাহক সংখ্যা আশানুরূপ হইলে আমরা এই পুস্তিকার পত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে পারি। নোয়াখালীর বদান্য ভূমিপতিগণ, হিতকাঙ্খী সামাজ নেতৃগণ, ও সুশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় যদি সামান্য মূল্যের বিনিময়ে প্রতি-বৎসর এই পুস্তিকা গ্রহণ করেন এবং যাহাতে উত্তরোত্তর ইহার উন্নতি ও পরিপুষ্টি হয়, তদুদ্দেশ্যে সর্ব্বদা সদুপদেশ প্রদান করেন তবে আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি, অচিরকাল মধ্যেই আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। আমাদের কল্পনা ও কার্য্যের মধ্যে এখনও অনেক ব্যবধান রহিয়াছে। নোয়াখালীর শিক্ষিত সন্তানগণ এই দূরত্ব অপনীত করিবেন। আমাদের আদর্শ যদিও অনেক উচ্চে, কিন্তু তাহা যদি উজ্জ্বল সুস্পষ্ট ও নিরন্তর নেত্র-পথবর্ত্তী হয়, তবেই তাহা লাভ করিবার জন্য আমাদের মধ্যে চেষ্টা জাগিয়া উঠিবে।

আজ এই নব বসন্তের সমাগমে যাঁহারা অরুণ কিরণ কিরিটিনী "নোয়াখালীর" নবকলেবর নানা প্রবন্ধাভরণে ভূষিত করিয়াছেন, নানা কবিতা কুসুম মালায় সজ্জিত করিয়াছেন, যাঁহারা ভক্তি-পূত চিত্তে মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিতে সমাগত হইয়াছেন,— যাঁহাদের উৎসাহ মাত্রে আমাদের কর্ম্ম প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধা হইয়াছে, অনেক আশায় আমরা যাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি তাঁহাদের সকলকেই আমরা সসম্ভ্রমে প্রণাম করি। ইতি।

বিনীত —
বারাপাঙ্ক, নোয়াখালী।

Printed by T. C. Dass at the CHERRY PRESS LD 251, Bowbazar street
Published by RAJKUMAR CHAKRAVARTY, 96, Harrison Road,
CALCUTTA



নোয়াখালী।

১ম বর্ষ | মাঘ—১৩২২ | ১ম সংখ্যা

মঙ্গলাচরণ।

(১)

"যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিভান্তি স্থিতানিচ,
যত্রৈবোপশমং যান্তি তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ।"

যে উপাদানকারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভূত-ভৌতিক সকল আবির্ভূত হইয়াছে, যাহাতে অবস্থান করিতেছে, এবং যাহাতে বিলীন হইবে, সত্যস্বরূপ সেই পরমাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

(২)

গ্রন্থারম্ভে প্রবৃত্ত আমাদের বাক্য সকল মনে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং মনঃবাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। বাঙ্‌মন পরস্পর অনুগৃহীত হইলেই আমরা আমাদের অভীপ্সিত গ্রন্থ, সম্যক্‌রূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব। হে বাক্য ও মন। তোমরা আমাদের জন্য সদর্থ সকল আনয়ন কর। গ্রন্থ ও গ্রন্থার্থ সকল যেন আমাদিগকে পরিত্যাগ না করে। সংকল্পিত এইজীব-সেবারূপ-শিবসেবা-গ্রন্থ প্রচার কার্য্যে যেন আমরা সমুচিত শক্তি ও সময়দান করিতে পারি। কদাচ যেন আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত পথে না চলি ও চালিত না হই। যাহা করি, তাহা যেন বিবেচনা পূর্ব্বকই করিতে পারি। আমাদের লক্ষ্যীভূত জীব সেবারূপ-শিবসেবা আমাদিগকে রক্ষা করুক্।

(৩)

"শরীর-বাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্মপ্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং পঞ্চৈতে তস্যহেতবঃ॥"

* গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা –

"মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি।"

সাংখ্যদর্শন, ৫ম অ, ১ম সূ।

কায়মনোবাক্যে মনুষ্য যে কর্ম্ম আরম্ভ করে, তাহা ন্যায্যই হউক বা বিপরীতই হউক, তাহার হেতু দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি এই পাঁচটী। আমরা কায়মনোবাক্যে যে

কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা ন্যায্য কি বিপরীত, জানিনা। কেননা, মানুষ যখন যে কার্য্যই করিতে যায়, তাহাই সে ন্যায্য বলিয়া মনে করে। আমরা যখন ক্রোধবশতঃ বিষম অনর্থ ঘটাইয়া থাকি, তখন তাহাও ন্যায্য বলিয়াই মনে করি। তাহা না হইলে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না। সুতরাং মানুষ আত্মবুদ্ধিতে যখন যাহা করে, ন্যায্য ভাবিয়াই করে। অন্যায্য হইলেও, আমাদের কাছে ইহা ন্যায্য বলিয়াই বোধ হইতেছে; এবং সেজন্য আমাদের এই উপস্থিত কার্য্য, এখন আমাদের কাছে অতিশয় প্রিয় ও ন্যায্য। অতএব হে সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন-পরমেশ্বর পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্ব কর্ম্মের হেতু, আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধিতে এমন শক্তি প্রদান কর, যাহাতে আমরা আমাদেব এই অতি প্রিয় কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিতে পারি। সূর্য্যোদয়ে ধ্বান্ত বিনাশের ন্যায় বিঘ্ন সকল ধ্বংস হউক্। আমাদের এই কর্ম্ম বিপরীত না হইয়া সত্য সত্যই ন্যায্য:হউক। এবং তোমার কৃপায় সত্য সত্যই আমাদের এই কর্ম্ম পরম মঙ্গল প্রসব করুক্।

(৪)

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"

"ভূত ভৌতিক নামরূপ যাবৎ কিঞ্চিৎ ইদংশব্দবাচ্য জগৎ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মে অবস্থান করিতেছে এবং ব্রহ্মে লীন হইতেছে। উপাসক, এই ধ্যানে শান্ত অর্থাৎ রাগ-দ্বেষশূন্য হইয়া উপাসনা করিবে।"

এই জগতের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র তৃণ হইতে মহামহীরুহ পর্য্যন্ত, অতি ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে মহা-মহীধর পর্য্যন্ত, গোষ্পদ হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত, পিপীলিকা হইতে হস্তী পর্য্যন্ত, খদ্যোত হইতে মহা জ্যোতিষ্কসূর্য্য-গোলোক পর্য্যন্ত, যাহাকিছু দেখি, সবই তুমি, সর্ব্বত্রই তুমি, সবই তোমার অনন্ত সত্তার বিকাশমাত্র। কোথাও তুমি বৃহৎ, কোথাও তুমি ক্ষুদ্র, কোথাও তুমি স্থূল, কোথাও তুমি সূক্ষ্ম, অথচ তোমার অনুভূতি—জ্ঞানীর কাছে সর্ব্বত্রই সমান! শোক, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, আলোক, অন্ধকার, জ্ঞান, অজ্ঞান, উত্থান, পতন, উদ্যম, অনুদ্যম, সবই তুমি। যে আমরা, যাহা করিতেছি, যাহা করিবার ইচ্ছা করিতেছি, যাহা করিতে যাইয়া বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি, যাহাতে সফলকাম হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছি, সেই আমরা, সেই কর্ত্তব্য, সেই বিফলতা-সফলতা, সবই তুমি। সবই যদি তুমি হইলে, তবে এ ক্ষুদ্র উদ্যমও তোমা-ভিন্ন নহে। এই উদ্যমদ্বারা যদি আমরা একটী পিপীলিকারও মঙ্গল সাধন করিতে পারি, তবে তাহা তোমারই সেবা করা হইবে। যদি আমরা এই উদ্যমে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়া মঙ্গলযুক্ত হইতে পারি ও চিত্তে একটুকুও সুখানুভব করিতে পারি, তবে সেই সফলতা, সেই মঙ্গল, সেই সুখ প্রভৃতি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তুমি-রূপেই পর্য্যবসিত হইবে। যদি এই উদ্যমে বিফলতা আসে, যদি একটী তৃণেরও মঙ্গল করিতে না পারি, এবং তজ্জন্য একটুকুও সুখ না পাইয়া কেবল দুঃখেরই ভাগী হই, তবে তাহাও তুমি-রূপেই পর্য্যবসিত

হইবে। সফলতা, বিফলতা, সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, সবই যদি তুমি হইলে, তবে আর আমাদের গর্ব্ব বা ভয় কি? সফলতায় আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই, বিফলতায়ও আমাদের ভয় বা দুর্ণামের কোন কারণ নাই। তোমার বিবর্ত্ত আমরা, তোমার সেবার জন্য অগ্রসর হইতেছি, সুতরাং ফলাফল তোমারই, ফলাফল তুমিই। তোমার ইচ্ছায়, তোমার জন্য, তুমি-স্বরূপ আমরা যাহা করিতেছি, তাহার ফলাফল ভোগও তোমারই হইবে। জানি, তোমাতে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল নাই; স্থূল দৃষ্টিতে আমরা জগতে যে অসংখ্য অমঙ্গল লক্ষ্য করিতেছি, তাহা মঙ্গলেরই পূর্ব্বরূপ মাত্র। কিন্তু মোহ বশতঃ আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। অতএব হে মঙ্গল-স্বরূপ! তুমি যে আমাদের সংকল্পে মঙ্গল-ধারারূপে বর্ষিত হইতেছ, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। তাই হে মঙ্গলাত্মক! তোমাকে মঙ্গলাচরণে মনে পড়িয়া গেল।

(৫)

আকাশে তারা ফুটে, আবার তাহাতে মিলাইয়া যায়। জলে বুদ্বুদ্ উঠে এবং ক্ষণকাল মাত্র অবস্থিতি করিয়া জলেই আত্মগোপন করে। এইরূপে এজগতে অহোরাত্র কত কি ফুটিয়া উঠিতেছে. আর মিলাইয়া যাইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? তারকা সারারাত্রি ফুটিয়া থাকে। জল-বুদ্বুদ্ উৎপত্তির পরক্ষণেই মিলাইয়া যায়। যাহার যেমন প্রয়োজন, সে তেমনি ভাবে তাহা নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। তারকার সারারাত্রি থাকার প্রয়োজন, তাই সে সারারাত্রি থাকে, আর বুদ্বুদের অল্পক্ষণ মাত্র থাকার প্রয়োজন, তাই সে অল্পক্ষণ থাকে। বিনা প্রয়োজনে, কোথাও কাহারও অস্তিত্ব মাত্রের সম্ভব হয় না, ও হইতে পারে না। আবার প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে কেহ কখনও ক্ষণমাত্র অবস্থান করে না। ইহাই সৃষ্টির রহস্য, ইহাই প্রলয়ের গূঢ় তত্ত্ব।

(৬)

বাসনাই সৃষ্টির আদি জননী। বাসনা যদি না থাকিত, তবেত সবই সেই নির্ব্বিকার নির্গুণ পরমাত্ম-স্বরূপেই অবস্থিত থাকিত। বাসনাতেই তারকা ফুটে, বুদ্বুদ্ উঠে; আবার ভীমকায় গগণস্পর্শী অতিকায় ধরাধরেরও উৎপত্তি হয়। ছোট বড় সকলেরই জনয়িত্রী বাসনা। সেই বাসনাই আজ ক্ষুদ্র একটী তারকা বা বুদ্বুদের মত আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-কলেবর সৃষ্টি করিতে বসিয়াছে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে তারকার ন্যায় দীর্ঘ রজনী অবস্থান করিয়া কোন মঙ্গলময় সুপ্রভাতের অবতারণা করিয়া বা দেখিয়া সে অস্তমিত হইবে, তাহার জন্ম লাভের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। আর যদি জল বুদ্বুদের ন্যায় অল্পক্ষণ থাকাই তাহার প্রয়োজন হয়, তবে সে তাহার মত অল্পক্ষণেই অনন্তে মিশিবে, তাহাতেও তাহার জন্ম লাভের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। ইতি—

শিবম্।

শ্রীঅন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি,

ভূমিকা।

'আত্মানং জানীহি' এই ঋষি-বাক্য আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ। আধ্যাত্মিক ভাব, দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্ম্মজগত এই সকল ছাড়িয়া দিয়া সাংসারিক, সাধারণ ও সরল কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেও আমরা এই উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। বাহিরে যাহা কিছু লাভ করিনা কেন নিজেকে না জানিলে, সে সমস্তই বৃথা। সকলের মধ্যেই স্বভাবতঃ উন্নতির আকাঙ্খা আছে; কিন্তু সকলেই ত উন্নতি লাভ করিতে পারেনা;—তাহার কারণ আত্ম-জ্ঞানের অভাব। এক্ষণে অনেকেই আত্ম-জ্ঞানকে দর্শন-শাস্ত্রের একটা গভীর তত্ত্ব মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সংসারে সকলেই অর্থ, বিদ্যা, যশঃ, ক্ষমতা, সম্মান প্রভৃতি লাভের জন্য যত্নশীল হয়; কিন্তু আত্ম-জ্ঞান-সম্পত্তি সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসিদলের নিমিত্ত রিজার্ভ্ গাড়ীর মত আলাদা হইয়া বহিয়াছে। সে দিকে কেহ আর যায়না। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন; –

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ
কস্যত্বং বা কুত আয়াত
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

অনেকেই মনে করেন ইহা বৈরাগ্যের উপদেশ—স্ত্রীপুত্র কেহ কারো নয়, সংসার অসার, এই সকল ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কিন্তু এই উপদেশের অর্থ বাস্তবিক তাহা নহে। যিনি ঘোরতর সংসারী, যিনি আপনার পত্নী পুত্রের মায়ায় বদ্ধ হইয়া নিত্য তাহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করেন তিনিও এই উপদেশই পালন করিতেছেন। "তত্ত্বং চিন্তয়" আর "অত্মানং জানীহি" একই কথা। আজকাল যে বিশ্ব-প্রেমের কথা শোনা যায়, তাহার অঙ্কুর পত্নী-পুত্রের প্রেমে। এই একটী ক্ষুদ্র শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য গার্হস্থ্য-প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ-প্রীতি, স্বদেশ-ভক্তি, বিশ্ব-প্রেম পর্য্যন্ত সকল প্রেমের বিকাশ, পরিস্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তির একমাত্র সংক্ষিপ্ত উপায় বলিয়া দিয়াছেন "তত্ত্বং চিন্তয়"—আত্ম-জ্ঞান লাভ কর; আত্মানং জানীহি"। নিজের পরিজনবর্গকে জানিতে হইবে, নিজের সমাজ, নিজের দেশ এই সকল চিনিতে হইবে, তাহা না হইলে আমার উপার্জ্জিত অর্থ, আমার কষ্ট-লব্ধ বিদ্যা, আমার যশঃ, প্রতিপত্তি এ সমস্তই সুখের নিদান না হইয়া অশেষ দুঃখজনক হইবে। আজকাল আমাদের দেশে অনেকেই নানা বিদ্যার অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াছেন। সাহিত্য-বিজ্ঞান-গণিত-দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতগণ আমাদের সমাজে আছেন। ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব বিদ্যায় পারদর্শী, বিচিত্র শিল্প-কলায় অভিজ্ঞ, অর্থ নীতি-ব্যবহারশাস্ত্র বিশারদ বহুতর ব্যক্তিগণ আমাদের দেশে অবস্থান করিতেছেন,—কিন্তু তাহাতে কি

হইয়াছে? দেশের ত কোন উন্নতি হয় নাই। সকলেই একথা স্বীকার করিবেন। রংএর পাতলা বার্ণিশ উঠিয়া গেলেই যেমন লোহায় মরিচা পড়িতে আরম্ভ করে; তেমনি কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিদ্যা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—আমরা নিজের দেশকে চিনিনা, নিজের দেশের কোন খবরই রাখিনা। পরীক্ষায় পাশ করা হইয়া গেলেই উকীলি ডাক্তারী হাকিমি মাষ্টারী কেরাণীগিরি প্রভৃতির জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাই;—তারপর যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনে এখনও মাতিয়া আছেন, তাঁহারা বড় জোর ষ্টেশনারীদোকান খুলিয়া এণ্ড কোং উপাধি গ্রহণ করেন। দেশের বাহিরের অবস্থা ত এই। উকীল আইনের প্যাঁচ পাকাইতেছেন, নূতন রোগের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার অমুকের পেটেণ্ট ঔষধ বাহির হইতেছে, মাষ্টারেরা ফাঁকি বিস্তার উদ্ভাবন করিতেছেন আর কেরাণীরা 'উপরি' পাওনার জন্য হাত পাতিয়া রহিয়াছেন। অবশ্য এইজন্য কেহই নিন্দনীয় নহেন, কারণ সকলেরই ত উদর-চিন্তা, পরিবার-পোষণ প্রভৃতি কর্ত্তব্য পালন আছে। তবে এত করিয়াও আমদের অভাব যায়না কেন,—আমাদের হাহাকার ঘুচেনা কেন, তাহার কারণ আমরা নিজকে জানিনা। বিজ্ঞান অথবা দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া ওকালতী করা দোষের নহে, কিম্বা কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ডিপুটীগিরী করাও দোষের নহে, যদি আমাদের আত্ম-জ্ঞান থাকে, যদি আমরা নিজের দেশকে জানি। তাহা হইলে ওকালতী অথবা ডিপুটীগিরি করিয়াও আমাদের বাহিরের উপার্জ্জিত জ্ঞান আমরা যথার্থভাবে প্রয়োগ করিতে পারি।

বাস্তবিক আত্ম-জ্ঞান-প্রতিষ্ঠার জন্যই বাহিরের বিস্তার প্রয়োজন। বাহিরে ও ভিতরে সংযোগ-স্থাপন না হইলে, কখনই প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হয় না। আজ কাল আমাদের দেশে ভদ্র-লোক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতেই সমাজে সর্ব্বনাশের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। সাধারণ কৃষকেরা দেশের কথা জানে; দেশের মাটী, জল, গাছ, ফল প্রভৃতির বিষয়ে তাহারা দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভদ্র লোকেরা এ সব কিছুই জানেন না; তাঁহারা পানামা কেনেল, জারমেন যুদ্ধ, আমেরিকান রিপবলিক্ নিহিলিষ্ট ও গ্রেসিয়ার প্রভৃতি লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। এই দুই দলে সংযোগ না থাকাতে ফল হইয়াছে এই যে, একদিকে যেমন চাষ-বাসের সুবিধা হইতেছেনা, অপরদিকে তেমনি দুবেলা যুদ্ধের খবরে আর পেট ভরিতেছেনা। এখন পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে একটা পারস্পরিক সংযোগ রহিয়াছে। কোথায় সহস্র যোজন দূরে যুদ্ধ বাধিয়াছে, আর তার ফলে নোয়াখালীর ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে কৃষকের কুটীরে অন্নাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। আমাদের রাজ-নৈতিক পণ্ডিতগণ যদি একটু ইঙ্গিতে আভাষেও এই মহাযুদ্ধ-সংঘটন সম্বন্ধে পূর্ব্বে অন্ততঃ কিছু বলিতে পারিতেন তবে কৃষকগণ আর পাটের চাষ করিত না অথবা ধান চাউল রপ্তানি করিয়া রিক্ত-হস্তে দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পতিত হইত না। কোথায় আমেরিকাতে উন্নত প্রণালীতে কৃ-

কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের চাষারা তাহা জানে না ; যদি আমাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ চাষাদের কাছে যাইয়া তাহাদিগকে কিছু দেখাইয়া শুনাইয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে বোধ হয় চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার খুলিবার প্রয়োজন হইত না। এক্ষণে আমাদের পুঁথিগত বিদ্যার সহিত কৃষকগণের কার্য্যগত অভিজ্ঞতা মিলাইতে হইবে। আমরা যেমন তাহাদের নিকট দেশের কথা জানিব, তাহারাও তেমনি আমাদের নিকট বিদেশের কথা শিখিবে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে আমাদের দেশে কোন কোন ব্যক্তি আমেরিকা অথবা ইউরোপ হইতে কৃষি শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছেন কিন্তু দেশে আসিয়া তাঁহাদের বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া কোন সুফল প্রাপ্ত হইতেছেন না ;—তাহার কারণ এই যে তাঁহারা নিম্নশ্রেণীয় লোকদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। যাঁহারা ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা এদেশের মিস্তিরীর সঙ্গে ভালরূপ মেশামিশি করেন না। যাঁহারা কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা চাষাভূষার অভিজ্ঞতাকে গ্রাহ্যই করেন না। সুতরাং তাঁহারা দেশহিতসাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া চাকুরী করিতেছেন।

যাহাহউক আমরা দেশের অবস্থা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় দুই কারণে আমরা উন্নতির পথে নিরন্তর বাধা প্রাপ্ত হইতেছি' প্রথমতঃ আমরা নিজের দেশকে জানি না ; দ্বিতীয়তঃ আমরা সাধারণ শ্রেণীর লোক হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। এই আত্ম-জ্ঞানের অভাব ও পরস্পরের মধ্যে বিপুল ব্যবধান আমাদের প্রধান অন্তরায়। এই দুই বিঘ্ন বিদুরিত করিবার জন্য আমরা এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'নোয়াখালী' প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। কোন কার্য্যের ভূমিকায় তাহার উদ্দেশ্য জানাইতে হয় ; আমরা কথার প্যাঁচের ভিতর না লুকাইয়া, বাক্যবিন্যাস-ভঙ্গীর আবরণে প্রচ্ছন্ন না হইয়া আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলাম। সাহিত্য সেবা কবিবার স্পর্দ্ধা আমরা করি না। কিন্তু ছাপান হরফে কথা সাজাইলেই যদি সাহিত্য-সেবা হয়, তবে আমবা তাহার একটু দাবী করিব। ভারতীর পূজার মন্দিরে আমরা আব কি উপহার প্রদান করিতে পারি! আমাদের কালি মাখান কাগজের ফুল ; না আছে গন্ধ না আছে মধু। ইহাতে যদি বীণাপাণির সন্তুষ্টি বিধান হয়, তবে আমরা সাহিত্য সমাজের সাজির এককোণে ইহাকে স্থাপন করিতে পারি। সকলের সমবেত চেষ্টা ও আন্তরিক সহানুভূতির উপরে ইহার সফলতা নির্ভর করে।

প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্কলন, বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রণালীর নির্দ্ধারণ এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ পূর্ব্বক আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। নোয়াখালীর একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস নাই ;—এই অভাব সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধগণের স্বর্গারোহণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নোয়াখালীর অনেক বিচিত্র ঘটনার বিবরণ, অনেক পুণ্যকাহিনী, অনেক গৌরব গাথা হারাইতেছি, সুতরাং স্বদেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতেছে। অনেকে অবজ্ঞা ভরে বলিয়া থাকেন "নোয়াখালীর আবার একটা ইতিহাস ; নোয়াখালীতে ছিলই বা কি ?—আর আছেই বা কি ?" এই রকম কথা শুনিয়া

দুঃখ হয়। কি আছে না আছে, তাহা এখানে বলিবনা, তবে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করি প্রশ্নকর্ত্তা কি চক্ষুষ্মান্? তাহা হইলে দেখাইয়া দিতে পারি।* যাহাহউক আধুনিক শিক্ষার ফলে আমরা এত বহির্ম্মুখ হইয়াছি, যে "প্রাসাদ" ভাবিতেই আমাদের, মনে হয় ক্রীষ্টাল প্যালেস্ "ধন্‌বান্" ভাবিতেই মনে হয় এণ্ড্রু কর্ণেগী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভাবিতেই মনে হয় লেক্ ডিষ্ট্রীক্ট্। কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছি আমাদের দেশের তাল নারিকেল কত কবির মনোহরণ করিয়া কাব্য-সাহিত্যের উপাদান স্বরূপ হইয়াছে। আমাদের দেশেইত সহস্র সুবর্ণ-পদ্মে মহেশ্বরের অর্চ্চনা হইত। "অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ" প্রাসাদ সকল ত আমাদের দেশেই ছিল। সেই সকল পুরাণো কথা ঘাঁটিয়া কাজ নাই; অতীত গৌরবের দোহাই অনেক দেওয়া হইয়াছে। বিলাতী ছাপমারা না থাকিলে যেমন দেশী জিনিসের আদর হয়, না, তেমনি কাব্য-কবিতায় ও সাহিত্য রচনায় ছন্দেবন্ধে গ্রথিত ও সুসজ্জিত না হইলে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেন চোখেই পড়ে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখনি ফরাসী-দেশে বসিয়া লিখিলেন "সতত হে নদ তুমি পড় মম মনে" অমনি কপোতাক্ষের শোভা দশগুণ বাড়িয়া গেল। নবীনচন্দ্র যখনি 'রঙ্গমতী' ও 'ভানুমতী' লিখিলেন অমনি চট্টলভূমির দিকে সকলের নজর পড়িল; সকলেই বলিল "আহা সত্যইত চট্টল-জননীর কি মনোহারিণী মূর্ত্তি "শৈল-কিরীটিনী, সাগর-কুন্তলা"। নোয়াখালীর নাম কেহ কাব্য-সাহিত্যে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানি না; তবে দুর্ভিক্ষ-দানবী করাল বদন ব্যাদান-পূর্ব্বক এবার নোয়াখালীর উপর যে আস্ফালন করিয়াছে, তাহাতে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ আমাদের সর্ব্বনাশের মধ্যে এইটুকু উপকার করিয়াছে। কলিকাতায় এমন লোক ছিল, যাহারা বলিত "নোয়াখালী কি কাশ্মীরে?"। তাহারা এখন বুঝিয়াছে নোয়াখালী তাহাদের ঘরের পাশেই। নোয়াখালীর প্রাকৃতিক শোভাসম্পদ্ অথবা গৌরব জনক কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, দুর্ভিক্ষ যে আছে, একথা নিঃসন্দেহ রূপে সকলে বুঝিয়াছেন। এই বহির্ম্মুখীন প্রকৃতি যাহাতে শ্রদ্ধার আকর্ষণে অন্তর্ম্মুখীন হয়, তজ্জন্য আমরা নোয়াখালীর প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব। এখনও চেষ্টা করিলে সাগর গর্ভ নিহিত রত্নরাজির ন্যায় অনেক বিস্মৃত বিবরণের উদ্ধার সাধন করা যাইতে পারে। অনেকে নানাপ্রকার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু ভাণ্ডারের অভাবে তাঁহারা তাহা সঞ্চিত ও রক্ষিত করিতে পারিতেছেন না। আমরা শুনিয়াছি কাহারো বা কষ্ট-সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি অযত্নে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে নোয়াখালীর কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, যাঁহারা ভবিষ্যতে নোয়াখালীর উন্নতি সাধনে ব্রতী হইবেন, তাহাদের সুবিধার নিমিত্ত এই পত্রিকায়

* বিগত বর্ষে "নোয়াখালী সম্মিলনীর" ষাণ্মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস সি, মহাশয় "আমাদের নোয়াখালী" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা পড়িলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

প্রাচীন ইতিহাসের সহিত নোয়াখালীর বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক্ আলোচনা থাকিবে। বাস্তবিক আলোচনার অভাবেই সহজ পন্থা নির্ণয় দুঃসাধ্য ও বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। দেশের ভূমি, জলবায়ু ও লোকের প্রকৃতি খুব তন্ন তন্ন করিয়া অনুশীলন করিলে আমরা দেখিতে পাইব, যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহা একেবারে অপরিবর্ত্তিত ভাবে দেশের উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করা যায়না। আমরা সকলেই জানি যে বিশুদ্ধ জলপান করা উচিত; একটু আধটু বিজ্ঞান পড়িয়া জলশোধনের দুই চারিটা উপায়ও জানি, কিন্তু বাড়ীতে গেলে সকলেই পুকুরের সেই পানাপচা জল অবিকৃত ভাবে পান করি;—গ্রামবাসী সাধারণ লোকদের কথা দূরে থাকুক নিজেরাই স্বাস্থ্য রক্ষার কয়টা নিয়ম পালন করিয়া চলি? আমরা গ্রামের মধ্যেও কলিকাতা সহরের ভাব ও চাল-চলন ফলাইতে চাহি;—কিন্তু তাহা হয় না; সাধারণ লোকের মধ্যে কাজ করিতে গেলে আমাদের এখানকার বিদ্যাটাকে খুব একটা মোচড় দিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে, তাহা না হইলে হইবে না। এই সকল বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা ও যথাসম্ভব মীমাংসা আমরা এই পত্রিকায় করিব।

এই পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিভাগ অনুসারে বিষয় সকল বিন্যস্ত ও প্রবন্ধাদি সন্নিবেশিত হইবে:—

১। শিক্ষা ও সাহিত্য:—

নোয়াখালীর গ্রাম্য কবিতা, পল্লীকথা, প্রবাদ বাক্য, ভাষা বৈচিত্র্য, কৃষকের গান, প্রচলিত উপকথা ও ছোট গল্প ইত্যাদি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইবে ও তৎসঙ্গে তাহাদের সৌন্দর্য্য ও রস-বিকাশ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা সংযোজিত হইবে। নোয়াখালীর বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থা ও তাহার উন্নতিসাধন বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।

২। পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস:—

নোয়াখালী জিলার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠামূলক প্রাচীন কাহিনী, জমিদার ও তালুকদারগণের প্রাচীন ইতিহাস, সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশ-বিবরণ অথবা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বিশেষের জীবন চরিত ইহাতে আলোচিত হইবে। হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথি, পুরাতন মুদ্রা, দেবমূর্ত্তি, লিপি ফলক, ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি প্রাচীনত্বের নিদর্শন সমূহ সযত্নে সংগৃহীত হইবে।

৩। ধর্ম্ম ও সমাজ:—

নোয়াখালীর সামাজিক আচার ব্যবহার, প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, তাহাদের দোষগুণ বিচার ও সংস্কার প্রণালী; এই সকল বিষয়ের আলোচনা ইহাতে স্থান পাইবে।

৪। অর্থ ও বিজ্ঞান:—

নোয়াখালী জেলার ভূমিসম্পত্তি ও অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা; কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ; নোয়াখালীর গ্রামসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতির বিধান ইত্যাদি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আমাদের জন্মভূমির এই মঙ্গলজনক মহদনুষ্ঠান সকলের সম্মিলিত শক্তি ও সমষ্টীভূত চেষ্টা ব্যতীত সফল হইবে না। আমরা সকলের সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

আবাহন।

(১)

নমি "নোয়াখালী" নক্ষত্র নির্ম্মল
বিমল বঙ্গ গগনে
স্নিগ্ধকিরণে আশীষ বরষি,
এস আজি শুভ লগনে।

(২)

এস তুমি এস, আমাদের যত
কলঙ্ক-কালিমা মুছা'তে,
আমাদের সব অবসাদ গ্লানি,
এস তুমি এস ঘুচা'তে।

(৩)

শুষ্ক বন-ফুলে দাও গো ঢালিয়া
স্বরগের সুধা সৌরভ ;
স্তবধ বীণায় বাজাও আজিকে,
অতীতের গাতি গৌরব।

(৪)

দরিদ্রা যদিও, হীনা তুমি নও,
দাও ব'লে দাও সবারে,
বিপুল বৈভব ছিল একদিন
তোমারো বিশ্ব মাঝারে।

(৫)

রচিলে তুর্ক ভূপতির তরে
কত রণ পোত তরণী,
আজিও নাবিক তোমার সন্তান
ভ্রমিছে সাগর ধরণী।

(৬)

রাখাল বালক সমসের গাজী
অতুল বীরত্ব লভিয়ে,
পরাক্রমশালী ত্রিপুরা-ঈশ্বরে
পেরে'ছিল দিতে তাড়িয়ে।

(৭)

সন্দ্বীপে স্বাধীন হ'ল দেলাওর,
আপন ক্ষমতা প্রভাবে ;
গেয়েছে তালিস সে বীরত্ব কথা,
ইতিহাস মাঝে গৌরবে।

(৮)

ফুলবিবী ছিল তোমার দুহিতা,
আজিও তাহার কীরিতী
সশরীরে থাকি' জাগা'য়ে দিতেছে
অতীতের সেই স্মিরিতি।

(৯)

লক্ষ্মণ-মাণিক্য, মনুব্বর খান,
দেখা'ল কত যে প্রভাব,
মনে হ'লে প্রাণে কত কি যে জাগে
কেমনে আহা তা' বুঝাব।

(১০)

তাই—

অতীতের কথা শুনা'বার তরে,
পূর্ব্ব-স্মৃতি প্রাণে জাগাতে,
শুবধ বীণায় তুলিয়া সুতান
গৌরবের গাথা গায়িতে

(১১)

এস "নোয়াখালী," করি আবাহন,
এস আজি শুভ লগনে ;
এসহে বাঞ্ছিত, এসহে ঈপ্সিত।
জাগা'তে প্রেরণা পরাণে।

মোজাফ্ফর আহমদ।

নোয়াখালী।

নূতন চর—নামকরণ—জীবাবাস।

নোয়াখালী নামটিই স্থানের নূতনত্বের পরিচায়ক। "নোয়া" (new) অর্থ নূতন; "খালী"—যে স্থানে খালের উদ্ভব হইয়াছে। 'নোয়া' শব্দটি বঙ্গের অপরাপর জেলার অপরিচিত হইলেও 'খাল' বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নহে। গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থানেই 'খাল' খনন করান। 'খাল' কাটিয়া কুমীর ঘরে আনার কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। আমরা যে খালের কথা বলিলাম, উহা খনিত খাল নহে। এ অঞ্চলে সুবিস্তীর্ণ নদীমুখ জোয়ারে পরিপূর্ণ হইয়া তটদেশ পর্য্যন্ত প্লাবিত করে। জোয়ারের বেগ সাধারণতঃ ছয়ঘণ্টা কাল অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে, তৎপর ভাটার আরম্ভ হয়। ভাটার সময় প্লাবিত তটভূমির জল নদীতে প্রবেশ করিবার কালে অনেক স্থলে তটদেশ ভগ্ন করিয়া নূতন প্রবাহ খাতের সৃষ্টি করে। এ অঞ্চলে এই সকল স্রোত খাতকেই খাল বলে। যে স্থানে এইরূপ খালের সৃষ্টি হয়, তাহাকেই খালী বলা হয়। আজকালও 'হচাখালী', 'চড়িয়াখালী' 'তক্তাখালী' প্রভৃতি নাম ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সুতরাং কোন সময় বৃহৎ মেঘনা নদী হইতে এরূপ একটি নূতন খালের উদ্ভব হওয়াতে যে এ অঞ্চলের নাম নোয়াখালী হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, সুদূর প্রাচীনকালে বঙ্গোপসাগর তাহার ফেণিল পুষ্পাঞ্জলি হিমগিরিরাজের পাদমূলে অর্পণ করিতেন। হিমালয়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কুসুম নির্ম্মাল্য শিরে ধারণ করিয়া সাগর ক্রমে পশ্চাদপসরণ করিতে থাকেন। এইরূপে সাগর গর্ভ হইতে বঙ্গদেশের উৎপত্তি। প্রত্নতত্ত্ববিদের এ কথা আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না। আমরা সমুদ্রতীরে বাস করিয়া অনবরত তাঁহাদের কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি।

সুদীর্ঘ ব্রহ্মপুত্র নদ সাগর-সঙ্গমে আসিয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। নদীর সঙ্গমস্থলে নূতন নূতন দ্বীপের উৎপত্তি হওয়াতেই নদীপথ বহুধা বিভক্ত হয়। ব্রহ্মপুত্রেরও তাহাই ঘটিয়াছে। সাহবাজপুর, হাতিয়া, সন্দীপ প্রভৃতি বৃহদায়তন দ্বীপগুলি নদবাহিত মৃত্তিকা-কঙ্কর দ্বারাই গঠিত। প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মাধীনে কোন কোন সময় এক মুখের স্রোত প্রবল হইয়া বহুকালের সযত্ন সঞ্চিত মৃত্তিকারাশিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লইয়া যায়। প্রবল নদীর জল বহুমুখে সাগরে প্রবেশ করিতেছিল, এক মুখের স্রোত প্রবল হইলে অন্যান্য মুখের স্রোতোবেগ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইয়া আইসে। তখন এই মন্দীভূত প্রবাহস্থিত মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া নূতন স্থলভাগের সৃষ্টি করে। আবার হয়ত কিছুদিন পরে এই দুর্ব্বল স্রোত প্রবল হইয়া নবোদ্ভূত দ্বীপটিকে গ্রাস করিতে থাকে এবং প্রবল স্রোতমুখ দুর্ব্বল হইয়া নূতন স্থলের উৎপত্তি করিতে থাকে। নদীমুখে সাগরসঙ্গমে এই ভাঙ্গাগড়ার বিচিত্র ব্যাপার অহরহ সংঘটিত হইতেছে। উত্থান ও পতনের ভিতর দিয়া যেমন শিশু হাটিতে শিখে, পোষণ ও

শাসনের ভিতর দিয়া যেমন শিশু জীবন গঠিত হয়, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়াও সেইরূপ নদ মুখে নূতন নূতন স্থান গঠিত ও পুষ্ট হইতেছে। সাহবাজপুর, হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি স্থানগুলি এইরূপ ভাবে গঠিত হইয়া মানবের বসতিস্থল হইয়া উঠিয়াছে।

অতি বেশী দিনের কথা নহে, যে সময় এ জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে চরপাতা, দালাল বাজার, লক্ষীপুর প্রভৃতি স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাপড়ের কুঠি ছিল, সে সময়ও মেঘনা ঐ সকল কুঠির পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। পণ্যভার বহন করিবার জন্য কোম্পানীর জাহাজ কুঠির নিকট সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিত। রায়পুর থানার অধীন চরপাতার কুঠি ও লক্ষীপুর থানার অন্তর্গত জ্যাকসন কুঠির ভগ্নাবশেষ এখনও উহার সাক্ষ্য দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে। ন্যূনাধিক দুইশত বৎসর কাল মধ্যে সেই নদী কোনও স্থানে প্রায় ১৫।১৬ মাইল সরিয়া গিয়া এক নূতন ভূভাগের সৃষ্টি করে। এই প্রকার নদীগর্ভজাত স্থানকে এ অঞ্চলে 'চর' বলা হয়। অনেক স্থানের নামের আগে বা পরে 'চর' সংযুক্ত থাকিয়া অদ্যাপি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। চরবাঙ্গানগর, চররোহিতা, পাঙ্গাশিয়া-চর, চরভুতা, চরমটুয়া, বালামচর, টুমচর প্রভৃতি নাম উহার দৃষ্টান্তস্থল। কৌতূহলী পাঠক শ্রীযুত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত চট্টগ্রাম বিভাগের মানচিত্রে নোয়াখালী জেলায় নদীতীরস্থ স্থানগুলির নামের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ সকল কথার যাথার্থ্য সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আজকালও নদীগর্ভে এইরূপ বহু চরের সৃষ্টি হইয়া ক্রমে মানুষের বসতি স্থল হইয়া উঠিতেছে।

নদীগর্ভে এইরূপ চরের উৎপত্তি কাহিনী অতি বিচিত্র। কোথাও কিছু নাই, সুগভীর জলরাশি নানাস্থানে ভীষণ আবর্ত্ত উৎপন্ন করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। দুর্দান্ত উদ্ধত, অদম্য জলরাশির প্রবল উচ্ছ্বাস, আবর্ত্তের মধ্যে উদ্বেলিত জলরাশির প্রচণ্ড ঘূর্ণন প্রভৃতি দর্শন করিলে প্রাণে মহা আতঙ্কের উৎপত্তি হয়। যেস্থানে প্রকৃতির এইরূপ একটা মহাতাণ্ডব সংঘটিত হইতেছিল, প্রকৃতি যেখানে সর্ব্বগ্রাসিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তটদেশের নারিকেল সুপারি আম কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষগুলিকে সমূলে উন্মূলিত করিতেছিল, কিছুদিন পরে সেখানে হঠাৎ নদীপ্রবাহ স্থিরভাব ধারণ করিল, দেখিতে দেখিতে ২।১ মাসের মধ্যে সেখানে নূতন চর দেখা দিল। প্রাণ ভয়ে গৃহ ভাঙ্গিয়া জন্মস্থানের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে যাহারা নিরাশ্রয়ের মত অন্যের জায়গায় একটি কুটির নির্ম্মাণ করিয়া কোনও মতে কষ্টে সৃষ্টে অবস্থান করিতেছিল, তাহারাই আবার এই নবজাত চরে সানন্দে মৎস্য ধরিতে লাগিল। অনেক সময় নদীর ঠিক মধ্যস্থলেও এইরূপ চরের সৃষ্টি হয়। যে সকল লোক নৌকাযোগে এই নদীবক্ষ দিয়া কার্য্যানুরোধে বাণিজ্য ব্যবসা উপলক্ষে যাতায়াত করে, তাহারা এই সকল চরের নামকরণ করিয়া থাকে।

এই নবোদ্ভূত চরে স্থলচর জন্তুদের মধ্যে প্রথম আগমন হয় পক্ষীর। প্রবাহধৌত নূতন মৃত্তিকাই বোধ হয় তাহাদের তৃপ্তিকর আহার। এইরূপ কোনও চরে উপস্থিত হইলে কেবল

পক্ষীর ত্রিশূল পদচিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। চরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল বিহঙ্গ পদচিহ্ন অঙ্কিত। ক্রমে উহাতে নূতন তৃণ উৎপন্ন হইতে থাকে। পক্ষীদের পরেই মৎস্য ধরিবার জন্য মানবজাতি উহাতে পদার্পণ করে। ক্রমে স্রোতপ্রবাহিত বীজ হইতে নানাজাতি বৃক্ষ জন্মিতে থাকে। তৃণ জাতির মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্র একপ্রকার বন, হোগল, কেশে ও কুশ এবং বৃক্ষের মধ্যে ঝাউগাছের মত লোণা, গোঁয়া ও কেরপা প্রধান। প্রথমোক্ত লোণাগাছ ঝাউগাছের ক্ষুদ্র সংস্করণ। সমুদ্র নিকটবর্ত্তী বলিয়া শীতকালে এই সকল নদীর জল লবণাক্ত থাকে। সুতরাং এ অঞ্চলের মৃত্তিকাতে লবণাধিক্য থাকে। লোণা গাছগুলি এই লবণ আহার করিয়া জমির লবণ শোষণ করে এবং জমিকে ক্রমে কৃষির উপযোগী করিয়া তোলে। যখন দিগন্ত প্রসারিত ধূসর চরে এই শিশু লোণাগাছগুলি প্রকৃতির গুপ্ত আহ্বানে নিজ নিজ মস্তকোত্তলন করিয়া ভূগর্ভ বিদীর্ণ করিয়া ধূসরবর্ণ চরকে শ্যামল শোভায় মনোরম করিয়া তোলে তখন শিশু চারাগুলি উত্তোলন করিয়া করতলে আছড়াইলে বিন্দু বিন্দু লবণ দেখিতে পাওয়া যায়। চারাগাছ মুখে দিলে লবণের যথেষ্ট আস্বাদ পাওয়া যায়। এমন কি ছেলেপিলেরা উক্ত লবণ সংযোগে কুল খাইয়া থাকে। বোধ হয় এই জন্যই উক্ত গাছের নাম "লোণা" হইয়াছে। বর্ত্তমান পাখুরিয়া কয়লার যুগে শেষোক্ত কেরপা বৃক্ষের কৃপাতে নদীতীরবর্ত্তী জনপদ ও বন্দরসমূহ জ্বালানি কাঠের অভাব অনুভব করিতেছে না। চরকে আবাদের উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে সরকার বাহাদুর বিনামূল্যে এই সকল গাছ কাটিয়া নিতে দেন। স্থানীয় লোক অবসর সময়ে শীতকালে (কারণ বর্ষার ভীষণ নদী দিয়া যাতায়াত দুঃসাধ্য বিশেষতঃ কৃষিজীবন লোক তখন কৃষি লইয়া ব্যস্ত থাকে।) এই কাঠের ব্যবসা দ্বারা দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলিয়া রাখি নিয়মিতভাবে এই ব্যবসায় চালাইতে পারিলে সামান্য মূলধনে বিস্তর লাভ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই চাকুরীর যুগে এ নীরস বাক্যে কে কর্ণপাত করে।

এই সকল চরভূমিতে একদিকে তৃণ বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইতে থাকে, তেমনি অপর দিকে নানাবিধ জন্তুর আবাসস্থলে পরিণত হইতে থাকে। চতুর্দ্দিকে সুবিস্তীর্ণ অগাধ বারিপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত এই সকল দ্বীপগুলি কিরূপে স্থলচর জন্তুর অধ্যুষিত হইয়া পড়ে, ইহা ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বাস্তবিক শূকর, মহিষ, ইন্দুর প্রভৃতি জন্তু কি ভাবে আসিয়া এ সলিলবেষ্টিত স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে অনুমান ভিন্ন কেহই তাহার যথার্থ বিবরণ দিতে পারে না। সম্ভবতঃ এ সকল প্রাণী রাত্রিকালে সন্তরণ করিয়া নূতন চরে উপনীত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পর্টুগীজ রাজের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে এবং সমুদ্র গমনোপযোগী জলযানের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ও এ সকল অসভ্য ও অশিক্ষিত চতুষ্পদ জন্তুগুলি কলম্বসের মত নবদ্বীপের অবস্থান নির্ণয় করে এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধব লইয়া তাহাতে স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিয়া লয়। আবার এই সকল দ্বৈপ ঔপনিবেশিকগুলির সাহস ও বিক্রম আমাদের চিরপরিচিত তাহাদের স্বজাতীয়দের অপেক্ষা অনেক বেশী। আকৃতি এবং

শক্তিতেও তাহারা ইহাদের চেয়ে অনেক উন্নত। একবার কোন কৃষক এইরূপ বৃহৎ ইন্দুরের অত্যাচারে অস্থির হইয়া দেশ হইতে একটি বিড়াল নিয়া চরে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহার সযত্নানীত মার্জ্জার দ্বৈপ ইন্দুরের অতি প্রাকৃতিক আকৃতি দর্শনে ভীত হইয়া মিউ মিউ করিয়া পশ্চাৎ সরিয়া আসিয়াছিল।

এই চরগুলি কয়েকবৎসর টিকিয়া গেলেই কৃষকেরা উহাতে আবাদ আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য নদীগর্ভজাত এই সকল নূতন স্থানে প্রভূত শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। এই লোভেই দলে দলে কৃষিজীবী লোক সরকার বাহাদুর হইতে ঐ সকল চরের বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া উহাতে চাষ আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে স্বীয় কৃষি কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে পরিবার লইয়া বাস করিতে থাকে।

এবম্বিধ প্রণালীতে নোয়াখালীর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশের বিস্তীর্ণ স্থানে লোক বসতি হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে এখনও এই সকল অধিবাসীদের পূর্ব্ব বাসস্থান নির্ণয় করা দুরূহ নহে। একই থানার অধানস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রতিবাসীদের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধগম্য হয় যে ত্রিপুরা, বরিশাল প্রভৃতি জেলা হইতেই অধিকাংশ লোক কৃষি কার্য্যের জন্য পূর্ব্ব বসতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে আগমন করিয়াছিল। আজ কালও নোয়াখালীর স্থলভাগ (main land) হইতে এবং বরিশালের মেঘনা নদীতীরবর্ত্তী অনেক স্থান হইতে অনেক কৃষিপ্রাণ লোক এইরূপ চরভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। বর্ত্তমানে নূতন চরে লোক বসতির প্রণালী দর্শন করিয়া আমরা এ জেলার লোকালয়ের অনেকটা অনুমান করিতে পারি এইমাত্র। কিন্তু কৃষিকার্য্যের জন্য আগত লোকেরা কখনও তাহাদের ইতিহাস রাখে না এমন কি জমিদারী ও তালুকদারী সূত্রে যাহারা এই সকল স্থানে আপনাপন বাড়ী ঘর স্থাপন করিয়া বংশানুক্রমে বাস করিতেছেন, সেই সকল ভদ্রলোকদেরও নিজ বংশের ইতিহাস আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। প্রাচীন দলিল পত্র ও বৃদ্ধ বচনই এই স্থানের ইতিহাস উদ্ঘাটন করিবার একমাত্র উপায়।

শ্রীভবণীকান্ত দাস।

"আমাদের নোয়াখালী"

অরুণ-কিরণ চরণে যাহার প্রথমে পড়িল ছড়ায়ে,
বিপুল পুলকে স্নিগ্ধ আলোকে মুগ্ধ করিয়া ধরা এ;
পরিমল-ময় কুসুম-নিচয় রক্তিম রাগে সাজায়ে,
বিহগ-মধুপ-কুজনে মধুর রতন-নূপুর বাজায়ে।—
নাহিক দুঃখ, নাহিক দৈন্য নাহি কলঙ্ক কালিমা,
সকল ধন্যা সাগর কন্যা আমাদের নোয়াখালী মা।

চন্দ্র-প্রভায় উজ্জ্বল যার যুগল-চরণ-নখর,
আশ্রিত-জন রক্ষণকারী স্নেহ-শীতল প্রখর ;
শ্যামল-বন-বসনা নিত্য-মোদিতা মৃদুমলয়ে,
শস্যপূর্ণ প্রান্তর ভূমি ভূষিতা বেলাবলয়ে।—
নাহিক দুঃখ নাহিক দৈন্য নাহি কলঙ্ক কালিমা
সকল ধন্যা সাগর কন্যা আমাদের নোয়াখালী মা।

সিংহ-সমান সন্তান যার যুঝিল শত্রু সহিতে
ঢালিল রক্ত অগ্রতভক্ত সাধিতে স্বদেশ-হিতে ;
করিছে আশীষ যারে হিম-গিরি দূরে প্রসারি পাষাণ কর,
ব্রহ্ম-পুত্র ববযে নিত্য শেষ উপহার যাহার 'পর।
নাহিক দুঃখ, নাহিক দৈন্য নাহি কলঙ্ক কালিমা
সকল-ধন্যা সাগর-কন্যা আমাদের নোয়াখালী মা।

আম পনস-বিল্ব-কদলী সম্ভার যার কাননে,
স্তন্য সুরস ঢালিছে নিত্য শুষ্কশীর্ণ আননে ;
সদা ফলবতী পূগমালা,—সে বন্ধন স্নেহ-রজ্জুর,
কত সুরসাল দীর্ঘ বিশাল শ্যামল তাল খর্জ্জুর।—
নাহিক দুঃখ নাহিক দৈন্য নাহি কলঙ্ক কালিমা,
সকল ধন্যা সাগর কন্যা আমাদের নোয়াখালী মা।

ছায়া-শীতল নারিকেল-নিকুঞ্জে পর্ণ-কুটীরে,
বিবচিত-বেণী ফেণময়-ফেণী তটিনীর চারু দু'তীরে,
কৃষকের ঘরে বালুকার চরে ভৈরবী মেঘনা ব্রাহ্মণীর,
বিরাজিত সদা মূর্ত্তি বরদা উল্লাসময়ী যাহার শ্রীর।—
নাহিক দুঃখ নাহিক দৈন্য নাহি কলঙ্ক কালিমা
সকল ধন্যা সাগর কন্যা আমাদের নোয়াখালী মা।

নীলাম্বুধি-চুম্বে বদন কতই আদরে যতনে,
দ্বীপ-পুঞ্জ থালায় সাজায়ে কাঞ্চনমণি-রতনে ;
গর্জ্জে গভীর, ভাঙ্গিতেছে তীর ডাকিছে "এস হে ত্বরিতে,
"মায়ের জন্য হইতে ধন্য মায়ের জন্য মরিতে।"—
নাহিক দুঃখ নাহিক দৈন্য নাহি কলঙ্ক কালিমা,
সকল ধন্যা সাগর কন্যা আমাদের নোয়াখালী মা।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্ সি।

সন্দ্বীপে পর্ত্তুগীজ প্রভাব।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে পর্ত্তুগীজ জাতি বাণিজ্যব্যপদেশে পদার্পণ করিয়া নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন সাহিত্যালোচনায় ও স্বাস্থ্য সম্পদে, ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায় ও বাণিজ্য বিস্তারে বঙ্গদেশে এক যুগান্তর। মাতা বসুন্ধরার "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" মূর্ত্তি তখন কেবল বঙ্গদেশেই প্রকটিত। এইজন্য পর্ত্তুগীজগণ তাহাদের প্রধান কার্য্যস্থল বঙ্গদেশে স্থাপন করাই বিধেয় বিবেচনা করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রামের ন্যায় নৈসর্গিক পোতাশ্রয় ভারতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। জলপথে বাণিজ্য যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য চট্টগ্রাম তাহাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদ্ধেতু গোয়ার তদানীন্তন পর্ত্তুগীজ গবর্ণর নানু ডা চোনা (Nuno da cunha) চট্টগ্রামে বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়া পাঁচখানি জাহাজ, দুই শত সৈন্য এবং ডি মোস্রাকে তাহার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। তখন চট্টগ্রাম গৌড়েশ্বর মাহাম্মদ সার অধিকারে ছিল। তিনি চট্টগ্রামে উপনীত হইয়া সুলতান মাহম্মদ সমীপে উপঢৌকন প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুমত্যা-নুসারে তথায় সেই বৎসরের শেষভাগে বাণিজ্যাগার স্থাপন করেন। (১)

চট্টগ্রামের পশ্চিমে সন্দ্বীপ বঙ্গোপসাগরের একটী সুবৃহৎ দ্বীপপুঞ্জ। শস্যসম্পদ ও লবণের ব্যবসায়ের জন্য সন্দ্বীপ তখন ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। এমন কি প্রতিবৎসর ৩০০ খানি লবণের জাহাজ এখানে বোঝাই হইয়া অন্যত্র প্রেরিত হইত। (২) পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্যের জন্য দেশ বিশ্রুত। এই লবণের ব্যবসায় উপলক্ষে পর্ত্তুগীজগণ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সন্দ্বীপে পদার্পণ করেন। সন্দ্বীপের প্রভূত ধন সম্পদে, প্রচুর শস্য-সম্ভারে তাহারা আকৃষ্ট হইয়া উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। সুদূর ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে থাকিয়া, তাহারা তাঁহাদের দেশীয় অনেক রীতিনীতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। রীতিমত উপাসনাদির অভাবে তাহারা ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মহীন হইয়া পড়েন। (৩) এত সুদূর প্রবাসে থাকিয়া তাঁহাদের স্বজাতীয় স্ত্রীলাভ, তখন তাঁহাদের পক্ষে সুদুর্লভছিল। অনেক স্থলে প্রায় ঘটিয়া উঠিত না। বিশেষতঃ তদানীন্তন ভারতাগত পর্ত্তুগীজদের মধ্যে অনেকেই আবার পর্ত্তুগাল-রাজের বিতাড়িত বা পলাতক সৈন্য বা নাবিক। (৪) তাঁহারা স্বদেশে যাইয়া বিবাহ করিতে তত সাহসী হইতেন না। কাজেই তাঁহারা এদেশীয় রমণীদের পাণি-পীড়ন করিতে বাধ্য হইতেন। উচ্চ বংশীয় হিন্দু কি মুসলমানগণ তাঁহাদিগকে কন্যা

১। বাবু কৈলাশচন্দ্র সিংহের রাজ মালা ..৩১০ পৃষ্ঠা।

2. Three hundredth ships were yearly laden from hence (Sandvip) with salt"
Purchas, page 513

৩। নিখিলবাবুর "প্রতাপাদিত্য" page 440

4. Stewart's "History of Bengal"

সম্প্রদান করিতেন না। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা অগত্যা নিম্ন শ্রেণীর রমণীদের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতেন। ভারতের জল বায়ু প্রভূত পরিমাণে তাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে ত্রুটি করে নাই। ভারতবাসীর সংস্রবে আসিয়া তাঁহারা ভারতের অনেক রীতিনীতি অনুকরণ করিয়াছিলেন। আমরা যেমন পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ করিতে যাইয়া তাহাদের গুণাবলীর পরিবর্ত্তে অধিকাংশ দোষগুলি অনুকরণ করিয়া বসিয়াছি, তাঁহারাও সেইরূপ আমাদের দোষগুলিরই অনুকরণ করিয়াছিলেন। আমাদের বহু বিবাহ তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহারা এক এক জনে ৪।৫টা পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সব বহু বিবাহের ফলে এবং স্বাধীন রমণীদের সহিত অবৈধ উপায়ে সন্তান উৎপাদন করিয়া শীঘ্রই তাঁহারা, তাঁহাদের দলের [illegible] পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ সন্দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সেখানে ও তৎপার্শ্বস্থ অধিবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই সব কারণে অল্পদিন মধ্যেই সন্দ্বীপ, ফিরিঙ্গি অধিবাসী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ক্রমে সন্দ্বীপে তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায়, তাঁহারা তথায় একটি [illegible] স্থাপন করিয়াছিলেন। [illegible] ভ্রমণকারী পাদরীদের মধ্যে অনেকেই [illegible] ও ধর্ম্ম [illegible] তাঁহাদের আশ্রয় লইয়াছিলেন। (৬)

বঙ্গোপসাগরের [illegible] সন্দ্বীপ [illegible] কখন বা মোগল, কখন বা মগ [illegible] অধিকারে [illegible], কিন্তু ফিরিঙ্গীজগণই সন্দ্বীপের প্রকৃত [illegible] ছিল। [illegible] সন্দ্বীপের নাম [illegible] উল্লেখ করিয়াছে। উহা [illegible] এখন উহা অল্প দূরে অবস্থিত ছিল। [illegible] রাজস্ব ভুক্ত করিয়াছিলেন বটে [illegible] ইহার কিছুদিন পরে [illegible] রাজস্ব ভুক্ত করিয়া লন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে [illegible] "সন্দ্বীপ" পরগণা সরকার ফতেহাবাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া [illegible] রাজস্ব নির্দ্ধারণ করেন। ( )

কেদার রায় [illegible] তিনি সন্দ্বীপ অধিকার করিতে [illegible] পরাজিত করিয়াছিলেন। [illegible] বঙ্গ ইতিহাসের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

5 Stewart's History of Bengal
6 Stewart's History of Bengal
7 প্রতাপাদিত্য। (p. 44)
Translation from History de l' Orient [illegible]
8 Ain-i-Akbari.

কেদার রায় নৌ-যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন। তিনি নৌ-যুদ্ধ পরিচালন জন্য কতকগুলি পর্ত্তুগীজ ও ফিরিঙ্গী সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কাভালো (Carvalius) নামক ব্যক্তিই প্রধান ছিল। কাভালোর সাহায্যে তিনিই ১৬০২° খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপ মোগলদিগের হাত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। সেই যুদ্ধে কাভালো "সন্দ্বীপ" দুর্গে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামে তখন আরাকান রাজের অধীনে অনেকগুলি পর্ত্তুগীজ সৈন্য ছিল। "ইমানুয়েল মার্ত্তুস" (Emanuel de Mattos) তাহাদের সেনাপতি। "মার্ত্তুস" তথাকার পর্ত্তুগীজদের অনুরোধে ৪০০ সৈন্য নিয়া কার্ভালোর উদ্ধার সাধন করেন। সুচতুর কেদার রায় পর্ত্তুগীজদের প্রাধান্য দেখিয়া, কার্ভালো ও মাত্তুস্‌কে সন্দ্বীপের স্বীয় স্বত্ব অর্পণ করেন। তৎপর কাভালো ও মাত্তুস উভয়ে সন্দ্বীপ দখল করিতে থাকেন।

এই সময়ে ১৬০৩ খৃঃ অব্দে মেং রাজাগি বা সেলিম সাঁ আরাকানের অধিপতি ছিলেন। তিনি আপনাকে সন্দ্বীপের রক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। বিশেষতঃ স্বয়ং "মাত্তুস" তাঁহার অধীনস্থ একজন সেনানায়ক। পর্ত্তুগীজ বিনানুমতিতে "সন্দ্বীপ" অধিকার করায় তিনি তাহাদের প্রতি বিরক্ত হন; এবং পাছে তাহারা প্রবল হইয়া উঠে এই আশঙ্কায়, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সন্দ্বীপ অধিকার করিতে বদ্ধ পরিকর হন। পর্ত্তুগীজ ও আরাকান রাজের সহিত এই উপলক্ষে দুইবার যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। উভয় যুদ্ধেই পর্ত্তুগীজগণ জয়লাভ করেন।

প্রথম যুদ্ধে আরাকান-রাজ ১১০ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ও কয়েকখানি কামান সজ্জিত বৃহৎ রণপোত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেদার রায় এই রণ বাহিনীর সংবাদ পাইয়া কাভালোর সাহায্যের জন্য ১০০ খানি কোষ নৌকা পাঠাইয়া দেন। এতদুপলক্ষে উভয় পক্ষের ঘোরতর জল যুদ্ধ হয়। পর্ত্তুগীজেরা জয়লাভ করেন। পর্ত্তুগীজগণ আরাকান রাজের ১৪৯ খানি রণতরী অধিকার করেন। আরাকান রাজ পর্ত্তুগীজদের এবম্প্রকার জয়লাভে ক্রোধান্ধ হইয়া পুনঃ যুদ্ধার্থে ১০০০ খানি রণতরী পাঠাইয়াছিলেন। এবারও যুদ্ধে আরাকান রাজ জয়লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। যুদ্ধ বিশারদ পর্ত্তুগীজদের বিক্রমে আরাকান রাজের ২০০০ সৈন্য হত ও ১৩০ খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায়। পর্ত্তুগীজদের মাত্র ৬ জন সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজগণ জয়লাভ করিয়াও সন্দ্বীপ অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের রণতরীগুলি ভগ্ন হওয়ায় তাঁহাদের অনেকেই শ্রীপুর, বাকলা, চণ্ডিকান (যশোহর) প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেনাপতি কাভালো ৩০খানি মাত্র রণতরী নিয়া শ্রীপুরে কেদার রায়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাত্তুস ও একা সন্দ্বীপ শাসন করিতে অসমর্থ হইয়া চট্টগ্রামে চলিয়া যান। মাত্তুস আরাকান-রাজেরই সেনা নায়ক ছিলেন। তিনি চলিয়া গেলে সন্দ্বীপ কার্য্যতঃ আরাকান রাজের হস্তগত হয়। আরাকান-রাজ স্বয়ং সন্দ্বীপ শাসন দুরূহ বিবেচনা করিয়া, মাত্তুসের অধীনে ফতেখাঁ নামক একব্যক্তিকে সন্দ্বীপের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত

করেন। ফতেখাঁ ১৬০৩খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করিয়া "মাত্তুসের" অধীনে শাসন করিতে থাকেন।

এদিকে কূটনীতি পরায়ণ যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্য কাভালো প্রভৃতি পর্তুগীজদের ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, এবং কার্ভালোর সাহায্যে কেদার রায় মানসিংহের সেনাপতি মন্দারায়কে পরাজিত করিয়াছেন শুনিয়া পর্তুগীজ ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তখন আরাকান রাজ সন্দ্বীপ অধিকার, করিয়া, বাকলা অধিকার করিতে অভিলাষী হইয়াছেন এবং কার্ভালোর উপর আরকান রাজ অসন্তুষ্ট আছেন, জানিতে পারিয়া, তিনি গোপনে আরাকান রাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাহাকে বশীভূত করিয়া, কৌশলে কাভালোকে তাহার নিজ রাজধানীতে নিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন কাভালো জীবিত থাকিলে, তাঁহার রাজত্ব নিরাপদ নহে। বস্তুতঃ ইহাতে তিনি বড়ই ভুল করিয়াছিলেন। এই হত্যাকাণ্ড ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল।

কার্ভালো প্রভৃতির পতনের পর পর্ত্তুগীজদের ক্ষমতা কিছুকালের জন্য হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে সন্দ্বীপ হইতে প্রত্যাগমনের পর হইতে হঠাৎ মাত্তুসের মৃত্যু হইলে 'ফতে খাঁ'' আপনাকে সন্দ্বীপের স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এবং গোপনে মোগল সুবেদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্দ্বীপ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং সময় সময় মোগল সেনাপতি বলিয়া পরিচয় দিতেও লাগিলেন। পাছে পর্ত্তুগীজগণ প্রবল হইয়া, পুনরায় সন্দ্বীপ দখল করে, এই আশঙ্কায় তিনি সন্দ্বীপের সমস্ত পর্ত্তুগীজ ও দেশীয় খৃষ্টানগণকে স্ত্রী পুত্র সহ নিহত করিয়াছিলেন। ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সর্ব্বদা ৪০ খানি সুসজ্জিত যুদ্ধ জাহাজে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, এবং ঐ সব যুদ্ধ জাহাজ পরিচালন জন্য অনেকগুলি মোগল ও পাঠান সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (৯)

কৃষি ও বাণিজ্যের জন্য সন্দ্বীপ বিখ্যাত থাকায় তাহার রাজস্বে ফতেখাঁ শীঘ্রই ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। শত্রুদের ভীতি প্রদর্শনার্থ তিনি যুদ্ধের পতাকায় এই কথাগুলি

9 'Emanuel de Mattos Commander of Bandel of Dianga (Chittagong) who died not long before had been Lord of Sundiva an island 70 Leagues in compass Fatican a resolute Moor whom he had intrusted with the island in his absence hearing of his death makes himself master of it and the more to secure himself, murders all the Protugueses that were in it with their wives and children, and such, of the Natives as were Christains, then he gathered Moors and Pathans to his assistance, fitted out a Fleet of 40 Sail and plentifully maintained this charge with the Revinue of the island which is great'

The Portuguese Assia.
Chapter VIII

সর্ব্বদা লিখিয়া রাখিতেন, "জগদীশ্বরের অনুগ্রহে ফতেখাঁ সন্দ্বীপের অধিপতি, খৃষ্টানদিগের রক্তপাতকারী এবং পর্ত্তুগীজ জাতির বিনাশকারী। (১০)

পর্ত্তুগীজদের অনেক পরে ইংরেজ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, আজ ভারতের একছত্র সম্রাট্। পর্ত্তুগীজ জাতিই তাহাদের পথ প্রদর্শক। কাহার অদৃষ্ট কি ভাবে পরিচালিত হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সোণার বাঙ্গলায় তখন ধনের অভাব ছিল না। টাকায় ৮মণ চাউল বিক্রীত হইত। পর্ত্তুগীজগণ চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিয়া বাঙ্গলাই তাহাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন। সমস্ত বঙ্গভূমিতে তখন স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকায় তাহাদের বাণিজ্য ও দিন দিন প্রসার লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গলার এই প্রভূত ধন সম্পদের দিনে তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে অগাধ ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হইবেন। অদৃষ্টচক্রে তাহা হইয়া উঠিল না। পরে তাঁহারা দেশীয় রাজন্য বর্গের অধীনে সামান্য সৈনিক বৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাতেও তাহারা আপনাদের পরাক্রম প্রকাশ না করেন নাই বটে, কিন্তু ভাগ্য চক্রের অবশ্যম্ভাবী আবর্ত্তনে অবশেষে তাঁহারা ঘৃণ্য দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, পাশ্চাত্য সভ্য জাতির নামে কলঙ্কারোপ করিয়াছেন। ইহাদের সহিত মগেরাও যোগদান করিয়াছিলেন ইহারা লোকজনের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুত্র কন্যা পর্য্যন্ত হরণ করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। ইহাদের উপদ্রবে বাঙ্গলার অনেক স্থান জনশূন্য হইয়াছিল। আজও সুন্দরবন তাহার ফলে জনমানবশূন্য নিবিড় অরণ্যানীতে পরিণত হইয়া আছে। (১১)

বাঙ্গলার বারভূঞা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা পাঠান শাসন একদিকে এবং অন্যদিকে মোগলদের হাত হইতে দেশ রক্ষা করিয়া, দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের রাজত্ব অবসানের পর ফিরিঙ্গী জল দস্যু ও মগগণ বাঙ্গালায় যে অশান্তির সঞ্চার করিয়াছিল "মগের মুলুক" শব্দদ্বয় আজও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহাদের অত্যাচার কাহিনী এত অমানুষিক ছিল যে এখন উহা শুনিলে আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় বোধ হয়। পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থের নিমিত্ত তদানীন্তন এক জন পারস্য ভাষাবিৎ গ্রন্থকারের গ্রন্থের অনুবাদ দেওয়া হইল। ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আমরা কেন "মগের-মুলুক" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি।

"আরাকান হইতে মগ ও ফিরিঙ্গিগণ প্রতিবৎসর জল পথে বাঙ্গালায় ডাকাতি করিতে

---

10 That he had this Inscription upon his colours —
"Fatekhan by the Grace of God, Lord of Sundiva, shedder of Christian blood and destroyer of Portuguese nation" The Portuguese Asia.

11 'In early times the Mags used to commit depredation in the Sunderlans and in Remel's map a large tract is marked depopulation by them" (Beveridge) Page 35

আসিত। হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী দরিদ্র যাহাকে পাইত বন্দী করিত এবং তাহাদের হাতের পাতা ফুটা করিয়া, তা'র মধ্যে পাতলা বেত চালাইয়া বাঁধিয়া নৌকার পাটাতনের নীচে (deck) ফেলিয়া লইয়া যাইত। যেমন খাঁচার মধ্যে মুর্গিকে দানা ফেলিয়া দেওয়া হয়, তেমনি এদের জন্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধ সিদ্ধ দেওয়া হইত। এত কষ্টে ও অত্যাচারে অনেকে মরিয়া যাইত। * * * যে কয়টী "শক্ত প্রাণ" লোক বাঁচিয়া থাকিত, তাহাদের চাষবাস ও অন্যান্য নীচ কাজের জন্য দাস ভাবে রাখিত অথবা ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদিকের নিকট দাক্ষিণাত্যের বন্দরে বিক্রয় করিত। * * শুধু ফিরিঙ্গীরা এইরূপে বন্দী বিক্রয় করিত। মগেরা তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখিত। কত সম্ভ্রান্তলোক, কত সৈয়দ বংশজাত মুসলমান, মুসলমানী এই পিশাচদের দাসত্ব করিতে অথবা ঘৃণ্য সহবাসে থাকিতে বাধ্য হইত। ইউরোপে মুসলমানদের প্রতি যে সব নির্য্যাতন হইত না, এখানে ফিরিঙ্গীরা তাহা করিত।" (১২) অত্যাচার আর কাহাকে বলে?

এই সকল জলদস্যুর মধ্যে গঞ্জালিস ফিরিঙ্গীই প্রধান ছিল। পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরের অনতিদূরে সেণ্ট এণ্টনি ডেল তোজাল নামক একখানি অপরিচিত গ্রামে গঞ্জালিস জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ পরিচয় এখনও ঐতিহাসিকগণের নিকট অপরিচিত। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এদেশে আগমন করেন। তিনি অতিশয় উচ্চাভিলাষী, পরিশ্রমশীল ও অধ্যবসায়ী লোক ছিলেন। তিনি এদেশে আসিয়া প্রথম সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু ধন লিপ্সায় বহুদিন তিনি ঐ কাজ করিতে পারিলেন না। তিনি অন্যান্য পর্ত্তুগীজের ন্যায় ব্যবসায়ে ধন বৃদ্ধি করিবার জন্য কৃত সংকল্প হইয়া সন্দ্বীপে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার লবণের ব্যবসায়ে কিছু অর্থ-সঞ্চয় হইলে তিনি তদ্দ্বারা "জেলিয়া" নামক একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ ক্রয় করেন। ইহা দ্বারা সন্দ্বীপ হইতে লবণ নিয়া চট্টগ্রাম ও ডায়েঙ্গা বন্দরে ব্যবসায় করিতে থাকেন।

12. "Arracan pirates both Magh and Firingi used constantly to come by the water route and plunder Bengal. They carried off the Hindoos and Muslims, male and female great and small, few, and many, that they could sieze, pierced the palms of their hands, passed their canes, through the holes, and threw them one above another under the deck of their ships. In the same manner as grain is flung to fowl, every morn and evening they threw down from above uncooked rice to the captives as food. On return to their homes, they employed the few hard lives (captives that survived this treatment) with great disgrace and insult in tillage and other hard tasks, according to their power. Others were sold to the Dutch English and French merchants at the port of Deccan."

Babu Jadunath Sarker,
Journal of the Asiatic Society of Bengal
Vol. III (New series) page 422,

এই সময়ে আবাকান রাজ সেলিম সাঁব (মেংবাজগি) অধীনে অনেক পর্ত্তুগীজ সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত ছিল। ফিলিপ, ডি, ব্রিটো বা নিকোটী (Philip de Brito Nicotie) নামে একজন পর্ত্তুগীজ তাহাদেব অন্যতম। ক্রমে সে আপন বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে প্রবল হইয়া উঠিলে, আবাকান রাজ তাহাকে পেগুর সাইরাম বন্দরের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ব্রিটো ক্রমে আরাকান বাজের অধীনতা ত্যাগের প্রয়াসী হন। আরাকান রাজ তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পাবিয়া ব্রিটোব দমনে প্রস্তুত হন। এদিকে ব্রিটোর স্বাধীনতা স্পৃহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তিনি দেখিলেন পর্ত্তুগীজদের বাসভূমি ডায়েঙ্গা অধিকারে আসিলে তাহার অনেক সুবিধা হয়। ব্রিটো ডায়েঙ্গা গ্রহণেব প্রস্তাব কবিয়া আরাকান-রাজ নিকট তাহার পুত্রকে পাঠাইয়া দেন। তিনি কৌশলে ডায়েঙ্গা হস্তগত কবিয়া পরে বাজাকে তাহার অধিকাব চ্যুত কবিবেন বাজাব এরূপ বিশ্বাস হওয়ায়, রাজা দরবাবে বিটোর পুত্র ও তাহার কর্ম্মচারীগণকে আহ্বান কবিয়া পাঠান। তাহাবা তথায় উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাদিগকে হত্যা কবিবাব আদেশ দেন। তাহাদেব জাহাজেই উক্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তৎপব ডায়েঙ্গা বাসা পর্ত্তুগীজদেব উপর তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি ঐ ক্রোধবশে ডায়েঙ্গাবাসী ৬০০ পর্ত্তুগীজের প্রাণ সংহাব করিলে ডায়েঙ্গাব হতাবশিষ্ট পর্ত্তুগীজেবা পর্ব্বতে ও অরণ্যে ৯।১০ খানি জাহাজ নিয়া সমুদ্র মধ্যে পলাইয়া যায়। উহার মধ্যে গঞ্জালিসের জাহাজখানিও ছিল। এই দুর্ঘটনা ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে হইয়াছিল।

গঞ্জালিস প্রমুখ পর্ত্তুগীজগণ কিছুকাল সমুদ্রে অবস্থানের পর ঘৃণিত দস্যুতা বৃত্তি অবলম্বন কবিয়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ কবিতে লাগিলেন। তাহাদের নেতাব অভাবই ইহার মূলীভূত কাবণ-বলিয়া অনুমিত হয়। এই পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ লুণ্ঠন ব্যপদেশে চতুর্দ্দিকে উপদ্রব আরম্ভ করিলেন, তদানীন্তন "সন্দীপেব" মুসলমান শাসন কর্ত্তা "ফতেখাঁ" তাহাদের উপদ্রবে উত্তক্ত্য হইয়া তাহাদের দমনেব জন্য কৃতসংকল্প হন। তাঁহাব বিশ্বাস ছিল, পর্ত্তুগীজগণ ক্ষমতায় ও সংখ্যায় তাঁহার সেনাগণ হইতে অনেক হীন, তাই তাহাদিগকে জয় করা অতি সহজ হইবে। কিন্তু ঘটনা তৎবিপরীত হইয়াছিল।

"ফতেখাঁ" জানিতে পাবিলেন গঞ্জালিস প্রমুখ পর্ত্তুগীজগণ দক্ষিণ সাবাজপুরের নিকট নঙ্গর করিয়া আছে। একদিন সন্ধ্যাব সময় ফতেখাঁ ৬০০ সৈন্য ও ৪০ খানি রণতরী নিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। অধিক সংখ্যক সৈন্য লইয়া অতর্কিতভাবে পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করায় ফতেখাঁ মনে কবিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পরাজিত করিবেন। কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। পর্ত্তুগীজগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও তাঁহাবা নৌবিদ্যা বিশারদ ও কামান পরিচালনে সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। পর্ত্তুগীজদের মাত্র ১০খানি জাহাজ ছিল। তাঁহারা সমস্ত রাত্রি সাহস ও নিপুণতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে "ফতেখাঁর" বহু সৈন্য হত অবশিষ্ট সৈন্য আহত হয়। সমস্ত জাহাজগুলি পর্ত্তুগীজদের হস্তগত হয়। অবশেষে ফতেখাঁও এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

পর্ত্তুগীজগণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ও নেতার অভাবে সন্দীপ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে গঞ্জালিসকে তাহাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া সন্দীপ অধিকারে কৃত সংকল্প হইলেন। পর্ত্তুগীজদের এই অভাবনীয় জয়লাভের কথা শুনিয়া বঙ্গদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পর্ত্তুগীজগণ দলে দলে আসিয়া তাহাদের দলবৃদ্ধি করিতে লাগিল। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই গঞ্জালিস বহু সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া পড়িলেন। এবং আপনাকে অধিক পরাক্রমশালী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এরূপ ক্ষমতা-শালী হইয়া ও প্রতিবেশী নরপতিগণের সাহায্য ব্যতীত তাঁহার সন্দীপ জয় করা দুরূহ বিবেচনা করিয়া, তিনি বাকলার অধিপতি রামচন্দ্র রায়ের শরণ লইলেন। তাঁহার সহিত পূর্ব্ব হইতে গঞ্জালিসের সৌহার্দ্দ্য ছিল। পর্ত্তুগীজগণ তাহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি তাঁহার রাজ্যে বিক্রয় করিত। সন্দীপ জয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থী হইয়া, উভয়ে এইরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন যে বাকলা-রাজের সাহায্যে সন্দীপ জয় করিতে পারিলে, সন্দীপের অর্দ্ধেক রাজস্ব তাঁহাকে দিবেন। উক্ত প্রস্তাবানুযায়ী বাকলা রাজ রামচন্দ্র রায়, সন্দীপ আক্রমণ জন্য কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ ও ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া গঞ্জালিসের সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গঞ্জালিসের অধানে ৪০ খানি যুদ্ধ জাহাজ ও ৮০০ পর্ত্তুগীজ সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। এদিকে ফতেখাঁর ভ্রাতা বহু সংখ্যক মুসলমান সৈন্য লইয়া সন্দীপ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। পর্ত্তুগীজগণ তীরে অবতরণ করিতে লাগিলে তিনি বিপুল বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। তাহাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে পর্ত্তুগীজদের বীরত্বে, ফতেখাঁর ভ্রাতা দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পর্ত্তুগীজগণ দুর্গাবরোধ করিয়া অনেক দিন তথায় অবস্থিতি করেন। এদিকে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য গোলা গুলি, বারুদ প্রভৃতি ফুরাইয়া যাওয়ায় তাহাদের ধ্বংশ ঘটিবার উপক্রম হয়।

ভগবানের লীলা অসম্ভব। ইহার রহস্যোদ্ভেদ মানব শক্তির বহির্ভূত। পর্ত্তুগীজগণ প্রাণভয়ে অনাহারে সন্দীপ ত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় কোথা হইতে, একখানি স্পেনীয় জাহাজ আসিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়। উক্ত জাহাজের অধ্যক্ষ গ্যাসপ্পার ডি পাইন অতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি রাত্রিযোগে মাত্র ৫০ জন সৈন্য লইয়া, কতকগুলি আলো জ্বালাইয়া, দামামা বাজাইতে বাজাইতে দুর্গদিকে অগ্রসর হন। বিপক্ষেরা মনে করিয়াছিল, তিনি বহুসহস্র সৈন্য নিয়া গঞ্জালিসের সাহায্যার্থ আসিতেছেন। তাহাদের এই ভীতি পরাজয়ের কারণ হইয়া পড়িল। স্পেনীয়েরা গঞ্জালিসের উদ্ধার সাধন করিয়া, দুর্গমধ্যে প্রবেশকরেন। তথায় ফতেখাঁর বহুসৈন্য তরবারির আঘাতে বিনষ্ট করেন। পরে স্থানীয় লোকগণ গঞ্জালিসের বশ্যতা স্বীকার করিলে, তাহাদের সাহায্যে তিনি, সহস্রাধিক মুসলমানসৈন্য ধৃত করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করেন। দুর্গমধ্যেও প্রায় এই পরিমাণ লোক নিহত হইয়াছিল। এইরূপে গঞ্জালিস সন্দীপের

একাধীশ্বর হইয়া, সন্দীপ বাসী সমস্ত পর্ত্তুগীজ ও দেশীয়দের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশে সন্দ্বীপ তখন শস্য সম্পদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং লবণের ব্যবসায়ের জন্য সর্ব্বত্র পবিচিত। সেইজন্য নানা দিকদেশ হইতে বহুবণিক এখানে বাণিজ্যার্থ সমাগত হইত। গঞ্জালিস দাম্ভিক ও অকৃতজ্ঞ হইলেও রাজ্য শাসন ও অর্থনীতি ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার ধনবৃদ্ধির জন্য তিনি তথায় একটী শুল্কাগার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং প্রথমত তাঁহার অধীনস্থ পর্ত্তুগীজ দিগকে যে সব ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহাও তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া নিয়াছিলেন। বাণিজ্য শুল্কে ও রাজস্বে তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক ও অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। (১৩) বাকলারাজ তাঁহার সাহায্য করায় তিনি সন্দ্বীপ অধিকার কবিতে পাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাব সাহায্য ও তাঁহার সহিত প্রস্তাবিত সন্ধি প্রতিপালন করা দুরে থাকুক, তিনি তাহার বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হন। তাহার দুর্ব্যবহারে বাকলা রাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহার সহিত সম্পর্ক ছেদনের ইচ্ছা করিলে, গঞ্জালিস তাঁহাব রাজ্য আক্রমণ করিয়া, সাহাবাজপুব ও পাতলেভাঙ্গা নামক দুইটী স্থান বাকলা রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক রাজগণের নিকট হইতেও তিনি ছলে বলে অনেক স্থান অধিকার করিয়া নিয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ অভাবনীয় বিজয়েব সংবাদ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, অনেক নিকটবর্ত্তী রাজন্যবর্গ তাঁহাব সহিত বন্ধুতাস্থাপন করিয়াছিলেন। এ সব কারণে তিনি সন্দ্বীপের একজন স্বাধীন নৃপতি হইয়া বসিলেন! ১৬১০ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ হইল। তাঁহার সময়ে আবার সন্দ্বীপ পর্ত্তুগীজ ও দেশীয় ফিরিঙ্গী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি এ সময় ১০০০ পর্ত্তুগীজ, ২০০০ সশস্ত্র বাঙ্গালী, ২০০ অশ্বারোহী ও ৮০খানি কামান সজ্জিত জাহাজে পরিবৃত থাকিতেন।

তাঁহার শাসনকালে তিনি কি মোগল কি আরাকান রাজ কাহাকেও কখন কোন কর প্রদান করেন নাই। তাঁহার শাসন-সময়ে তাঁহাব অধীনস্থ প্রজাগণ ও কর্ম্মচারীবর্গ অত্যন্ত সম্পত্তিশালী হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয় পর্ত্তুগীজদের এই প্রভাব বহুদিন বর্ত্তমান ছিল না। গঞ্জালিসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সন্দ্বীপের পর্ত্তুগীজ ক্ষমতাও চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহা প্রবন্ধান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস।

---

13. "As he grew Great, so he grew Insolent and ungrateful."
Portoguese Asia

মুসলমান শিক্ষায় হজরত মহাম্মদ (দঃ)

(Collected from The Sayings of Mahamed.)

১। "যিনি বিদ্বানকে সম্মান করেন তিনি আমাকে সম্মান করেন।"

২। "মানুষের মহাপাপ কি" জিজ্ঞাসিত হইয়া ঈশ্বরদুত হজরত মহম্মদ বলিলেন, 'আমাকে পাপের কথা জিজ্ঞাসা করিও না আমাকে পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা কর!" কিন্তু প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য তিনবার অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন "দুশ্চরিত্র বিদ্বান জগতে মহাপাপী ও সচ্চরিত্র বিদ্বান মহা পুণ্যবান।"

৩। "ঈশ্বর কখনই তাঁহাব দাসবৃন্দের হস্ত হইতে বিদ্যা প্রতিগ্রহণ করেন না, কিন্তু তিনি বিদ্বদ্গণকে অপসারিত কবেন। সুতরাং বিদ্বজ্জনের অনুপস্থিতিতে মূর্খেরা বিষয়কর্ম্মের শীর্ষস্থানে আরোহণ কবে। বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহারা না বুঝিয়া অন্যায় দণ্ড বিধান করে; স্বীয় মূর্খতার পরিচয় প্রদান কবে এবং অন্যকে ভ্রান্তিমার্গে চালিত করে।"

৪। "বিস্মৃতি জ্ঞানের প্রবল অন্তরায়; অপাত্রে বিদ্যাদানই বিদ্যাক্ষয়। বিদ্বান কে? যিনি অর্জ্জিত বিদ্যার দ্বারা পরিচালিত তিনি।"

৫। "একজন বিদ্বান, শয়তানকে, সহস্র মূর্খোপাসক হইতে ও অধিকতর ঘৃণা ও কঠোরতার চক্ষে দেখে। প্রত্যেক মোসলেমেব পক্ষেই জ্ঞানস্পৃহা স্বর্গীয় আদেশ। অপাত্রে বিদ্যাদান উলুবনে মুক্তা ছড়ানর ন্যায়।"

৬। "বিদ্বানের মসী ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণদাতার রক্ত অপেক্ষাও পবিত্রতব।"

৭। "যিনি জ্ঞানান্বেষণে গৃহত্যাগ করেন তিনি ঈশ্বরের পথে পরিভ্রমণ করেন।"

৮। "জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়োজন হইলে চীনদেশেও যাইও। সূতিকা-গৃহ হইতে কবর পর্য্যন্ত জ্ঞানোপার্জ্জন কর। যে জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন তাহা, যে ধনকোষ হইতে ঈশ্বরোদ্দেশে দান করা হয় না তাহার অনুরূপ।"

৯। "অতিমাত্র উপাসনা হইতে অতিমাত্র বিদ্যা গরীয়সী। সংযমই ধর্ম্মের ভিত্তি।"

১০। "সমস্ত রাত্রি উপাসনা হইতে এক ঘণ্টাকাল বিদ্যা দান অধিকতর ফলপ্রদ।"

১১। "যিনি জ্ঞানান্বেষণ করেন ও জ্ঞান লাভ করেন তাঁহার জন্য দুইটী পুরস্কার—একটি তাহার জ্ঞানলাভ লিপ্সা ও অপরটি তাহার কৃতকার্য্যতা; সুতরাং অকৃতকার্য্যজনও অন্ততঃ পক্ষে প্রথমোক্ত পুরস্কারটী লাভ করেন।"

১২। "ধর্ম্মজ্ঞানের অভ্যুদয়-সাধনার্থ জ্ঞানার্জ্জনকালে যিনি ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি প্রায়ই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের ন্যায় পুণ্যবান।"

১৩। "যিনি শিক্ষার পথ অবলম্বন করেন ভগবান তাঁহাকে স্বর্গের পথ প্রদর্শন করিবেন। চন্দ্রের উপস্থিতিতে তারকা যেমন ম্লান-প্রভা বিদ্বানের উপস্থিতিতেও মূর্খোপাসক তেমনি বিগত-দীপ্তি।"

১৪। "প্রত্যেক মুসলমানেরই—স্ত্রী হউক আর পুরুষই হউক—বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

১৫। "জ্ঞানার্জ্জন কর। বিদ্যা ন্যায় ও অন্যায় বুঝিবার ক্ষমতা প্রদান করে। স্বর্গের পথ আলোকিত করে। ইহা মরুভূমিতে বন্ধু, নির্জ্জনে সঙ্গী, নিরুপায়ের অবলম্বন। ইহা মানুষকে সুখের পথে চালিত করে, বিপদে সান্ত্বনা ও বল দেয়। বন্ধু সমাজে ইহা আমাদের ভূষণ ও শত্রু সমাজে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র।"

১৬। "জ্ঞান প্রভাবে মানব উন্নতি ও সম্মানের চরমশিখরে উন্নীত হয়। ইহার প্রভাবে মানুষ ইহজগতে রাজ সমকক্ষ ও পরজগতে সুখ-শান্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।"

নাদের-উজ-জমান।

নূতন ও পুরাতনের সামঞ্জস্য।

"Glad sight, wherever new with old
Is joined through some dear homeborn tie."

(New and Old) *W. Wordsworth*,

আসিতেছে, আর যাইতেছে; ধরিয়া রাখিবার মত শক্তি কাহারও নাই; অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে। চ'খের পলকও তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে না। মুহূর্ত্তের মাঝে তুমি কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিলে? ছুটিয়া চলিয়াছে অতীতের পুরাতনের গহ্বরে। নূতন আর নূতন—'নিতুই নব'—সকলকে আহ্বান করিতেছে। এই যে নূতন, ইহারই মাঝে পুরাতনের ক্ষুদ্র কি মহান্ অভিব্যক্তি আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সুদূর অতীতে যে বীজাণু নূতনত্বের নূতন পশরা দেখাইয়া জগৎকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিল, আজ তাহার বংশধরগণ জগতের ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরও কত বেশী পরিমাণে জগতের আনন্দ সংবর্দ্ধন করিতে পারিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। পুরাতনকে ছাড়িয়া নূতন যে চলিতে পারে না, পারিবে না, সম্যক উপলব্ধি করিতে হইবে। পুরাতনের সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা লইয়াই ত আজ নূতনের নূতনত্ব, আদর ও সম্মান। জগৎ সৃষ্টির পর হইতেই নূতন ও পুরাতনের এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। কেহ কাহাকেও অস্বীকার করিবার যো নাই। পরিবর্ত্তন—সে যে জগতের নিয়ম। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই জগতে ক্রমোন্নতি বা ক্রম বিকাশবাদ। কাল সে যে অতি ভয়ানক; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক কালের হাতে ধরা দিতে হইবে। কিন্তু এজন্য ত তুমি অসন্তুষ্ট নও! কারণ সে যে তোমার দুরন্ত এক ঘেঁয়েমির হাত হইতে রক্ষা করিয়া নবজীবন, নূতন সরসতা প্রদান করিতেছে; আনন্দ হইতে আনন্দে—পরমানন্দে লইয়া যাইতেছে। এই যে সুবিশাল পৃথ্বী

ব্যাপিয়া নিসর্গসুন্দরীর অসীম অনন্ত সৌন্দর্য্য তোমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; ইহার মাঝে প্রতিদিন কতভাবে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে! নানা ঋতুতে নানাপ্রকার বেশ ভূষায় সজ্জিতা হইয়াই ত সুন্দরী তোমাদিগকে এত মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রতিদিন তোমার প্রিয় ব্যক্তি যদি একইভাবে বেশ ভূষা করে, একই ভাবে তোমাকে আহ্বান করে, তবে তুমি ক্রমশঃ তাহার মিলন জনিত আনন্দ হারাইতে থাক; হৃদয়ে তোমার অবসাদ আসে; কিন্তু নিত্য নূতন ভাবে পরিবর্ত্তনই তোমাদিগকে পরস্পরের স্নেহ প্রীতিতে বদ্ধ রাখে। পরিবর্ত্তন নাই কোথায়? পৃথিবীর যেদিকে তাকাও না কেন, পরিবর্ত্তনের—পুরাতন ও নূতনের আনাগোনা দেখিতে পাইবে। পুরাতনকে দূরে সরাইয়া নূতনের পশ্চাতে ধাওয়া আজ কাল অনেকেরই স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। পুরাতনের মাঝে যে কোনপ্রকার সৌন্দর্য্য রহিয়াছে তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। এই ভুলিয়া যাওয়ার জন্য তাহাদিগকে বেশী দোষ দেওয়াও চলে না; কারণ জগতের নিয়মই এই, 'মান্ধাতার আমলের কথা আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে না।' কিন্তু ভাবুক যাঁরা, সমালোচক যাঁরা, তাঁরা এই মান্ধাতার আমলের কথার ভিতরেই নূতনের আভাস পাইয়া থাকেন।

আজ জগতের নানা বিভাগে—সাহিত্যে, ধর্ম্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে যে চরমোন্নতি দেখিতে পাইতেছি, ইহা কি পুরাতনের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া রয় নাই? ভারতচন্দ্রের, কি চণ্ডীদাসের কি বিদ্যাসাগরের ভাষা আজ কাল চলিতে না পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিলে ত চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন লেখক বা কবিদের লেখার উপরই আমাদের আজ কালকার নূতন সাহিত্য দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহারা দুই চারি ছত্রে যে অঙ্কুর রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই কালক্রমে মহান্ মহীরুহে পরিণত হইয়া আজ সমগ্র পৃথিবীকে সুশীতল ছায়াদানে সমর্থ হইয়াছে।* তাই বলি নূতনকে ভালবাস, বেশ; কিন্তু নূতনকে ভালবাসিতে গিয়া পুরাতনকে ঘৃণা করিবে সে কেমন কথা; ভাসা ভাসা উপর দেখিয়াই ভুলিয়া যাইও না। ভাবিয়া দেখ এই যে নূতন, যার জন্য তুমি একেবারে মুগ্ধ,—সে আসিল কোথা হইতে? এই মহীরুহের মূল কোথায়? জগতের যাহা কিছু মহান্, দেখিবে অনেক সময়েই তাহা পুরাতনের রূপান্তর, না হয় পুরাতনের ক্রমোন্নতির ফল। কিন্তু একেবারে নূতন সত্যও যে আবিষ্কৃত না হয় এমন নয়।

সংযম চাই। সংযম হারাইয়া ফেলিলে সংসারের সকল দিক দিয়াই বিপদে পড়িতে হয়। সংসারে অনেক নূতন জিনিষের আবিষ্কার হইতেছে কি হইবে। নূতনকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইও না; নূতনের প্রসূতি পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিতে শিখ। পুরাতনের আলোচনা কর—নূতনের উৎপত্তি হইবে। সংযমের বাঁধন ছিঁড়িয়া পুরাতনকে বিদায় দিয়া হঠাৎ নূতনকে বক্ষে জড়াইও না। প্রথমতঃ ধীরে সুস্থিরে দেখ পুরাতনের সঙ্গে তোমার এই নূতন খাপ

* যেমন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গান ও কথা সাহিত্য এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জড়ে প্রাণের স্পন্দন ও অনুভূতি।

খায় কি না। এই যে নূতনের দিকে হঠাৎ ধাও; তখন স্বভাবতঃই তোমার মনে পুরাতনের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়, যাহাতে এই ঘৃণার উদ্রেক না হয়, তাহাই করিতে হইবে। নূতন ও পুরাতনের সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া দেওয়া ত তোমার কর্ত্তব্য নয়। বিরোধ উপস্থিত হইলে, নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষে দেশে একটা মহা বিপ্লব উপস্থিত হইবে। গঙ্গা যমুনা যেমন প্রথমতঃ আপনাদের মাঝে সামান্য ব্যবধান রাখিয়া অবশেষে সাগর সঙ্গমে মিলাইয়া গিয়া মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে, তেমনি নূতন ও পুরাতনের মাঝে প্রথমতঃ একটু বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও এই বিভিন্নতাকে দূরে সরাইয়া দিয়া পরস্পরকে সম্মিলিত করাইয়া এক মহান উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতঃ জগতের উন্নতি বিধান করিতে হইবে। নূতনের চেয়ে পুরাতনের কল বেশী, অভিজ্ঞতা বেশী। তাই এত দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ পুরাতনকে সম্মান করিয়া চলাইত নূতনের মহত্বের পরিচয়, নূতনের আগমনেই পুরাতনকে আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে হইবে, এমনটী কিছুতেই উচিত হয় না। যে সকল জাতি প্রাচীনকাল হইতেই সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়া আসিয়াছে, সেই সকল জাতির মনীষিগণ একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। আধুনিক সভ্যতা প্রাপ্ত জাতিও একথা অনেক সময় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কোন সংস্কারক একথা না মানিয়া চলিতে পারিবেন না। ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতি সংস্কারকগণ সকলদেশেই এ পথের পথিক। যখনই যে দেশে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে, তখনই তৎ তৎ দেশে ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপের ইতিহাস পাঠ করিলে এরূপ সহস্র সহস্র বিপ্লবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। নূতন ও পুরাতনের বিরোধে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইউরোপ নরশোণিতে প্লাবিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এরূপ ব্যর্থ প্রয়াসের পর ইউরোপ এখন নূতন ও পুরাতনের মিলন ঘটাইয়া এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি সম্পাদন করিয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যেরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি এক এক বিষয়ে এতদূর অগ্রণী হইয়াছিলেন যে আজ পর্য্যন্ত কোনও জাতি তাঁহাদেব সমকক্ষ হইতে পারে নাই। একথা অস্বীকার করা চলে না যে তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ তাঁহাদের প্রণালীকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিয়া ক্রমশঃ নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগকে দেখিতে হইবে সেই সকল অলঙ্কার কি পরিমাণে জগতের উন্নতি সাধন করিয়াছে। আমরা যে গর্ব্ব করি আমরা তাঁহাদের চেয়ে অনেক পরিমাণে সভ্য ও উন্নত হইয়াছি। কিন্তু বৃথা লম্ফ ঝম্প না দিয়া একটু সংযতভাবে চিন্তা করিলেই আমরা আমাদের সভ্যতার ধারা ও গতি নির্দ্দেশ করতঃ দেখিতে পাই যে যদিও আমরা—অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ এই দুইয়ের শেষোক্ত বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছি, তথাপি আমরা অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী, বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারি নাই; বরং অধিক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছি। অন্তর বাহিরের সামঞ্জস্য রক্ষা না করিয়া ক্রমশঃই আমরা 'বাহিরের' প্রতি এত বেশী ঝুকিয়া পড়িয়াছি যে সত্বর সাবধান না হইলে, অন্তরের যে ক্ষীণ আকর্ষণটুকু

এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা অকস্মাৎ একদিন ছিন্ন হইয়া যাইবে আর আমরা ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ দেহ লইয়া পড়িয়া থাকিব। প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা অন্তরকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন; আর মায়াময় বাহিরকে যতটুকু দেখা নিতান্ত দরকার, মাত্র ততটুকুই দেখিয়াছিলেন। যাহা সত্য ধ্রুব অনাদি অনন্ত অসীম সেই অন্তরকেই তাঁহারা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে দর্শন করিয়া অনন্ত জ্ঞান লাভ করতঃ মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহাদের মতে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই কেবল একমাত্র সত্য। জগতের সকল বস্তুই অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর। জগতের আদি কারণ ব্রহ্মই নিত্য, অপরিবর্ত্তনশীল ও অবিনশ্বর। বাস্তবিক "আমরা আছি বলিয়াইত আমাদের বহির্জ্জগৎ আছে, আমরা নিজের মনের সৃষ্টি বাহিরে আরোপিত করিয়া নিজ নিজ বহির্জ্জগতের সৃষ্টি করিয়াছি পরন্তু বহির্জ্জগৎ বিষয়ক জাতি ও সাধারণ নাম স্পষ্টতঃ আমাদের সৃষ্টি, তাহা বহির্জ্জগতে নাই।" তাঁহাদের আদর্শ ছিল আধ্যাত্মিক; আর আমাদের আদর্শ হইল দেহাত্মক; কেবল ভোগ বিলাসে মগ্ন হইয়া বিলাসের নানা উপকরণ, উপাদানের নব নব সৃষ্টি সম্পাদন করিতেছি। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কতকগুলি নূতন অভাব অভিযোগের সৃষ্টি করিয়া জীবনকে কেবল দুঃখ পূর্ণ করিয়াই তুলিতেছি; কিন্তু এখনও আমরা তাঁহাদের ন্যায় তেমন সুবিশাল ধর্ম্মভাব হর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া উঠাইতে পারি নাই। এই যে এতকালের দুইখানি প্রাচীন গ্রন্থ—রামায়ণ ও মহাভারত—তাহা এই সভ্যতাভিমানের দিনে আজিও আমাদের প্রাণে অপূর্ব্ব ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিতেছে। এত প্রাচীন বলিয়াও ত গ্রন্থ দুইখানি সভ্যতার পশ্চাতে পড়িয়া রয় নাই। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ স্মরণাতীত কালে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আজিও সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া আছে। এত সভ্যতার দিনেও কেহও তাহাদের অমরত্ব ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় নাই, হইবেও না। সেই জন্য বলি পুরাতনকে হঠাৎ অবহেলা করিয়া দূরে সরাইয়া দিও না। আচ্ছা, তোমরা এই সকল বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মূল্যবান এমনতর ধর্ম্মগ্রন্থ জগতকে দান করিতে পারিয়াছ কি? বিলাস বাসনাকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাচীন আর্য্যঋষিরা যে সংযম ও জ্ঞান গৌরবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহার আবার নূতন সৃষ্টি তোমাদের এই যুগে হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সুখ দুঃখের অতীতে এমন এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মজীবন তাঁহারা গঠন করিয়াছিলেন যাহা আজকাল আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। এখন আমরা আমাদের নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনে কত হীন হইয়া পড়িয়াছি! সংসারের সামান্য সুখ দুঃখের আবেশ ও সংঘর্ষে আমরা একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ি। সংযম কাহাকে বলে আমরা যেন ভুলিয়াই গিয়াছি। ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন। ধর্ম্মই ছিল তাঁহাদের জীবনাকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা। এমন কুসংস্কারপূর্ণ কতকগুলি সামাজিক আচার ব্যবহারের ভিতরেই তাঁহারা ধর্ম্মকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। ধর্ম্মের এই শোচনীয় পরিণামের দিনে আজ-কাল আমাদের স্ব স্ব সুবিধা ও ভোগ বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য ধর্ম্মকে আমরা আমাদের

মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইতেছি। ধর্ম্মের আমরা অনুসরণ করি না; ধর্ম্মই আমাদের মনের মতন নূতনভাবে গঠিত হইয়া আমাদের অনুসরণ করে। কোনও প্রকার বাঁধন নাই, শাসন নাই। উদ্দাম যুবকের মত পথ চলিতেছে। শাসনই বা করিবে কে? কেন, সমাজ? তোমাদের কথায় এত দুঃখেও হাসি আসে। সমাজের রাখিয়াছ কি যে আজ সমাজের দোহাই দিতেছ! পলে পলে সমাজের অস্থি মজ্জা সকল তুষের আগুনে পোড়াইয়া দিয়াছ? আবার সমাজের দোহাই দিতেছ! একদিন ছিল, যখন সমাজের দোহাই খাটিত। সমাজকে অবহেলা করিয়াছ, ঘৃণা করিয়াছ, অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ, অহঙ্কারে পথ দেখ নাই। অন্ধ হইয়াছিলে, তাই আজ এত দুঃখ! প্রাচীন সমাজ কি সুখেরই না ছিল! সংযম, বাঁধন, শাসন সমস্তই ছিল। সমাজেব উপযুক্ত ন্যায় শাসনে কেহ কখনও পাপের ছায়া স্পর্শ করিতে পাবে নাই; দুঃখে কেহ একবারে ম্রিয়মাণ ও নিষ্পেষিত হইত না। দশের প্রীতি ও সহানুভূতির মঙ্গল হস্ত আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। স্বার্থ সাধনোদ্দেশে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া সমাজে আজি কালিকার মত এত বিবাদ বিসংবাদ ও বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত না।

ধর্ম্ম ভুলিয়া, সমাজ ভুলিয়া সকলেই কেবল স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আর আগেকার মত ধর্ম্মেব অনাবিল স্রোত সমাজ স্রোতস্বতীর অঙ্গে অঙ্গে প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ প্রাণিগণকে শান্তি সুখ প্রদান করিতে পারেনা। বর্ত্তমান সমাজ কেবল বিদ্বেষভাবে পরিপূর্ণ। মধ্যযুগ হইতে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিম্নতর শ্রেণীকে ঘৃণাব চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হহতে তাহাদিগকে বঞ্চিত কবিয়া রাখা হইয়াছিল। নানাছলে নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য কেবল দৌরাত্ম্য করা হইয়াছে। কিন্তু আজ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও উন্নত হইয়া তাহাদের অত্যাচারীদিগকে উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতে শিখিয়াছে। এই ক্ষেত্রে এবিপ্লব স্বাভাবিক।

দেশের ও দশের যাহাতে উন্নতি হয় প্রাচীনযুগের লোকেরা তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন। কিন্তু কালক্রমে সে সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থসিদ্ধিই আজকাল লোকের চরম লক্ষ্য। দেশ থাকুক কি উৎসন্ন যা'ক, বাঁচুক কি মরুক তাহাতে যেন এক শ্রেণীর লোকের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাঁহারা নিশিদিন শুদ্ধ, পুত-অন্তরে না হউক বাহিরের বেশভুষায় তিলকে-ফোটায় হইয়া থাকিবেন। কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেই তাঁহাদের যেন ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেল। আবার কেহ কেহ বলেন স্মরণাতীত কাল হইতে তোমরা যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও মতবাদদ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে, তখন তোমরা বিশ্বাস কর যে মানুষ পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফলে বিভিন্ন জাতিতে জন্ম গ্রহণ করে। অতএব একজাতি কি শ্রেণী যদি অন্যকে স্পর্শ না করে, কি নানা প্রকার বিধি-বিধানের দ্বারা শাসন করিতে যায় (এখন শাসন যতই কঠিন হউক না কেন) তাহা হইলে তাহাতে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে?

তুমি শূদ্র হইয়া জন্মিয়াছ, তখন তোমার এত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেন? যে স্থানে ভগবান তোমার জন্ম দিয়াছেন, সেখানকার কর্ত্তব্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকা বিধেয়; কিন্তু এরূপ বিশ্বাস লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার দিন যে চলিয়া গিয়াছে তাহা তাঁহারা একবার দেখেন না। আজকালকার সভ্যতা বিস্তারের যুগে এরূপ উত্মোগহীন হইয়া থাকা একেবারেই অসম্ভব। তুমি শূদ্র, তুমি নীচ, অতএব বেদ উপনিষদ্ পড়িবার অধিকার তোমার নাই। "পুরান বলিল, বেদের অমুক শাখায় অমুক অংশ কলিযুগের জন্ম কিন্তু বেদত একথা বলিতেছে না। ভৃত্য কি কখন প্রভুকে আজ্ঞা করিতে পারে?" * কিন্তু প্রভু বেদের কোথায়ও এমন কথা নাই। প্রাচীন যুগের উদার চরিত ও সাম্যবাদী আর্য্য ঋষিগণের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের যে কি উদ্দেশ্য ছিল তাহা ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এ যুগে কার্য্যকরী কিনা সে দিগে লক্ষ্য না করিয়া কেবল গায়ের জোরে কোন কিছু করিতে গেলে তাহা চলিবে কেন? লোকের কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও গুণানুসারেই জাতি কি শ্রেণী বিভাগ হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে সে বিধান ভীষণ আকার ধারণ করিয়া সমাজে নানা প্রকার অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। সে কালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতেন। আবার ক্ষত্রিয় ও স্বীয় গুণ প্রভাবে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু একালে তুমি নিতান্ত শাস্ত্রজ্ঞান হীন হইয়াও যদি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ কর, তবেই হইল। রামা কি শ্যামা অশেষগুণ সম্পন্ন হইয়াও নিম্নশ্রেণীতে জন্মিল, তবু তাহাব সম্যক আদর হইবে না। "একজন আচার ভ্রষ্ট স্খলিত চরিত্র, কামোন্মত্ত ও অনৃত ভাষী উচ্চবর্ণের ব্যক্তি যদি আচার নিষ্ঠ, পবিত্র চরিত্র, সংযত মনা ও সত্যব্রত অন্ত্যজন্মা চণ্ডালের স্পৃষ্ট জলও পান করে তবে বর্ত্তমান যুগে তিনি সমাজ কর্ত্তৃক জাতিচ্যুত হইবেন। কোন বেশ্যাশক্ত নিরক্ষর ও পাপানুরক্ত ব্রাহ্মণ নির্ব্বিরোধে দেবতার পূজা করিতে পারেন; কিন্তু একজন পূত চরিত, ধর্ম্মানুরক্ত পুণ্যবান শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত যদি নিম্ন জাতীয় হিন্দু হন তবে সেই হতভাগ্যের দেব মন্দিবে প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত অনেক স্থলে নিষিদ্ধ। † শুদ্ধচিত্ত শাস্ত্রবিদ্ চণ্ডাল মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে দেবতার পূজো উপকরণ নাকি অপবিত্র হইয়া যাইবে? ভগিনী নিবেদিতা একদিন দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ীতে কালী দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি ভিতরে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহাকে পূজারীরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। পূজারীবা জানিতেন যে তিনি বিবেকানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। তিনি তখন সঙ্কোচিত ভাবে মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আপন মনোভাব মায়ের চরণে উৎসর্গ করিয়া বিদায় লইলেন। ভগিনীর মনে তখন কি ভাবের উদয় হইয়াছিল জানি না! কিন্তু তিনি য়ুরোপীয় যে বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তোমার হিন্দুধর্ম্মের জন্ম প্রাণপণ করিলেন, তোমরা এইভাবে তাঁহাকে প্রতিদান

* ভাবতে বিবেকানন্দ

† শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় মহাশয়ের বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।

প্রদান করিলে! হায়, প্রাচীনকালে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত এমন ছিল না। কাঙ্গালের ঠাকুর ত সে কালে দীন দুঃখী উচ্চ নীচ সকলকেই অযাচিতভাবে প্রেম দান করিয়াছিলেন, আর আজ সেই দেবতার পুজারী পুরুষসিংহেরা কি অপূর্ব্বভাবেই সে প্রেমদান করিতেছেন! জিজ্ঞাসা করি ভগিনী নিবেদিতার মত কয়জন পূজারী সে মন্দিরে তখন ছিলেন? বাস্তবিক এই সকল স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতামূলক ব্যবস্থা দুর করিতে না পারিলে আমাদের উন্নতির, জাতীয় মহামিলনের আশা সুদুর পরাহত! হিন্দুর প্রতি মন্দিরে মন্দিরে যে ভীষণ অত্যাচার স্রোত চলিয়াছে, হায় কত দিনে সে সকল দুরীভূত হইয়া, আবার প্রাচীন যুগের সেই অনাবিল ধর্ম্মস্রোতে দেশ প্লাবিত হইয়া, ভারতবাসীর স্ব স্ব কর্ম্মময় জীবনক্ষেত্রকে প্রেমময় শস্য-সম্পদে পূর্ণ করিয়া তুলিবে? (ক্রমশঃ) শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন।

মেঘনা বক্ষে সন্ধ্যা

মুক্ত সুনীল আকাশ সুদুর
মুক্ত-সলিলে পড়েছে নমি,
মুক্ত পবন বহ আরবার
মুক্ত মেঘনা-বক্ষ চুমি'।
এসগো গোধুলি ধূসর-বরণা
রাঙ্গা মেঘ-বাস বুকেতে টানি'
তুমিও এসগো হাসিয়া পুলকে
সাঁঝের উজল তাবকা-বাণি!
একে একে ওই পল্লী-ভবনে
উঠিল জ্বলিয়া শতেক আলো
কে তুমি নাবিক! বেয়ে যাও তরী
সাঁঝের প্রদীপ জ্বালো গো জ্বালো।
মৃদু আলো-আভা পরশে কেমন
ঢেউগুলি আহা! নাচিছে সুখে
অমনি করিয়া তালে তালে তালে
শোণিত নাচিছে আমারো বুকে।
মুক্ত গগন, মুক্ত-পবন
মুক্ত মেঘনা-বক্ষ মাঝ
মুক্ত আমার হৃদয় আজিকে
নমিছে তোমারে রাজাধিরাজ!

শ্রীমতী আশালতা দেবী।

ভুলুয়া।

বঙ্গের প্রথিতনামা দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম মহারাজ লক্ষ্মণ মাণিক্যের নাম শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই অবগত আছেন। মেঘনা নদীর পূর্ব্বতটবর্ত্তী ভুলুয়া প্রদেশেই তিনি রাজত্ব করিতেন। বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত দ্বীপপুঞ্জের সমাহারেই ভুলুয়া পরগণার সৃষ্টি হয়। ফেণী নদীর পশ্চিম, মেঘনা নদীব পূর্ব্ব, নিত্যমুক্ত মহাত্মা সর্ব্বানন্দের সাধন-ক্ষেত্র মেহারের দক্ষিণ, বঙ্গোপসাগরের উত্তর এই চতুঃসীমা নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডই ভুলুয়া নামে পরিচিত। প্রাচীন ভুলুয়া বর্ত্তমান নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত।

আইন-ই-আক্‌বরী গ্রন্থে "ভুলুয়া" "বালা-জোয়ার" নামে অভিহিত হইয়াছে। "বালা-জোয়ার" সরকার সোণাব গাঁয়ের অন্তর্গত একটী মহাল, ইহার বার্ষিক রাজস্ব ১৩৩০৪৮০ দাম অর্থাৎ ৩৩,২৬২ টাকা ছিল। 'বালা' ভুলুয়া শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়।

"ভুলুয়া" নামের ইতিবৃত্ত এইরূপ,—বক্তিয়াব খিলিজি কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের সমকালে বিশ্বম্ভর শূর নামক মিথিলা দেশীয় কোন রাজকুমার চন্দ্রনাথ তীর্থে আগমন করেন। গৃহ প্রত্যাগমনকালে দিঙ্‌মণ্ডল কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন থাকায় নাবিকগণ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বঙ্গোপ-সাগরের উপকূলে নীত হয়; তথায় একটী দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া নাবিকগণ পোত সমূহ দ্বীপের নিকট সংলগ্ন করেন। রাত্রিকালে বিশ্বম্ভবেব প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে তাঁহারই অর্ণবপোতের দক্ষিণ পার্শ্বে বারাহী দেবী জলমগ্না আছেন, সমুদ্র হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক যথাবিধি বারাহী দেবীর অর্চ্চনা করিলে সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে বিশ্বম্ভর শূরেব রাজ্যলাভ হইবে। স্বপ্নাদিষ্ট বিশ্বম্ভর শূর বারাহী দেবীকে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থাপিত কবিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করেন।

কথিত আছে ঐ দিবস নিবিড় কুজ্ঝটিকাজালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন থাকায় বারাহী দেবীকে পূর্ব্বাস্য করিয়া সংস্থাপিত কবা হয়। দেবীর প্রীত্যর্থে ছাগ বলিদান কালেও দিগ্‌ভ্রমবশতঃ ছাগ পশ্চিমাভিমুখে সংস্থাপিত হয়, পরে সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকা অপনীত হইলে সকলেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া 'ভুল হুয়া', 'ভুল হুয়া' বলিয়া উঠেন। এই 'ভুল হুয়া' শব্দ হইতেই 'ভুলুয়া' নামের উৎপত্তি। কালক্রমে বিশ্বম্ভর শূরের প্রতিষ্ঠিত নবীন রাজ্য 'ভুলুয়া' নামে অভিহিত হয়। অদ্যাপি 'ভুলুয়া' প্রদেশে বহুস্থানে পশ্চিমাস্য করিয়া ছাগবলি দিবাব ব্যবস্থা আছে। নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান সোণাইমুড়ি ষ্টেশনেব নিকটে 'বগাদিয়া' (বক দ্বীপ) নামক স্থান জলমগ্ন ছিল, ঐ স্থানেই বারাহী দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া জনশ্রুতি। চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যেব প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও এইরূপ এক কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নবাবিষ্কৃত—শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্র-শাসনে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।* উক্ত তাম্রশাসনের আবিষ্কারে দনুজমর্দ্দন দেবের

* শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের 'শ্রীচন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্র শাসন প্রবন্ধ—সাহিত্য ১৩২০, ২৯ পৃষ্ঠা।

শুরু চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্যের নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ অপ্রামাণিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কালক্রমে ভুলুয়ার ঐতিহাসিক তথ্যাবিষ্কারের পথ সুগম হইলে রাজা বিশ্বম্ভর শূর ও বারাহী দেবী সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব জন সমাজে প্রচারিত হইতে পারে। যাহা হউক বারাহী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রথমতঃ কল্যাণপুরে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে আমিশাপাড়া গ্রামে বারাহী দেবী প্রতিষ্ঠিত। রাজা বিশ্বম্ভর শূর কল্যাণপুরে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। বারাহী দেবীও তথায়ই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে রাণী শশিমুখী যখন কাশীধামে গমন করেন তখন রাজপুরোহিত রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তীর বাটীতে বারাহী দেবী প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তদবধি আমিশাপাড়াতেই বারাহী দেবী বিদ্যমান।

ভুলুয়ার শূর-রাজ-বংশ মিথিলা হইতে ভুলুয়াতে সমাগত। রাজা বিশ্বম্ভর শূরের সহিত যে সকল ব্রাহ্মণ ভুলুয়াতে আনীত হইয়াছিলেন তাঁহারা মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিয়াই ভুলুয়া সমাজে আবহমান কাল পরিচিত। তাঁহাদের ক্রিয়া কলাপ মৈথিল পদ্ধতি অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই শূর বংশ রাঢ় দেশ হইতে সমাগত। এই অনুমানের বলে বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তদীয় 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' লিখিয়াছেন,—

"রাঢ়ে প্রথম মুসলমান আক্রমণকালে আমরা বিশ্বম্ভর শূর নামে আদিশূর বংশীয় এক রাজার নাম প্রাপ্ত হই। তাঁহাকে একজন প্রবল স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার না করিলেও একজন প্রধান সামন্ত-রাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ভুলুয়ার ইতিহাসে ও বঙ্গজ কায়স্থ কারিকায় এই বিশ্বম্ভর শূরের পরিচয় আছে। তিনি মুসলমান ভয়ে স্বরাজ্য ছাড়িয়া চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ভীমবাত্যায় পথভ্রষ্ট হইয়া ১২২৫ শকে (১২০৩ খৃষ্টাব্দ) নোয়াখালী জেলাস্থ ভুলুয়ায় আসিয়া বারাহী দেবীর প্রত্যাদেশে এখানেই স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল অপ্রতিহত প্রভাবে ভুলুয়া রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। বারভুঁইঞার অন্যতম মহাবীর লক্ষ্মণ মাণিক্য এই বিশ্বম্ভর শূরের বংশধর। এক সময়ে তিনিও এই অঞ্চলে কায়স্থ গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন, ইত্যাদি।"—(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড বা কায়স্থকাণ্ড প্রথম অংশ, ১৪৬ পৃষ্ঠা।)

এই শূররাজবংশ হইতে ভুলুয়ায় ভদ্রসমাজের প্রতিষ্ঠা। ভুলুয়াবাসিগণের ভাষাতে মৈথিল-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় মহাশয় 'বিজয়া' পত্রিকায় নোয়াখালীর ভাষা-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই বিষয়ের যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। ভুলুয়ার শূর-রাজবংশ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি। বিশ্বম্ভর শূর আদিশূরের বংশ বলিয়া এক কিম্বদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে। ভুলুয়ার প্রসিদ্ধ শূর-রাজগণের বংশাবলী দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে বিশ্বম্ভর রাজা আদিশূরের নবম পুত্র ছিলেন। *

* শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন প্রণীত 'নোয়াখালীর ইতিহাস' ১৪ ও ১০১ পৃষ্ঠা।

বঙ্গের স্বাধীন রাজা সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন কর্ত্তা আদিশূরের পুত্র খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ আদিশূরের বংশ বিদ্যমান থাকা এবং উক্ত বংশীয়গণের মিথিলায় আশ্রয় গ্রহণ করার কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শূর উপাধি দ্বারাই বিশ্বম্ভর শূর ভুলুয়া প্রদেশে আদিশূরের বংশীয় বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন। প্রাচীনকালে আদিশূর বংশীয়গণের রাজত্ব লোপের পরে বঙ্গদেশের অনেক বীর ও কৃতী ব্যক্তিকে 'শূর' উপাধি দ্বারা সমলঙ্কৃত দেখিতে পাই। পাণ্ডুকেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত 'ললিত শূরের' তাম্রশাসন (Proc. Asiatic Society of Bengal. 1877 p. 72), নেপাল হইতে আবিষ্কৃত রণ শূরের শিলালিপি (Bendall's catalogue of the Buddhist Mss, page XIII) হইতে ললিত শূর ও রণ শূর নামক দুই বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় জানিতে পারি। মান্দ্রাজ প্রদেশে তিরু মলয় গিরিলিপি হইতেও দক্ষিণ রাঢ়াধিপতি এক রণশূরের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় (গৌড় রাজমালা ৩৯ পৃষ্ঠা)। সন্ধ্যাকর নন্দি-বিরচিত 'রাম-চরিতে' 'লক্ষ্মীশূর' নামক এক সামন্ত নৃপতির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক প্রণীত চন্দ্রপ্রভা নাম্নী কুলপঞ্জিকায় লিপিশূর নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে (চন্দ্রপ্রভা ১৯৫ পৃষ্ঠা)। রাজসাহী জেলাস্থ 'মাদা' গ্রাম হইতে তৃতীয় গোপাল দেবের আধিপত্য কালে (খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর অক্ষরে) 'দামশূর' নামক এক শূর-রাজের শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। * সুতরাং এই সকল শূর উপাধিধারী মহাত্মগণের বিবরণ দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বংশে বহু শূরোপাধিক ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন। ভুলুয়ার জনশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিলেও প্রতীয়মান হয় যে এইরূপ কোন শূরবংশ মিথিলাদেশে অভ্যুদিত হইয়াছিল এবং তদ্বংশীয় বিশ্বম্ভরশূর ভুলুয়াতে আগমন করেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় কিম্বা অপর কোন বংশীয় ছিলেন। তাঁহার চতুর্থ অধস্তন পুরুষ "কবি চন্দ্র খাঁ' সর্ব্বপ্রথমে কায়স্থ সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। বিশ্বম্ভর ভুলুয়ায় আগমন করিয়া স্বজাতির সঙ্গে ক্রিয়া করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। এই কারণেই তদীয় বংশধরগণ কালক্রমে কায়স্থ জাতির সঙ্গে মিলিত হয়েন। † বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের প্রবাদ অনুসারে ভুলুয়ার শূররাজ কবিচন্দ্র খাঁ কায়স্থ সমাজের কুলীনগণের সহিত ভোজ্যান্নতা সংস্থাপন মানসে চন্দ্রদ্বীপাধিপতির নিকট আবেদন করেন। তৎকালে ভুলুয়া-রাজ কায়স্থ সমাজপতি চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ও কুলাচার্য্য-গণকে বশীভূত করিয়া কুলীন কায়স্থগণকে স্বীয় আলয়ে আহ্বান করেন। তদনুসারে কায়স্থ সমাজের কুলীনগণ ভুলুয়ার শূররাজ বংশের অন্ন গ্রহণ করায়, শূরবংশ কায়স্থ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই সময়ে পুষণ বসুর অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র হংসবসু, গোপাল বসু (বিক্রমপুর বহরের চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ) চতুর্ম্মণ্ডলের পাইমিত্র প্রভৃতি কতিপয়

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ১৪৫ পৃঃ।

† স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত 'চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ২৪ পৃঃ।

কুলীন কায়স্থ ভুলুয়ার শূবের অন্নগ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করেন। কায়স্থ সমাজের কিম্বদন্তী অনুসারে প্রোক্ত হংস বসু, গোপাল বসু ও চতুর্ম্মণ্ডলের পাইমিত্র ভুলুয়া হইতে পলায়নের অপরাধে কুলজ শ্রেণীতে অবনত হয়েন। এই ব্যাপারে চতুর্ম্মণ্ডল নিবাসী পাইমিত্রের কুল-ভ্রংশের পর বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজে মিত্র বংশের আর কুল থাকে না। চতুর্ম্মণ্ডল বিক্রমপুরের অন্তর্গত গ্রাম, সাধারণতঃ চাইর মণ্ডল নামে অভিহিত।

ভুলুয়াধিপতি কবিচন্দ্রখাঁর পুত্র রাজা রাজবল্লভ রায়। রাজবল্লভের পুত্র মহারাজ লক্ষণ মাণিক্য। তিনি একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহারই প্রভাব কালে ভুলুয়া সমাজে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েন। লক্ষণ মাণিক্য গাভার প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের পূর্ব্বপুরুষ পরমানন্দ ঘোষের সহিত আপনার এক তনয়ার বিবাহ দিয়াছিলেন।* গাভার ঘোষ বংশ বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজে কৌলিন্যের জন্য প্রসিদ্ধ; উক্ত ঘোষ মহাশয় ভুলুয়া-রাজের কন্যা গ্রহণ করায় চন্দ্রদ্বীপ সমাজে অপদস্থ হয়েন, এবং পরমানন্দ অনন্যোপায় হইয়া ভুলুয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বিষয় লইয়া চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্র রায়ের সহিত লক্ষ্মণ মাণিক্যের বিরোধের সূত্রপাত হয়। লক্ষ্মণ মাণিক্যের বিবরণ যথাসময়ে পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল। কথিত আছে লক্ষ্মণ মাণিক্য 'বিখ্যাত বিজয়' নামে একখানা সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করেন। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণবধ এই নাটকের আখ্যান-বস্তু। 'বিখ্যাত বিজয়' অতি উৎকৃষ্ট কাব্য। এই কাব্যের কবিত্ব এবং লিপি চাতুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে ভুলুয়া সমাজের অসামান্য গৌরব প্রকটিত হয়। অদ্যাপি ভুলুয়া সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ও শাস্ত্রালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ।

শ্রীবসন্তকুমার সেন গুপ্ত, বি, এল।

গুটিকয়েক কথা।

(নোয়াখালীতে ইংরাজীশিক্ষার প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে।)

চট্টগ্রাম বিভাগের গত বৎসরের শিক্ষোন্নতি বিষয়ক বিবরণীতে পরিদৃষ্ট হয় যে শিক্ষা-বিষয়ে নোয়াখালী জিলা উক্তবিভাগের অন্যান্য জিলা হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত। নোয়াখালী জিলাতে শিক্ষালাভোপযোগী বালক বালিকাগণের মধ্যে শতকরা ৬৫ পঁয়ষট্টিজন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। কিন্তু ত্রিপুরা জিলায় শতকরা মাত্র ৪৯ উনপঞ্চাশ জন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। ত্রিপুরা জিলায় দাউদকান্দী থানার অন্তর্গত পাঠশালাসমূহ পরিদর্শন কালে আমি ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি যে অধিকাংশ শিক্ষকই নোয়াখালীর অধিবাসী।

---

* শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় প্রণীত 'বার ভুঞা' ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্ববঙ্গের সারস্বত সমাজের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণকালে, ঢাকায় বহু নোয়াখালীবাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের আগমন দেখিতে পাওয়া যায়; সাধারণ শিক্ষার হিসাবে নোয়াখালী যদিও অনেক অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু উচ্চশিক্ষার হিসাবে অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে। উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা নোয়াখালী অপেক্ষা চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় অনেক বেশী। নোয়াখালীর ব্যবহারাজীবগণ সংখ্যায় ও শক্তিতে, অন্যান্য জিলার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বিদেশ-প্রত্যাগত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অঙ্গুলীদ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। এস্থলে বলা উচিত যে শ্রীযুক্ত অবয়হুল্লা বি, এস্ সি, (বার্ম্মিংহাম্) ও শ্রীযুত হেমন্তকুমার ঘোষ ব্যারিষ্টার মহাশয়দ্বয় সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষানুরাগ, সৎসাহস ও অদম্য উৎসাহের যে উচ্চ আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন। অল্প কয়েকদিন হইল শ্রীযুক্ত লুত্‌ফে-আলী চৌধুরী মহাশয় ব্যারিষ্টার হইয়া বিলাত হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। লামচর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার চৌধুরী এক্ষণে আমেরিকায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি খনিজ বিদ্যায় ও তড়িদ্বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া এম্ এস্ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উচ্চ অঙ্গের কোনও বিশেষ শিক্ষা-লাভ করিয়াছেন এরূপ লোকের নাম আমি এখনও অবগত নহি।

যাঁহারা চিকিৎসা অথবা অধ্যাপনা কার্য্যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন ও যাঁহারা বঙ্গের প্রধান বিচারালয়ে ব্যবহার শাস্ত্র বিশারদ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে।

এ সকল কারণেই, বোধ হয়, নোয়াখালীকে অনুন্নত জিলার মধ্যে গণ্য করা হয়। পূর্ব্বে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অবহেলা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়াই, নোয়াখালীব এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। যখন বঙ্গের অন্যান্যস্থানে ইংরেজী শিক্ষা গৃহীত হইতেছিল, তখন নোয়াখালীবাসী তৎপ্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। সময়োপযোগী উচ্চ উদার শিক্ষার যথোপযুক্ত প্রচারের অভাবেই বোধ হয়, নোয়াখালী অনুন্নত জিলা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রথমভাগকে ইংরেজী শিক্ষার প্রারম্ভ কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালের পূর্ব্বে, ইংরেজী-শিক্ষা-প্রচলন, শাসন নীতিরূপে পরিগৃহীত হয় নাই সত্য, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ কেন্দ্রস্থলে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা ও কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। এইরূপে প্রাতস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় ও মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্নে এবং তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার হাইড্ ইষ্টের ন্যায় উদার-হৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে ইংরেজীশিক্ষা প্রদান কল্পে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের খৃষ্টিয় মিশনারীগণ এক কলেজ সংস্থাপন করিয়া শিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফ্, প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষার সাহায্যে, শিক্ষাপ্রদান উদ্দেশ্যে এক

বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করেন। তারপর বহু বাক্‌বিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্কের অবসানে, যখন লর্ড বেণ্টিঙ্ক ইংরেজী-শিক্ষা-প্রচার-নীতি গ্রহণ করিলেন, তখন হইতে এ দেশে এক নবযুগের অভ্যুদয় হইল। লর্ড মেকলে তাঁহার দলবল নিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য প্রকাশিত হইল; এবং শিক্ষার ভার এক পরিষদের উপর অর্পিত হইল। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা-দান বিষয়ে যথাযথ প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য এক সমিতি গঠিত হইল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার দ্রুতগতিতে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখনও নোয়াখালী সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষা শিক্ষায় ব্যস্ত ছিল। নোয়াখালীর অধিবাসিগণ তখনও বুঝিতে পারে নাই যে, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব বঙ্গীয় সমাজে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে।

পূর্ব্ববঙ্গেও ইংরেজী শিক্ষার প্রচার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ও সর্ব্বত্র ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হইল। পরিশেষে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সেই স্কুলই কলেজে পরিণত হইল; এবং সাধারণের অর্থ সাহায্যে কলেজ গৃহ নির্ম্মিত হইল। কুমিল্লায় যে জিলা স্কুল পূর্ব্ববঙ্গের এক প্রধান উচ্চ বিদ্যালয় বলিয়া তাহার গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। গবর্ণমেণ্ট্ যে সমিতির উপর শিক্ষাভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার সভ্যগণ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে একটি জিলাস্কুল স্থাপন করেন। এই জিলা স্কুলের সঙ্গে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম কলেজ বিভাগ সংযোজিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে সেই শিক্ষার আন্দোলনেব যে তরঙ্গাঘাত নোয়াখালীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাতেই নোয়াখালীর সুপ্তপ্রাণে চেতনার সঞ্চার হয়। অতঃপর নোয়াখালীবাসিগণ তাহাদের সন্তানদিগকে ইংরেজী শিক্ষা প্রদান করিতে উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু তখনও সমাজের অবস্থা অতি হীন ছিল; সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে লোকের আদৌ আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইত না। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে যত্নপর ছিল। কে শিক্ষা-প্রচার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে? বিধাতার শুভ ইচ্ছায় এমন সময়ে নোয়াখালীতে একজন আয়র্লণ্ডবাসী বণিক্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বণিক্ হইলেও, শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তখনকার ইংরেজ বণিকদিগের মধ্যে অনেক উদার-প্রাণ ও সহৃদয় লোক পরিদৃষ্ট হইত। যে অক্লান্ত-কর্ম্মী নিঃস্বার্থ বীর কলিকাতায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে প্রধান সহায় ছিলেন, তিনি একজন সাধারণ ঘড়ী ব্যবসায়ী বণিক ছিলেন। বঙ্গে শিক্ষা প্রচার উদ্দেশ্যে সেই মহাপুরুষ স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিয়া চির কুমার ব্রত গ্রহণ করেন ও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অনন্য-মনে পরহিত-সাধনায় রত থাকিয়া ভগিনী-নিবেদিতার ন্যায় এ দেশে জীবনলীলা সংবরণ করেন। বিধাতার কৃপায় সেই দুর্দ্দশার দিনে নোয়াখালীতেও এক বিদ্যোৎসাহী বণিক আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় নোয়াখালী সহরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজী স্কুল

স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ও পরবর্ত্তী ৩৫ বৎসরের মধ্যে, কি সহরে কি মফঃস্বলে, কোথায়ও অন্য কোন ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফেণীর যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে এখন শত শত যুবক অধ্যয়ন করিতেছে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাহার প্রথম সূত্রপাত হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় বদান্য জমীদার রায় রাজকুমার দত্ত বাহাদুরের ব্যয়ে সহরে আর একটি স্কুলের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্তবাবু কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে লক্ষীপুরে এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে মহাত্মা নোয়াখালীতে সর্ব্ব প্রথম ইংরেজী শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন, তিনি মিষ্টার জোন্স নামে পরিচিত। তিনি বাণিজ্য ব্যপদেশে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। জোন্স্ সাহেবের স্থাপিত স্কুল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৪শে নবেম্বর জিলা স্কুলের শ্রেণীভুক্ত হয় এবং ডগলাস্ গ্রিগরী নামক একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার পরবর্ত্তী হেড্ মাষ্টার বোধ হয়, উইলিয়াম্ কাউপার নামধারী একজন ইংরেজ। এরূপে আয়র্লণ্ডবাসী কর্তৃক স্থাপিত, স্কট্‌লাণ্ডবাসী কর্তৃক পরিপোষিত ও তদনন্তর ইংরেজ শিক্ষক কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়া দিন দিন উক্ত জিলা স্কুল উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্থানীয় লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইল এবং উত্তরোত্তর বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই একটি মাত্র বিদ্যালয়ে নোয়াখালীর ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তখনও ইংরেজী শিক্ষা কতিপয় উচ্চকর্ম্মচারী ভদ্র সন্তানের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

জনসাধারণ এই শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। এই জন্য বহুদিন যাবত "অনুন্নত প্রদেশ" এইরূপ একটা কলঙ্ক নোয়াখালীর নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আর, বোধ হয়, বেশী দিন নোয়াখালীকে এই নিন্দাভার সহ্য করিতে হইবে না। নোয়াখালীবাসীদের ভিতরে জাগরণ, নবপ্রাণ ও উদ্দীপনার পূর্ব্বাভাষ দেখা যাইতেছে। ইহা দিন দিন সংক্রামিত ও সংপ্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। আজ শিক্ষিত যুবকগণ ভাবিতে শিখিয়াছে যে সমাজের প্রতি তাহাদের একটা কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহারা এই পৃথিবীতে শুধু নিজের স্বার্থ নিয়া বিব্রত থাকিতে আসে নাই। যে নোয়াখালীতে সবেমাত্র একটি ইংরেজী স্কুল ছিল, আজ সেই নোয়াখালীতে প্রায় ১৬টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে নোয়াখালীতে এক সময়ে ছাত্র সংখ্যা মাত্র ৪০ বা ৫০ জন ছিল, আজ সেই নোয়াখালীতে শুধু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে সর্ব্ব সমেত প্রায় ৬০০০ ছয় হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ইহা ব্যতীত বহু ছাত্র মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। প্রতিবৎসর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বহু ছাত্র উত্তীর্ণ হইতেছে। এ সকল নোয়াখালীর পক্ষে শুভলক্ষণ। কিন্তু এখনও তাহাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী। নোয়াখালী যেরূপ

দ্রুত গতিতে শিক্ষাপথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় অচিরেই নোয়াখালীর মেঘ-নির্ম্মুক্ত ভবিষ্যদাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব হইবে।

বঙ্গে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিতেছে, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতেছে; সহরে ও মফঃস্বলের বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র আর ধরে না। প্রতি বৎসর বহু ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষালাভের জন্য সহরের দিকে ধাবিত হইতেছে। কখনও বা কলেজে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না বলিয়া নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছে। কলেজে অধ্যয়নের অর্থ সংস্থান করিতে না পারিয়া, কাহারও কাহারও পক্ষে উচ্চশিক্ষার পথ প্রবেশিকা পরীক্ষাব সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হইতেছে। আমাদের সম্মুখে এখন এক ঘোর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। বৎসর বৎসব উচ্চবিদ্যালয় হইতে যে সকল ছাত্র বহির্গত হইতেছে, আর কতকদিন পরে তাহাদের অবস্থা কি হইবে, তাহাদের জন্য কোন্ কোন্ শিক্ষাপথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে,— এ সকল চিন্তা এখন সমাজ হিতৈষী উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় অধিকার কবিয়া বসিয়াছে।

নোয়াখালীবাসীও এ বিষয়ে আর উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাকে উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে। কৃষি-শিল্প-চিকিৎসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নানা বিদ্যা শিক্ষা, যাহাতে নোয়াখালীবাসীর পক্ষে সহজ ও অল্প ব্যয়সাধ্য হইতে পারে, শীঘ্রই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন হইতে এই সকল দেশাহিতকর অনুষ্ঠানের সূচনাকল্পে নোয়াখালীকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। শুধু সাধারণ শিক্ষা লইয়া বিব্রত না থাকিয়া, যাহাতে লোকের মন এই সকল ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়, যাহাতে সকলে চাকুরীর জন্য লালায়িত না হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষালাভে সমর্থ হইতে পারে তাহাই করিতে হইবে।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন জিলায় পুরুষ সংখ্যা ও উচ্চ ইংবেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা :—

জিলা	পুরুষ সংখ্যা	উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়
ত্রিপুরা	১২৪৩,৪৮১	২৬
চট্টগ্রাম	৭২২,৮৩৭	১৭
নোয়াখালী	৬৪৫,৮৯৮	১৬

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে নোয়াখালীতে প্রতি ৪০,৩৬৯ জন পুরুষের জন্য একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, কিন্তু চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জিলায় যথা ক্রমে ৪২,৫২০ ও ৪৭,৮১১ পুরুষের জন্য এক একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

উক্ত তুলনামূলক আলোচনা হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে ইংরাজী শিক্ষার হিসাবে নোয়াখালী ইতি মধ্যেই অন্যান্য জিলাকে পশ্চাতে ফেলিতে সমর্থ হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার সহিত বাঙ্গলা শিক্ষা ধরিলে অনেক দিন এই জিলা অন্যান্য জিলাকে অতিক্র করিয়া গিয়াছে। এক্ষণে নোয়াখালীর অধিবাসী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, শিক্ষার প্রতি

যেরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে আশা করা যায় অচিরকাল মধ্যে নোয়াখালীর ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণিত হইবে।

তথাপি কুমিল্লা বা চট্টগ্রামের ন্যায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় এখনও আমাদের উপস্থিত হয় নাই, এ কথা কি শোভা পায়? কুমিল্লার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড যে একটী টেক্‌নিকেল স্কুল পরিচালনা করিতেছেন, আমাদেব নোয়াখালীর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কি সেরূপ একটী স্কুলের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া সাধারণের অর্থের এরূপ সদ্ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইবেন না? তন্তুবায়-প্রধান নোয়াখালীতে আমরা কি একটি বয়ন-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কল্পে সাধারণের ও গবরমেণ্টের সাহায্য ও আনুকূল্য লাভের আশা করিতে পারি না? আমাদের জিলা স্কুলে যন্ত্র-বিদ্যা (মিকেনিকস্) অধ্যয়নের সুব্যবস্থা করা হউক, শুধু এরূপ প্রার্থনা করিয়াই পরিতৃপ্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকিয়া, আমরা কি জিলা স্কুলের সঙ্গে বি, ক্লাস সংযোজনের জন্য শিক্ষা বিভাগের নিকট আবেদন করিতে পারি না? তাহা হইলে, টেক্‌নিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠায় পথ আমাদের নিকট অনেক সহজ হইয়া আসিবে।

এরূপে আমাদিগকে ধীরে ধীবে, কৃষি বিদ্যালয়, শিল্প বিদ্যালয়, বাণিজ্য বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ভাব গ্রহণ করিয়া, দেশের ও সমাজের প্রকৃত উপকাব সাধনের পথে অতি ধীর স্থির ভাবে ও অদম্য উৎসাহ সহকাবে অগ্রসব হইতে হইবে। সাধনা সিদ্ধির পথে বহু বাধা-বিঘ্ন, ঘাত-প্রতিঘাত, আশা, নিবাশাব সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু আশা কবি ধীর-হৃদয় যুবকগণ কিছুতেই সঙ্কুচিত বা কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত হইবে না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম, এ, বি, টি।

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার।

গতবৎসর "বিজয়া" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ চতুষ্টয়ে আমি ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, আজকাল আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের নিজের চেষ্টা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আয়োজন এবং রাজার অনুষ্ঠান সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে পরের উপর নির্ভর না করিয়া কেবল মাত্র স্বদেশবাসিগণের উদ্যোগে, স্বল্প মাত্র অর্থব্যয়ে কিরূপে নিম্নশ্রেণীস্থ জনসাধারণের মধ্যে এই প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তার করা যাইতে পারে, আমরা তাহার আলোচনা করিব। সম্প্রতি অনেক মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি এই বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন; কোন কোন স্থলে কেহবা কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সুতরাং এই উপযুক্ত সময়ে এই প্রকারের আলোচনা নিরর্থক হইবে না; পরন্তু তাহাতে সুফলের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করি।

সাধারণ গৃহস্থ, কৃষক ও শ্রমজীবিগণের মধ্যে যেরূপ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের; অতএব শিক্ষাদান প্রণালীও স্কুল-কলেজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের হইবে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে পল্লী-গ্রামের লোক শিক্ষিত হইয়া প্রোফেসারি করিবে না, অথবা কোন রিসার্চ্চ করিতেও যাইবে না। তাহারা গৃহস্থালী করিবে, গরু চরাইবে, চাষবাস করিবে, দোকানদারী করিবে,—এই পর্য্যন্ত। আমাদের আহারে বিহারে ও জীবন যাত্রায় সহজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নিমিত্ত যে সকল ক্ষুদ্র শিল্পকলার উন্নতি সাধন আবশ্যক, তাহাতেই তাহারা নিযুক্ত থাকিবে। আমাদের ছুতারমিস্তিরিরা ইউরোপ অথবা আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লড়াই আরম্ভ করিবে, এখনই এতদূর আশা করিবার দরকার নাই। পল্লীগ্রামের বিজ্ঞান-শিক্ষা কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহা কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইব।

যে কলুর ছেলে ঘানি ঘুরাইয়া তেল বাহির করে, সে একটু অরগেনিক কেমিষ্ট্রী শিখিলে, তৈলকে বিশুদ্ধ, বর্ণহীন ও গন্ধ-শূন্য করিতে পারে। অনেক তৈল আছে যাহা দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া ব্যবহার করা যায় না। আমাদের দেশের ক্যাষ্টর অয়েল, "বাথ্-গেট্" রিফাইন্ করিয়া বিক্রয় করে। নোয়াখালী বরিশাল, খুলনা, মাদ্রাজ, আন্দামান, লঙ্কা এই সকল দেশ নারিকেলের জন্য বিখ্যাত; কিন্তু জারমেনিতে নারিকেলের মাখন প্রস্তুত হয়, আর আমারা তাহা কিনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছি। এই তৈল-সম্বন্ধীয় রসায়ন-শাস্ত্র যে খুব শক্ত, এমন নহে। বেশী থিওরীর দিকে না যাইয়া মোটামুটী রকম সোজাভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিলে আমাদের কলুর ছেলেরা যে না বুঝিবে এমনও নহে।

ময়রা সন্দেশ মিঠাই তৈয়ার করে। ময়দা চিনি, ঘৃত ও ছানা, এই চারিটী জিনিস, তাহার একমাত্র সম্বল। কেবল রসনা তৃপ্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে নানা রূপ সুমিষ্ট দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। একটু স্বাস্থ্য-তত্ব ও শরীর-বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিলে সে আমাদের দেহ-পুষ্টির অনুকুল নূতন মিষ্টান্ন-পাক-প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে পারে। আমরা প্রতিদিন রেলওয়ে ষ্টেশনে, বাজারের দোকানে, ফেরিওয়ালার থালায় দু-চার-দশ দিনের পচা লুচি, কচুরী খাইতেছি। মূর্খ ময়রার ছেলে পিতৃ পিতামহের সেই সনাতন পদ্ধতি ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে; কিরূপে খাবার জিনিস্ গুলি অন্ততঃ কয়েক দিন পর্য্যন্তও টাট্কা রাখা যায়, তাহারা সেই উপায়ও জানে না। আমাদের চিড়া-মুড়ি হইতেই যে কতরকম উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত করা যায়. তাহা চিন্তা করিবার শক্তিও তাহাদের নাই।

আমাদের কুমোরের ছেলেরা সিরামিক্স্ (মৃৎবিদ্যা) জানিলে, তাহাদের মধ্য হইতেই কত বার্ণার্ড পলিশি বাহির হইয়া পড়িত। পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের

সঙ্গে সঙ্গে যে লোকের জীবন যাত্রা প্রণালী বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এ সংবাদ তাহারা জানে না। এখনও তাহারা সেই পুরাণো ফ্যাসানে হাঁড়ি কলসী তৈয়ারী করে;—সুবিধা অসুবিধা বিচার করে না। পাত্রাদি নির্ম্মাণের উপযুক্ত মৃত্তিকার কি কি উপাদান, কিরূপে অনুপযুক্ত মৃত্তিকাকেও আবশ্যক উপাদান সংযোগে উপযুক্ত করিয়া লওয়া যায়;—পাত্রের আকৃতি কিরূপ হইলে তদ্বারা অভীষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলে, তাহাদের নির্ম্মাণ কার্য্যের যেমন অনেক সুবিধা হয়, ব্যবসায়েরও তেমন প্রভূত উন্নতি হইতে পারে।

উপরের তিনটী উদাহরণ আলোচনা করিয়া পাঠকগণ বিস্মিত হইতে পারেন; কিন্তু আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া এইরূপ অসম্ভব কথার অবতারণা করিয়াছি। যে সকল বিষয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণের পরিকল্পনামূলক জ্ঞান (Theoretical knowledge) এখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই, আমি আমার এই দৃষ্টান্তত্রয়ে সেই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, যাহা আমাদের কাছে এখন অসম্ভব অথচ আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে, বিজ্ঞান শিক্ষায় তাহাই সম্ভব করিয়া আমাদের অভাব পূরণ করিতে হইবে। আমরা ম্যাকেসার অয়েল পাইতেছি, হান্‌টলী পামারের বিস্কুট খাইতেছি, ইটালী হইতে বাষ্ট্‌ গড়াইতেছি; সেইজন্যই আমরা আমাদের দেশের কলু ময়রা কুমোরের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। তারপর যখন স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল, উৎসাহী যুবকগণ যখন কোমর বাঁধিয়া ব্যবসায়ে লাগিয়া গেলেন, তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণের প্রলোভন হইতে কেহই নিস্তার পাইলেন না। তিল, তিসি, নারিকেল ফেলিয়া সকলে ফুলেল তৈল ম্যানু-ফেক্‌চার করিতে লাগিলেন; যদিও তার বর্ণ ও গন্ধই সর্ব্বস্ব, তথাপি তার ফ্যাক্‌টরী আছে, অফিস্ আছে। চিড়া মুড়ি ভুলিয়া সকলে বিলাতী কন্‌ফেক্‌সানারির আদর্শে কেক্, বিস্কুট, লজেঞ্জ প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করিলেন, হাঁড়ি-কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া পটারি ওয়ার্কস্ স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা এই প্রকার পাশ্চাত্য-প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিব ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের নিম্ন-শ্রেণীস্থ জন-সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষা বিস্তার নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে।

আমাদের দেশের লোকেরা বিজ্ঞান-শিক্ষাকে একটা বিরাট ব্যাপার বলিয়া মনে করে। লেবরেটরীর সাজ-সজ্জা, প্রফেসারের বক্তৃতা, যন্ত্রপাতির আড়ম্বর, এই সকল মিলিয়া সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে একটা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সরলই হউক আর জটিলই হউক, একথা নিশ্চয় যে বিজ্ঞান সংসারের আর সকল বিষয়েরই মত। আমরা যাহাকে সহজ কথায় কাণ্ড-জ্ঞান বলি, ইংরেজীতে যাহাকে common sense বলে, বিজ্ঞান তাহার পরিমার্জ্জিত অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সকলেই প্রত্যহ সামান্য কার্য্যেও বিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া থাকেন, কেহ বা তাহা বুঝেন, কেহ বা তাহা জানেন,

আবার কেহ বা বুঝেনও না জানেনও না এই মাত্র প্রভেদ। ফু দিলে আগুণ কখনও নিভিয়া যায়, আবার কখনও জলিয়া উঠে। মূর্খ লোকে ভাবেনা ;—কিন্তু বৈজ্ঞানিক ইহার কারণ অনুসন্ধান করে। লোহায় মরিচা (Rust) পড়ে কেন, একথা আমাদের কামারের ছেলেও ভাবে, আর বিলাতের কেমিকেল সোসাইটীর মেম্বরগণও ভাবিতেছেন। তবে এই উভয়ের চিন্তা প্রণালীতে একটা প্রভেদ আছে। যাহা হউক বিজ্ঞান কঠিন বিষয় হইলেও, তাহাকে সাধারণের বোধগম্য করা সম্ভব। সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের যে সমস্ত ক্ষুদ্র কবিতা—কলেজের গ্রাজুয়েট্‌গণ এম্ এ, ক্লাসে পড়িয়া থাকেন, সেই সকল কবিতা নিম্নশ্রেণীর অল্পবয়স্ক বালকগণও পাঠ করিয়া থাকে। যাহারা একদিন বুদ্ধদেবের চরণ-তলে উপবেশন করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তির উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল ;—যাহারা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের অর্থ পরিগ্রহ করিতে অসমর্থ হয় নাই ;—যাহারা চৈতন্যদেবের কৃপায় পঞ্চ-প্রেমের গভীর তত্ব অবগত হইয়াছিল; তাহারা যে আজ বিজ্ঞানের নিতান্ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলি বুঝিতে পারিবে না, তাহারা যে নিত্য অনুষ্ঠেয় প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের সহজ পন্থা সমূহ অবলম্বন করিতে পারিবে না, তাহারা যে কেবল মাত্র বস্তুগত ব্যাপারগুলিও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না, আমি এরূপ কখনও মনে করি না।

অতএব বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রচারকে একটা অসম্ভব-কিছু না ভাবিয়া আমাদের এই চিন্তা করিতে হইবে যে বাস্তবিক পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ, কৃষক শিল্পী, পণ্যব্যবসায়ী প্রভৃতি জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান কতদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবে। আমি যে তিনটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে মোটামুটী এইরূপ ব্যক্ত করিতে চাই যে তাহাদের পরিকল্পনা মূলক জ্ঞান (Theoretical knowledge) নিতান্ত প্রাথমিক (Elementary) রকমের হইবে যেন তাহাদের চিন্তাশক্তির উন্মেষ হয়,—বিচার ক্ষমতার বিকাশ হয়, যেন তাহারা নিজেরাই কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্থির নির্ণয় করিয়া অভিনব সহজ পথ আবিষ্কার করিতে পারে। আর তাহাদের ব্যবহারিক জ্ঞান (Practical knowledge) যাহাতে অবলম্বিত বিশেষ কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে,——যাহাতে তাহাদের ব্যবসায়ের পক্ষে তাহা হিতকর হয়——যাহাতে তাহারা নিজের কার্য্যকে হীন মনে না করিয়া যথার্থ গৌরবান্বিত করে, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত আমি পার্থক্য ও প্রভেদ প্রদর্শন করিতেছি। স্কুল কলেজে আমরা যে বিজ্ঞান শিক্ষা করি, তাহা থিওরির হিসাবে খুব বড়, কিন্তু কোন কাজে আসে না। তাহাতে রিসার্চ্চ করিবার সুবিধা হয়,—তাহাতে সাময়িক জ্ঞান-পিপাসার শান্তি হয়,—কিন্তু তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (directly) জীবন যাত্রার সুখ স্বচ্ছন্দ্য বিধানের আনুকুল্য হয় না। আমাদের পল্লীগ্রামের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রণালী এইরূপ হইবে যেন তাহা প্র্যাক্‌টিকেল হিসাবে খুব বড় হয়; তাহাতে যেন গ্রামবাসিগণ একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। অবশ্য এই শিক্ষাতেও জ্ঞান-পিপাসার ঐ তৃপ্তি সাধন করিবার আয়োজন রাখিতে হইবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়

অনেক পয়সা খরচ করিয়া বরফ দেওয়া নেবুর গোলাপী সরবত জোগাড় করিয়াছেন;—আমরা সংগ্রহ করিব মৃণ্ময় কলসীর শীতল জল,—এই মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিলাসের বিষয় (Luxury)। কিন্তু আমাদের শিক্ষা, প্রয়োজন (Necessity) অতিক্রম করিয়া যাইবে না।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই প্রকারের বিজ্ঞান-শিক্ষা-বিস্তার প্রণালী স্কুল কলেজের ফ্যাসানে কখনও হইবে না——হইতে পারেও না। তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণ আমাদের পল্লীগ্রামে শিক্ষক হইবেন, কিন্তু শিক্ষার স্থান হইবে পথে, ঘাটে, মাঠে, বৈঠকখানায়, রন্ধন-শালায়; শিক্ষার প্রণালী হইবে,—আলাপে, আলোচনায়, কথাবার্ত্তায়, কাজে কর্ম্মে। যাঁহারা শিক্ষক হইবেন, তাঁহাদিগকে ধৈর্য্যশীল ও স্থিরচিত্ত হইতে হইবে; তাঁহারা মনে রাখিবেন যে তুচার দশদিনেই চাষাকে পণ্ডিত করার কোন প্রয়োজন নাই, আর সেরূপ হওযাও অসম্ভব। কৃষকদিগকে কোন একজামিনে পাশ করিতে হইবে না; সুতরাং বয়সের কোন বাঁধা বাঁধি নাই,—রেগুলেশানের কড়াকড়ি নাই, চাকুরীর তাড়াতাড়ি নাই। তাহারা নিজেদের সুবিধা মত স্বাধীন ভাবে রহিয়া বসিয়া শিখিবে, ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিবে। স্কুল কলেজের ছাত্রগণ যেমন শিশুকাল হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ফাঁকি দিতে শিক্ষা করে; তুই বৎসরের পড়া তিনমাসে পড়িয়া, পুস্তকের কয়েক পাতায় লাল পেন্সিলের দাগ কাটিয়া, পরীক্ষকের প্রশ্নের ধারা বুঝিয়া, আরও কত কিছু করিয়া তাহারা যেমন ফন্দীবাজ আখ্যার পরিবর্ত্তে ইন্‌টেলিজেণ্ট স্কলার বলিয়া পরিচিত হয়, আমাদের কৃষকগণ ও সাধারণ শিল্পব্যবসায়িগণ কখনও সেইরূপ হইবে না। চালাকী করিয়া অথবা ফাঁকি দিয়া একটা কি দশটা ডিগ্রী নেওয় খুব সহজ; কিন্তু উদরের সঙ্গে ত আর ফাঁকি চলে না; সে যে তিন ঘণ্টা খালি থাকিলে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখাইয়া দেয়। চাষ বাসের সঙ্গে ত আর চালাকী চলেনা; সেইখানে যে মাতা বসুন্ধারার বক্ষের রক্তমাংস লইয়া কারবার। সেইখানে যে প্রতিমুহূর্ত্তে সত্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে! সেইখানে যে ভুলভ্রান্তি চাপাদিয়া রাখার যো নাই। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী হইতে আমাদিগকে বহুদূরে সরিয়া যাইতে হইবে।

কিরূপে শিক্ষাদান কার্য্য পরিচালিত হইলে সুফলের আশা করা যায় ও সাধারণ লোক যথার্থরূপে উপকৃত হয়, আমি এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব। বাস্তবিক 'শিক্ষাদাও শিক্ষাদাও" "উন্নতি কর উন্নতি কর" এই রকম ভাবের কতকগুলি কথা ভাষার আলোড়নে ফেনাইয়া ফেনাইয়া বকিয়া যাওয়া কিছুই নয়; দেশের বর্ত্তমান প্রতিকূল অবস্থায় কিরূপে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যথাসম্ভব অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে তাহার নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। আমি যে দেশের সর্ব্ববিধ অবস্থা সম্যক অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি, ও সম্মুখে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে তাহাও যে সম্পূর্ণ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, এইরূপ কেহ মনে করিবেন না। যাহারা প্রকৃতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইয়াছেন, ও যাঁহারা এই বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের কর্ম্ম ও চিন্তার সহিত আমার এই স্বল্প পরিমাণ জ্ঞান যুক্ত করিতে চাহি ; তাহাতে আমি আমার নিজের লাভকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া গণ্য করি।

১। আজ কাল প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটী মধ্য-ইংরেজী অথবা মধ্য-বাংলা বিদ্যালয় আছে। এই সকল স্কুলে দরিদ্র গৃহস্থ ও কৃষকগণের সন্তানগণও পড়িয়া থাকে। বলা বাহুল্য ছাত্রগণকে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের উপযুক্ত করাই এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এই সকল বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য করেন। কোন কোন স্কুল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্য ব্যতীত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। যাহা হউক এই সকল বিদ্যালয় সমূহ হইতে যে সকল ছাত্র মাইনর অথবা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা সকলেই প্রথমতঃ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পড়িবার জন্য একবার সহরের দিকে ছুটিয়া যায়। তারপর দারিদ্র্যের তাড়নে, অবস্থার পীড়নে অনেকেই ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসে। কেহবা পাপের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া, অথবা কুসঙ্গের আবর্ত্তে পতিত হইয়া পাঠাভ্যাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যাহারা এইরূপে ভয়ঙ্করী অল্পবিদ্যা লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল, তাহারা চাষার ছেলে হইয়াও লাঙ্গল ধরিতে জানে না, দোকানদারের পুত্র হইয়াও দাঁড়ি পাল্লা ধরিতে অপমান বোধ করে, কামার কুমারের ঘরে জন্মিয়াও নিজের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয়। ইহারা চিরকাল সমাজের আবর্জ্জনা, দেশের কলঙ্ক ও অপরের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া কোনরূপে আপনাদের জীবনের বোঝা সংসারের পথে ঠেলিয়া ঠুলিয়া চালাইয়া নেয়। এই রকম লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে সাড়ে পনর আনা। উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, মোক্তার আর কয়জন ?—তৈল-সিক্ত যন্ত্রের মত কয়জন নিঃশব্দে এই সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া থাকেন ? বেশ স্বচ্ছলভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন কয়জন ? এই যে দেশে প্রতিবৎসর এত সংসারী দিশাহারা পথিকের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—এই যে এত যুবক শিক্ষার কুহকে পড়িয়া "ইতো নষ্ট স্ততোভ্রষ্ট" হইতেছে,—এই যে এত লোক নিরুপায় হইয়া দারিদ্র্যের দিকে ছুটীতেছে, ইহার জন্য জবাবদিহি কে ?

এই যে দেশের লোক সকল ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গ ও মর্ত্ত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শূন্যে অবস্থান করিতেছে ইহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের মত কে কঠোর তপস্যা করিতে পারেন ? কে বিধাতা পুরুষের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ইহাদের জন্য অভিনব স্বর্গের সৃষ্টি করিতে পারেন ? আমার বিবেচনায় পল্লীগ্রামের পাঠশালার শিক্ষকগণ সেই ব্রহ্মর্ষির মত শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। কারণ, যে শিক্ষানুশাসনে একটা জাতির মেরুদণ্ড গঠিত হয়, যে শিক্ষার ব্যবস্থাপনে সমাজের স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, যে শিক্ষার বিতরণে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টির পূর্ব্বে

আমাদের পার্থিব সুখ সম্ভোগের আয়োজন করিতে হয়, সেই শিক্ষার মূল পল্লীগ্রামের এই সকল স্কুল ও পাঠশালা। শিক্ষকগণ কিরূপে কার্য্য করিবেন তাহা আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্ সি,

বিদ্যা সুখ ও বিক্রমের মন্ত্র।

আমরা কেবল অদৃষ্টবাদী নহি এবং কেবল পুরুষকারবাদীও নহি। পরন্তু আমাদের মতে দৈব এবং পুরুষকার উভয়ই কার্য্য সিদ্ধির প্রতিনিদান। এ সম্বন্ধে দুইটি মত দেখিতে পাই।—

কেহ বলেন—তীব্র পরিমাণে যদি দৈবের উপরে নির্ভর করা যায় তবেই উদ্দেশ্য কার্য্য অবাধে সিদ্ধ হয়। আবার অপর কেহ বলেন—কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য আমরা অদৃষ্ট, দৈব বা ঈশ্বর মানি না, কিন্তু কেবল যথোচিত চেষ্টা দ্বারাই উদ্দেশ্য কার্য্য সম্পন্ন হয়।

যাহারা শুদ্ধ দৈববাদী তাহারা পুরুষকারের অপেক্ষা করে না। আর যাহারা কেবল পুরুষকারবাদী তাহারাও দৈবের অপেক্ষা করে না।

দৈববাদীগণের দৃষ্টান্ত—যেমন "অজগর"। অজগর সর্প অতি বৃহৎকায়; চলিতে অসমর্থ। এইরূপই ঈশ্বর অজগরের সৃষ্টি করিয়াছেন। অপরাপর সর্পের মত অজগর ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া স্বোদর পূরণ করিতে অসমর্থ। সেই অচল কলেবর অজগরকে কত শত জীব জন্তুর পদমর্দ্দন সহ্য করিতে হয়। অধিক কি, গায়ের উপর একটি পাতা পড়িলে তাহা সে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না। যে স্থানে সে জন্মে সেই স্থানে পড়িয়া থাকে। তাহার সহজাত বলীয়সী ক্ষুধা আছেই। কিন্তু সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্য কিছু উপায় নাই। আছে কেবল সুবিপুল মুখগহ্বর আর অত্যায়ত উচ্ছ্বাস, এই মাত্রই উপায় ঈশ্বর দিয়াছেন। তদ্দারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত জীবজন্তু যখন অনতিদূরে অজগরের সম্মুখে বিচরণ করিতে থাকে, তখন সেই অজগরের সুদীর্ঘ উচ্ছ্বাসের আকর্ষণে সেই জীবজন্তু সকল তীব্র বেগে তাহার ব্যাদিত মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া বিপুল উদরে যাইয়া পড়ে। এই প্রকারেই অজগরের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; অজগর জানে আমার ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই, সে জন্য বিনা চেষ্টায় কেবল ঈশ্বর নির্ভরেই অজগরের আহার কার্য্য সম্পন্ন হয়।

অপিচ—মার্জ্জার-শিশু বিনা পুরুষকারে কেবল নির্ভর দ্বারাই নিরাপদে সুখে বাঁচিয়া থাকে। তাহা এইরূপ—সদ্যোজাত মার্জ্জার-শিশু অস্ফুটিত চক্ষু; সে জন্য মাতা মার্জ্জারীর সাহায্য বিনা নিজের চেষ্টায় ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে অসমর্থ। ইহা বুঝিয়াই বিড়াল শিশু "মাও মাও" রবে নিরন্তর মার্জ্জারীকে ডাকিতে থাকে। মার্জ্জারীও সুতস্নেহে অধীরা হইয়া

পুত্রের ক্ষুধা বা পিপাসায় ক্লেশ হইয়াছে বুঝিয়া মুখে স্তন্য দান করে, অথবা খাদ্যবস্তু উদ্গার করিয়া দেয়। আর যদি কখনো সর্পাদির ভয় উপস্থিত হয়, তখন মার্জ্জারী দন্তাগ্র দ্বারা এমনই শিথিলভাবে সাবধানে দংশন করিয়া লইয়া যায়, যেন পুত্রগাত্রে দন্তাগ্রও না বিঁধে, আর পড়িয়াও না যায়। সেইভাবে সাবধানে লইয়া কোনও অব্যবহার্য্য চুলার মধ্যে বা ধানের গোলায় রাখিয়া দেয়। মার্জ্জার শিশু নিশ্চয়ই জানে যে মা ভিন্ন আর আমাব রক্ষা করিবার কেহ নাই। একমাত্র মায়ের উপরে নির্ভর রাখাতেই মার্জ্জার শিশু সুখে কাল অতিবাহিত করে, আর কোনরূপ চেষ্টারই অপেক্ষা এস্থলে দৃষ্ট হয় না।

আর যে স্থলে কেবল পুরুষকারেরই উপর নির্ভব, তথায় দৈবের অপেক্ষা নাই। যেমন—বানরের শিশু। প্রসবের সময় বানর শিশুর প্রথম হাত দুখানা বাহির হয়। সে নিজে উদরের মধ্যেই থাকে। সেই বানর শিশু উদরেব ভিতরে থাকিতেই হাত দুখানিকে এদিক্ ওদিক চালাইতে থাকে ও কিছু ধবিবার চেষ্টা করে। কিল্ বিল্ করিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে যেই কোন একটা গাছের ডাল ধরে তখনই বানবী সেই শাখা হইতে অপর শাখায় লাফাইয়া যায় এবং তখন তখনই বানরী নিকটে আসে, আর সদ্যোজাত বানরশিশু বানরীকে জড়াইয়া ধরে, স্তন্যপান করে, বানরীব সহিত এ শাখায় সে শাখায় বিচরণ করে, বৃক্ষের কোমল পত্র ফল পুষ্প ভক্ষণ করে। বানর শিশুর পেটের ভিতবে থাকিতেই চেষ্টার উপরে নির্ভর, সুতরাং তাহার আর কর্ম্মসিদ্ধিব জন্য দৈব নিভরের প্রয়োজনই করে না।

বিড়াল শিশুও বানর শিশুর উক্ত প্রকারেই কার্য্য নিষ্পত্তি হইয়া থাকে,—হউক ; কিন্তু আমাদের না আছে সেইরূপ দৈবের উপরে দৃঢ় নির্ভর, না আছে পুরুষকারেও তীব্র প্রযত্ন। সুতরাং এজন্যই কার্য্য সিদ্ধিতে বিবিধ বিঘ্ন আসিয়া বাধা জন্মায়। আমরা অজগরও নহি, বানরও নহি। আমরা সদসদ্বিবেচক মানুষ। এজন্যই আমাদের কর্ম্ম সিদ্ধিতে কিঞ্চিৎ দৈব ও কিঞ্চিৎ পুরুষকার উভয়ই কারণ মনে হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন, বিচারের জন্য ; মন দিয়াছেন, বিবিধ কল্পনাব জন্য ; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, জ্ঞানের নিমিত্ত ; —বাগাদি ইন্দ্রিয় দিয়াছেন কর্ম্মের নিমিত্ত , এজন্যই নীতিজ্ঞ ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"উদ্যমেনৈব সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥"

(হিতোপদেশ)

অর্থ—মানবের উদ্দেশ্য কার্য্য সিদ্ধি চেষ্টাতেই হইয়া থাকে, কেবল অভিলাষ করিলেই হয় না। মনে কর—ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ইতস্ততঃ আহার অন্বেষণ না করিয়া যদি শুইয়া হা করিয়া থাকে, তবে সিংহের ক্ষুধা পাইয়াছে বুঝিয়া হরিণ নিজে আসিয়া তাহার মুখের ভিতরে কখনই প্রবেশ করে না। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বথা উদ্যম করা কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের প্রদত্ত বুদ্ধি সদসদ্ বিবেক এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ যেখানে অসমর্থ হইয়া পড়ে সে স্থানেই দৈবের প্রাবল্য, যেমন—

"কৈবর্ত্ত কর্কশ করাৎ শফরশ্চ্যুতোঽপি,
জালে পুনর্নিপতিতঃ শফরো বিপাকাৎ।
যত্নাত্ততো বিগলিতো গিলিতো বকেন,
বামে বিধৌ বদ কথং বিপদাং নিবৃত্তিঃ॥"

অর্থ—এক জেলে জালে একটি পুঁটিমাছ ধরিয়াছিল, সেই মাছটি জেলের শক্ত হাত হইতে কোনরূপে বাহির হইয়াও অদৃষ্ট ফলে পুনর্ব্বার ঐ জালের ভিতরেই পড়িল। তৎপরে নিজের চেষ্টায় সেই জাল হইতে লাফাইয়া বাহির হইল, অমনি একটি বক তাহাকে গিলিয়া ফেলিল, অতএব বল—বিধি যদি বাম হয় তবে বিপদের নিবৃত্তি কিরূপে হইতে পারে? কিছুতেই পারে না।

অতএব আমাদের দৈবকে অনুকূলরূপে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; দৈব যাহাতে সুপ্রসন্ন হয় তদর্থে শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরোপাসনা কর্ত্তব্য, এবং মহৌষধাদি সেবন করা উচিত। অতএব ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে দৈব যখন স্বতঃই অনুকূল নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন শাস্ত্রীয় বিধানদ্বারা দৈবকে অনুকূল করিতেই হইবে। তথাপি উদ্‌যোগী পুরুষগণ কখনই আরব্ধ কার্য্য হইতে ভগ্নোৎসাহ ও নিবৃত্ত হইবেন না।

(প্রথম মন্ত্র)

"আরভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈ
রারভ্য বিঘ্ননিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃপুনরপি প্রতিহন্যমানা
আরব্ধ মুত্তমজনাঃ শিরসা বহন্তি॥"

(মুদ্রা-রাক্ষস)

অর্থ—যাহারা দুর্ব্বলান্তঃকরণ মানব তাহাদের অন্তরে অধ্যয়নাদি যাবতীয় কার্য্য আরম্ভ না করিতেই শত শত বাধা, শত শত ভবিষ্য বিঘ্নের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। সেজন্য নীচ দুর্ব্বলান্তঃকরণ মনুষ্য কোনও একটা অধ্যয়নাদি কার্য্যে প্রবৃত্তই হয় না। আর যাহারা মধ্যবিধ (উচ্চও নহে নীচও নহে) অন্তঃকরণ বিশিষ্ট লোক, তাহারা প্রথমতঃ উদ্যম ও আড়ম্বরের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু যথায় সিদ্ধি তথাই বিঘ্ন ইহা স্বতঃসিদ্ধ, ইহা বিচার না করিয়াই আরব্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া পড়ে। ইহাদের কার্য্যটা না এদিক, না ওদিক অর্থাৎ "ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ" হইয়া যায়। আর যাহারা উত্তম জন—উচ্চান্তঃকরণ, তাঁহারা শত শত বিঘ্নদ্বারা বারংবার আক্রান্ত হইয়াও আরব্ধ কার্য্যকে মস্তকে বহন করিয়া রাখেন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন না, যেরূপেই হউক আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবেনই করিবেন। তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস, বিঘ্নই সিদ্ধির লক্ষণ অতএব তাঁহারা আরব্ধ কার্য্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেন।

তাঁহাদের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা "মন্ত্রং বা সাধয়ে শরীরং বা পাতয়ে" আমি হয় মন্ত্রের সাধন, না হয় শরীর পাতন করিব। ইহাদিগকে যাবনিক ভাষায় বলে "নাছোড় বন্দা" একগুঁয়ে।

বিদ্যা সুখ এবং বিক্রম উপার্জ্জনাদি যে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, যাহাতে সেই সেই কার্য্যে পিত্রাদি গুরুজন প্রসন্ন হয়েন, সেই সেই কার্য্যে অনুমোদন করেন, তদ্রূপই ব্যবহার করিবে। পিত্রাদি অভিভাবকদিগকে ভয় ও ভক্তি করা কর্ত্তব্য। গুরুজনের প্রতি এই প্রকার ভক্তির ভাব আংশিকরূপে নহে, পরন্তু সম্পূর্ণরূপে রাখিতে হইবে।

মহর্ষি বিষ্ণু বলিয়াছেন "ত্রয়ঃপুরুষস্যাতি গুরবোভবন্তি। পিতা মাতা আচার্য্যশ্চ। যত্তেব্রূয়ুস্তৎকুর্য্যাৎ। ন তৈরননুজ্ঞাতঃ কিমপিকুর্য্যাৎ।"

অর্থ—পুরুষের তিনজনই অত্যন্ত গুরু—মাননীয় পিতা, মাতা ও শিক্ষক। তাহারা যাহা বলিবে তাহাই করিবে। তাহাদের বিনা অনুমতিতে কোনও কায্যই, এমন কি ধর্ম্ম কার্য্য বা সৎকার্য্যও করিবে না।

(দ্বিতীয় মন্ত্র)

"অহেরিব গণাদ্ভীতোমিষ্টান্নাচ্চ বিষাদিব।
রাক্ষসীভ্য ইবস্ত্রীভ্যঃ সবিদ্যামধিগচ্ছতি॥"

অর্থ—যাহারা বিদ্যা সুখ ও বিক্রম উপার্জ্জন করিতে অভিলাষী তাহারা পিত্রাদি অভিভাবকগণকে অথবা সমাজকে বিষধর সর্পের মত, ভয় করিবে। কোন রূপেই তাহাদিগকে উত্তেজিত বা কুপিত করিবে না। উত্তম উত্তম খাদ্য বস্তুকে বিষের মত ভয় করিবে। কিরূপে ভাল খাইব? কিরূপে ভাল পরিব? কেবল খাই খাই করিয়া ফলার করিয়া বেড়ান। আকণ্ঠ খাইয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইবে না। আর যাহাতে চিত্ত বিকৃত না হয় তজ্জন্য যুবতী স্ত্রীদিগকে রাক্ষসীর মত ভয় করিবে। এরূপ ব্যবহার যে সকল বিদ্যার্থী করিবে তাহারাই বিদ্যোপার্জ্জন করিতে পারিবে।

যে সকল বিদ্যার্থী বালকেরা পিত্রাদিকে ভয় না করে তাহারা অল্পদিনের মধ্যেই সমাজে দুর্নামগ্রস্ত হইবে এবং সকল কায্যে বিফল মনোরথ হইবে। পরে উৎপথবর্ত্তী হইয়া বিদ্যাভ্রষ্ট হইবে।

যে সকল বালক অধ্যয়ন দশায় অশনব্যসনী হয়, মিষ্টান্ন লোলুপ হয়, উৎকর্ষাপকর্ষ, শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার না করিয়া কেবল মাত্র ক্ষুধার তাড়নে বিপণিশালায় বিক্রয়ার্থ সজ্জিত পর্য্যুষিত মৃৎকণ-মিশ্রিত মিষ্টান্নরাশি উদরস্থ করে, অথবা কুটুম্বালয়ে নিমন্ত্রণাদিতে আকণ্ঠ উদর পূর্ণ করিয়া হস্ত-পদ বিস্তারপূর্ব্বক নিদ্রালুনয়নে সময় অতিবাহিত করে; এই যাবৎই যাহাদের দৈনিক কার্য্য, তাহাদের অচিরদিনের মধ্যেই মন্দাগ্নি রোগ উৎপন্ন হইবে সুতরাং অধ্যয়নের আশা তাহাদের সুদূর পরাহত হইবে। অতএব বিদ্যার্থীগণ মিষ্টান্ন লোভের অনুগত হইবে না।

যে সকল বিদ্যার্থী ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠাদ্বারা আত্মরক্ষা না করে, তাহাদিগের অজ্ঞাতসারেই মনঃ, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, শৌর্য্য, লজ্জা, বল, সম্মান সমস্ত নিঃশেষ হইয়া যায়। এবং উহাদের বিনিময়ে দৈন্য, রোগ, শোক, অনুতাপ ও মূর্খত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়।

আরও বলিতেছি—হে বিদ্যার্থিগণ! তোমরা নিশ্চয় জানিবে, নিরন্তর ইহাই চিন্তা করিবে, যদি সুখী হইতে অভিলাষ থাকে, যদি যশোলিপ্সু হইতে ইচ্ছা কর, গণনায় যদি নিজেকে পুরুষসংখ্যার অন্তর্গত করিতে স্পৃহা থাকে, তবে—এই প্রশ্নটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—

(তৃতীয় মন্ত্র)

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ দুঃখয়োঃ॥"

অর্থ—সকল বিষয়ে পরাধীনতাই দুঃখ ও সকল বিষয়ে স্বাধীনতাই সুখ। ইহাই সুখ দুঃখের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ জানিবে।

যাহাদের সুখে সুখে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহাদের পর মুখাপেক্ষী শৃঙ্খলবদ্ধ কুক্কুরের মত থাকা উচিত নহে। কিন্তু তাহাদের আত্মাবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। স্বহস্তার্জ্জিত শাকান্নও দিনান্তে দেবভোগ্য অমৃত সদৃশ সুস্বাদু ইহা মনে রাখিবে।

এস্থলে পশুর মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। বন্য পশুরাজ সিংহের ইহাই এক মহাশ্চর্য্যকর স্বভাব—তাহারা অপরের মারিত বা ভুক্তাবশিষ্ট মৃগাদি জীবজন্তু ভোজন করে না। অধিক কি বলিব? সিংহের পুত্র বাল্যদশা অতিক্রম করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে পিতার মারিত ও ভুক্তাবশিষ্ট হস্তীর মাংসও গ্রহণ করে না। পরন্তু নিজে স্বহস্তে মৃগাদিকে হনন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এবং পিতাকে জানায় যে আমি সিংহের পুত্র, শৃগালের পুত্র নহি। অবশ্যই পিতার প্রসাদ অগ্রাহ্য নহে, কিন্তু সেজন্য চিরজীবন পিতৃদত্ত ভক্ষ্যই ভোজন করিতেছে, নিজে কাপুরুষের মত বসিয়া থাকে, ইহা যেন পিতা মনে না করেন, এইরূপে পিতা সিংহকে নিজের বিক্রম কৌশলে দেখাইয়া থাকে। তদ্দর্শনে সিংহও নিরতিশয় আনন্দিত হয়।

(চতুর্থ মন্ত্র)

"মদসিক্ত মুখৈর্মৃগাধিপঃ করিভির্বর্ত্তয়তে স্বয়ং হতৈঃ।
লঘয়ন্ খলুতেজসাজগন্ন মহানিচ্ছতি ভূতি মন্যতঃ॥"

(—ভারবি)

অর্থ—পশুরাজ সিংহ মদমত্ত মহাবলশালী হস্তিকে স্বহস্তে নিহত করিয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এবং অন্তর্নিহিত তেজস্বিতা—বিক্রম দ্বারা জগৎকে তুচ্ছ দুর্ব্বল মনে করে—

অর্থাৎ সে মনে করে আমি সিংহের পুত্র সিংহ, আমি কেন পরমুখাপেক্ষী হইব? আমি কি অন্যের অপেক্ষায় ক্ষুদ্র হইব? এইরূপ প্রচ্ছন্ন অভিমান নিজের মনে পোষণ করে। কারণ—যাহারা উচ্চ অন্তঃকরণ তেজস্বী বিক্রমী তাহারা অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া ঐশ্বর্য্যবান্ হইতে চাহে না।

অতএব যে সকল বিদ্যার্থী রাজা বা ধনিলোকের পুত্রও হয়, পৈত্রিক বিত্ত দ্বারাও ভোগ নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয়, তাহাদেরও ইহা মনে রাখা উচিত যে আমি এত বয়স যাবৎ পিতৃবিত্ত দ্বারা অশন বসন ইত্যাদি ভোগ করিয়া আসিতেছি, ইহাতে পিতা কি মনে কবিবেন? অবশ্যই আমার পুত্রটি কাপুরুষ ইহা মনে করা অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে। তবে তখন তোমার নিজেব মনকে কি বলিয়া কিরূপে প্রবোধ দিতে পারিবে? নীতি এই রূপ—তোমার পিতৃবিত্ত থাকে বেশ, তাহা থাকুক তাহাত তোমার হাত হইতে কেহ কাড়িয়া নিতেছে না। উত্তরাধিকারিরূপে তুমিই ভোগ করিবে ও করিতেছ। অতএব পিতৃবিত্ত ভোগ করিতেছ, কর; কিন্তু নিজের অসমর্থতা প্রযুক্ত ভোগ কবা উচিত নহে। পিতা যাহাতে মনে করিতে পারে যে "আমার পুত্রটি গুণবান্, কৃতবিদ্য, সৎপুরুষই বটে কাপুরুষ নহে" ইত্যাদি।

উপর্য্যুক্ত—চারিটি মন্ত্রের মর্ম্মার্থ যে সকল বিদ্যার্থী প্রত্যহ মনে মনে স্মরণ ও আলোচনা করে,—তাহারা অচিরদিনেই দেখিতে পাইবে যে- বিদ্যাসুখ এবং বিক্রম তাহাদের অনুচর হইয়াছে।

শিবমস্তু—

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

নোয়াখালীতে কৃষিকার্য্য।

পূর্ব্বে এই নোয়াখালী জেলার উত্তবাংশ নিবিড় জঙ্গলে আবৃত ও দক্ষিণাংশ চর ও সমুদ্রের গর্ভে লুক্কায়িত থাকিয়া, মনুষ্যের অগম্য হইযা উঠিয়াছিল। বৃটীশ অধিকারের সময় কর্ত্তৃপক্ষও এই সকল অঞ্চল "নিবিড় অরণ্যাণী পরিপূর্ণ বিরল মনুষ্য বসতি" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বিভিন্ন দিক হইতে এই নোযাখালী জেলায় "বস্তি" হওয়াতে এখন অদ্বিতীয় শস্য শ্যমলা ভূমিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

ধান—এই জেলায় ধান্যকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) আউস (২) পৌষ ও (৩) বোরো। আউস ও পৌষ ধান্যের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এ জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান। বোরো ধান ফাল্গুণ চৈত্র মাসে বোনা হয়। বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ মাসে কাটা যায়। কিন্তু এই বোরো ধান্যের আবাদ অতি কম।

নোয়াখালী জেলার ভুমি খুব উর্ব্বরা। এই দেশের ভুমিতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে শস্য হয়, বোধ হয়, বাখরগঞ্জের দক্ষিণাংশ ভিন্ন এইরূপ ধান্য বাঙ্গালার কোন জিলায় হয় না। চট্টগ্রামের কমিশনার হেকিক সাহেব লিখিয়াছেন "চট্টগ্রাম হইতে বৎসর বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়। কিন্তু ইহার অধিকাংশ চাউল নোয়াখালী ও ত্রিপুরা হইতে অমাদানী হয়।" নেয়াখালী ক্ষুদ্র জেলা হইলেও এই জেলা হইতে প্রতি বৎসর ১০।১২ লক্ষ মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়। আরও বিশেষত্ব এই যে, পার্শ্ববর্ত্তী জিলা হইতে এই জিলার হাট বাজারে চাউলের দর অপেক্ষাকৃত কিছু কম। এইরূপ প্রচুর ধান্য উৎপন্নের প্রধান কারণ এই যে, এ জেলায় পাটের আবাদ অতি কম। ফেণী উপবিভাগের উত্তরাংশে অনন্তপুর, ডুবলাচাঁদ, কালিকাপুরে এক প্রকার সুগন্ধি বিশিষ্ঠ মিহি পরিষ্কার ধান্য উৎপন্ন হয়। তাহার নাম "গোবিন্দভোগ"; বাস্তবিক তাহা দেবতার ভোগের উপযুক্ত বটে। এইরূপ সুগন্ধ ও আস্বাদ বিশিষ্ট চাউল বাঙ্গালার অন্য কোন জিলায় পাওয়া যায় না। এই চাউল যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমন গন্ধে এবং আস্বাদেও মনোহর। তাই বোধ হয় সাধ করিয়া ইহার নাম "গোবিন্দভোগ" রাখা হইয়াছে।

পাট—এই জেলা পাটের জন্য বিখ্যাত নহে। এবং ইহার সর্ব্বত্র পাট হয় না। ফেণী উপবিভাগে পাটের আবাদ আদৌ নাই। সন্দ্বীপ ও হাতিয়া প্রভৃতি দ্বীপেও পাটের আবাদ অপেক্ষাকৃত কম। কেবল সদর বিভাগের মধ্যেই পাটের আবাদ বেশী। কিন্তু নোয়াখালী জেলার পাট কি লম্বাধিক্যে কি গুণাধিক্যে ভাল নহে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এ জেলায় পাটের আবাদ আদৌ ছিল না। বিগত ৮।১০ বৎসর মধ্যেই পাটের আবাদ এ জেলায় অতিবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। সম্প্রতি চৌমুহনী ষ্টেসন হইতেও প্রতিবর্ষে ৪ লক্ষ মণ পাট বিদেশে রপ্তানী হইতেছে।

ডাইল।

ডাইল ঃ—খেসারী ও মাস কলাইর ডাইল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত ডাইল প্রথম শ্রেণীর ডাইল বলিয়া গণ্য।

রবিখন্দ ফসল।

রবি খন্দ ফসলের মধ্যে মরিচ, মূলা, বেগুণ এ জেলায় যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এবং বিভিন্ন জেলায়ও রপ্তানী হয়। ফেণী মহকুমায় মানকচু সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বাউর পাথর মৌজার মানকচুর মত এমন মানকচু আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। পরশুরাম, ফুলগাজী, বক্সমামুদ প্রভৃতি হাটে "সাতচক্যা" "হাতিখুরা" যে দুই প্রকার আলু জাতীয় তরকারীর আমদানী হয়, তাহা বড়ই উপাদেয় ও রাজসিক খাদ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল তরকারী এই সকল অঞ্চল ভিন্ন আর কোথায়ও পাওয়া যায় না।

উদ্ভিদ ও ফল।

আম, জাম, কাঁঠাল, গাস্তারই প্রভৃতি নানা জাতীয় উদ্ভিদ এ জেলায় আছে। স্বাধীন ত্রিপুরার পাহাড় হইতে এক প্রকার "মুলী বাঁশ" আমদানী হয়, তাহা প্রধানতঃ মুহুরী নদী দিয়াই বেপারীরা চালান দেয়। সর্ব্ব প্রথম দুবলাচাঁদের বেপারীরা এই সমস্ত "মুলি বাঁশ" বামনী, হাজারির চর, চৌমুহুনী, চন্দ্রগঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে চালান দেয়। তৎপর এখন এই সকল অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরাও এই বাঁশের বেপার আরম্ভ করিয়াছে। এই মুলি বাঁশ দ্বারা অতি পরিপাটী রূপে ও অতি সস্তায়, ঘর, দরজা, বেড়া প্রভৃতি তৈয়ারী করা যায়। নোয়াখালী বাসিগণ এই মুলি বাঁশের উপকার ইহজন্মে ভুলিতে পারিবে না। অন্য জেলা বাসীরা যে ঘর ৫০৲ টাকা খরচ করিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারে না, এজেলা বাসীগণ বিশেষতঃ ফেণী মহকুমার উত্তরাংশের লোকগণ সেই গৃহ তাহার একচতুর্থাংশ ব্যয়ে উৎকৃষ্টতর করিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারে। এই বাঁশের দরও অতিশয় সস্তা। একহাজার বাঁশের দাম ১০৲ টাকা হইতে বিশটাকা পর্য্যন্ত। সুতরাং এমন সুবিধা আর কোন জেলাবাসী পায় নাই। আরও ইহা দ্বারা সামান্য ব্যয়ে পানের বরজ যেইরূপ ভাবে সুরক্ষিত হয়, অন্য আর কিছুতেই তেমন হয় না। এইরূপে অতি সহজেই পানের আবাদ হয় বলিয়াই, এজেলায় পানের দর অতি কম। আর এক প্রকার সরু পার্ব্বত্য বাঁশ তাহার নাম বাঁজালী। তাহাও পানের বরজের পক্ষে অতি আবশ্যকীয় উপাদান। ইহার কাহন সাধারণতঃ ২৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা।

ইহার পর ছন ও বেত ফেণী মহকুমায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই সমস্ত ছন ও বেত স্বাধীন ত্রিপুরার পাহাড় হইতে মুহুরী নদী দিয়া চালান হয়। তাহাও অতিশয় সস্তা এবং সহজ প্রাপ্য। বেতের মধ্যে সুন্দি, গলাক, রাইচাং ও জালি বেত সস্তা। জালি বেতও মুলী বাঁশ এদেশীয়ের পক্ষে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। এইখানে ভাল জালি বেতের হাজার ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত। সুতরাং এইরূপ সস্তা বেত আর কুত্রাপি পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ফলতঃ প্রকৃতি দেবী অযাচিত ভাবে স্বীয় রত্ন ভাণ্ডার বিলাইয়া, সর্ব্বপ্রকারে এদেশ বাসীকে রক্ষা করিতেছেন।

এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে নারিকেল ও সুপারি উৎপন্ন হয়। অতি সাধারণ কৃষকও বৎসর বৎসর অন্ততঃ পক্ষে ১০০৲—১৫০৲ টাকার নারিকেল সুপারি বিক্রয় করিয়া থাকে। ২।৩ হাজার টাকার সুপারি ও নারিকেল বিক্রয় করে, এমন লোক এজেলায় অল্প নহে। তাই বোধহয় কালিদাস এই সমস্ত সাগরের উপকূল ভাগকে "তালীবন শ্যামোপকণ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ এজেলা হইতে লক্ষমণ সুপারিও ৮।১০ লক্ষ নারিকেল বিভিন্ন জেলায় রপ্তানী হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এজেলায়

"মড়ক" উপস্থিত হওয়াতে অনেক সুপারি ও নারিকেলগাছ মারা যায়। তাহাতে অনেক গৃহস্থের ক্ষতি হইয়াছে। এদেশীয় কৃষকের সম্পত্তিই প্রধানতঃ সুপারি ও নারিকেল বাগান। ফলতঃ নোয়াখালীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সুপারি ও নারিকেল বাগিচায় পরিপূর্ণ। বাগিচার প্রতি কাণির নিরেখ ৭৲, ৮৲ টাকার কম নহে। কিন্তু নারিকেল, সুপারি কেবল ভুলুয়া পরগণা ও সন্দ্বীপ হাতিয়ায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। পরন্তু ফেণী উপবিভাগে নারিকেল সুপারির বাগান আদৌ নাই। ইহার প্রধান কারণ লোণা মাটী না হইলে, নারিকেল সুপারিগাছ বাঁচিতে পারে না।

শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ন মহাশয়ের "নোয়াখালীর ইতিহাসের" পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত।

প্রজার অবস্থা—সন্দ্বীপ।

সুজলা সুফলা "সন্দ্বীপের" বিষয় কিছু লিখিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই কবি কালিদাসের কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

" শোভিছে লবণ-সিন্ধু শ্যাম কলেবর।
লৌহচক্র প্রায় দেখ ব্যাপী দিগন্তর॥
সুদূর গগন প্রান্তে সূক্ষ্ম নীলিমায়।
শোভে তীব বনরাজি পরিধিব প্রায়॥" *

'তমালতালীবনরাজিনীলা' সন্দ্বীপ বাস্তবিকই প্রকৃতির এক রম্য নিকেতন। ঊষা-রাগ-রঞ্জিত দিক্‌-চক্রবালে, সাগর-চুম্বিত বালার্ক-কিরণে, বীণা-বিনিন্দি-বিহগকণ্ঠের সঙ্গীত-সুধায়, ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-স্বননে বা নভোমণ্ডলের প্রশান্তনীলিমায় সর্ব্বত্র ও সতত এক নিসর্গ-সৌন্দর্য্য এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এখানে কবির বর্ণিত বহু 'হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে' মিশিয়া গিয়াছে, 'পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখীর'ও এখানে অভাব নাই। কেবল মাত্র অভাব, প্রকৃতির এই বাহ্য সৌন্দর্য্যের সহিত অধিবাসিগণের সুখশান্তির একটা সামঞ্জস্য। প্রাকৃতিক দৃশ্য কত চমৎকার ও মনোহর; আর ইহার অধিবাসিবৃন্দ কত দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্য-নিপীড়িত—ইহা ভাবিলে বিধাতার অনধিগম্য বিধান ও লীলা বৈচিত্র্যের কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। সন্দ্বীপ কোন কালে 'স্বর্ণ-দ্বীপ' ছিল। রুমের বাদসাহ সন্দ্বীপেই স্বল্পব্যয়ে জাহাজ নির্ম্মাণ করাইতেন। সন্দ্বীপের অতীতের সহিত বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্‌ তুলনা করিলে উত্তররাম-রচয়িতার ভাষায় বলিতে হয়-—'তে হি নো দিবসা গতাঃ।'

---

* চট্টলজননীর সুসন্তান কবি৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশানুবাদ হইতে উদ্ধৃত।...অঃ শ্লোক।

সন্দীপের পনর আনা লোকই কৃষিজীবী। সৌভাগ্যবশতঃ, কৃষিকার্য্যের সফলতার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, দয়াময় পরমেশ্বর তাহার সমুদয়ই সন্দীপে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রাখিয়াছেন। এখানকার ভূমি নোয়াখালী জিলার, এমন কি বঙ্গদেশের, অনেক অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর; কাজেই অধিক ফল-প্রসূ। মৌসুম বায়ুর (Monsoon) পথে অবস্থিত বলিয়া এখানে প্রায়ই বৃষ্টিব অভাব হয় না। অত্যধিক বারিপাতেও অধিককাল জল ক্ষেত্রে সঞ্চিত থাকিয়া শস্যের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে সমুদ্রের লবণাক্ত জল উঠিয়া তীরবর্ত্তী ফসল নষ্ট করে। তারপর সন্দীপের স্বাস্থ্য। এখানে ম্যালেরিয়ার কোন প্রভাব নাই। সমুদ্র-পরিবেষ্টিত বলিয়া এই স্থানেব জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত থাকিলে স্বাস্থ্যের জন্য ইহা পুরীর ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। অধিকাংশ কৃষক ইদানীন্তন যুগের শিক্ষার ফল হইতে বঞ্চিত; ইহা কথঞ্চিৎ দোষের হইলেও ইহার একটি ভাল দিক আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে যে বিলাসিতা সহজেই আসিয়া পড়ে, তাহার আক্রমণ হইতে কৃষকগণ রক্ষা পাইয়াছে। মিতব্যয়িতা কৃষকের প্রধান বন্ধু। বিলাসিতা এই মিতব্যয়িতাকে বিনষ্ট করিয়া কৃষকের সর্ব্বনাশ সাধন করে। সন্দীপের চাষারা চা চুরুট চিনেনা; মদ গাঁজা ছোঁয়না; বিড়ি, তাড়ি খায় না। এক 'ছিলিম' তামাক তাহাদের সকল শ্রান্তি দূর করে- সকল শান্তি দান করে। ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়াই হউক অথবা কৃষিকার্য্যের সহকারী পুত্র, পুত্রবধু, নাতি, 'নাতিনী' সহ একবার জ্যোৎস্না-বিধৌত উঠানের সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া শান্তি উপভোগ করিবার জন্যই হউক—তাহারা সাধারণতঃ শীঘ্রই পুত্র কন্যার বিবাহের আয়োজন করিয়া থাকে, আর তাহাতে একটু রংতামাসার বন্দোবস্তও করে। অতএব দেখা যায়, সন্দীপের কৃষকগণের উপর প্রকৃতি কৃপাময়ী, জলবায়ু অনুকূল; বিলাসিতা প্রভাবহীনা। মাতা বসুন্ধরার অনুগ্রহ এখানে প্রচুর। এদেশে 'ধানের উপর ঢেউ খেলিয়া' বাতাস বহিয়া থাকে। এখানে আরও আছে,-- কৃষকের প্রাণেব প্রাণ, বঙ্গের কৃষকের সুখসম্পদের মূলকারণ, ভূতপূর্ব্ব গবর্ণব জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশের কীর্ত্তি-স্তম্ভ, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের বড় আদরের ধন, জমিদারী **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত**। ইহা বাস্তবিকই জমিদার ও প্রজা উভয়েব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধন করে। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ সন্দীপের প্রজাগণ এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোনরূপ সুফলভোগী নহে। প্রাকৃতিক অবস্থার আনুকূল্য সত্ত্বেও, জমিদারের কর্ম্মচাবিগণের উৎপীড়নই সন্দীপের প্রজাকুলের বর্ত্তমান অবনতি ও উত্তরোত্তর দারিদ্র্যবৃদ্ধির হেতু। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্যের মধ্যেও এখানে অনেক নীবব অশ্রুপাত ও শোচনীয় দীর্ঘশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

যে সমস্ত কাবণে সন্দীপের কৃষিজীবিগণের ভাগ্যে সুখশান্তি ঘটিয়া উঠে না, জমিদারগণের দূরে অবস্থানই তন্মধ্যে প্রধান। ইতিহাসবিৎ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে ইহা আয়র্লণ্ডের কি সর্ব্বনাশই না সাধন করিয়াছে! কত সুখের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—কত ধনবান কৃষক পথের ভিখারী হইয়াছে! বাঙ্গলার—ভারতের—দুর্ভাগ্যবশতঃ এই জমিদারের অনুপস্থিতি এ

দেশেও আর বিরল নহে। শুধু জমিদারগণ কেন—অনেক মান্যগণ্য, জ্ঞানী ও ধনী ব্যাক্তিরাও আজকাল জননী জন্মভূমির ভদ্রাসনখানা পরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া কলিকাতার ন্যায় কোন বৃহৎ নগরীতে তড়িদালোকোদ্ভাসিত দ্বিতলগৃহে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় বসিয়া জীবন কাটাইতে ভালবাসেন। কেহ ম্যালেরিয়া বা মহামারীর ভয়ে গ্রাম ছাড়িতে বাধ্য হন, আবার অধিকাংশই আধুনিক কালের "ফ্যাসনের" খাতিরে স্বেচ্ছায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। স্বাস্থ্যের দরুণ সন্দ্বীপ বসবাসের অনুপযুক্ত ইহা কেহই কখনও বলিতে পারিবেন না। যাহা হউক জমিদারেরা স্বীয় জমিদারী হইতে অনুপস্থিত থাকিলে সর্ব্বস্থলেই তাহা দোষজনক হয়না। কারণ যাঁহাদের নানা জায়গায় জমিদারী আছে বা অন্য নানাবিধ কার্য্য আছে তাঁহাদের পক্ষে জমিদারীস্থলে সর্ব্বদা সশরীরে উপস্থিত থাকা সম্ভবপরও নহে। কিন্তু বিধাতার বিধানে যে শত শত প্রজার সুখশান্তি তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, যে সকল লোকের উন্নতি-অবনতিতে তাঁহাদের নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, তাহাদের সুখ দুঃখ কাহিনী স্বকর্ণে শুনিয়া বা স্বচক্ষে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া জমিদারগণের পক্ষে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ নিতান্ত বাঞ্ছনীয় নহে কি? বস্তুতঃ তথাকথিত 'বিশ্বস্ত' নায়েব গোমস্তা বা অল্পশিক্ষিত আমলার হস্তে লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবনমরণভার অর্পণ করিয়া জমিদারগণের দূরে অবস্থান কখনই সমীচীন নহে। এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের ইহাও কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশে 'বেঙ্গল প্যাজেণ্ট লাইফ' এ (Bengal Peasants' Life) বর্ণিত 'নবকুমারের' মত প্রজাহিতরত জমিদার বা প্রাতঃস্মরণীয়া ৺ রাণীভবানীর মত প্রজার 'মা বাপ' এখনও চিরতরে বিলুপ্ত হয় নাই। সন্দ্বীপে ত্রিচতুর্থাংশ কৃষক সারা বৎসর দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায়না, ক্ষেত্রে যত প্রচুর ফসলই উৎপন্ন হউক না কেন—তাহারা ইহজীবনে কখনও জমিদারের প্রাপ্য শোধ করিয়া মরিতে পারেনা, জমিদারের ডিক্রি সারাবৎসর ধরিয়া প্রজার মাথায় চাপিয়া থাকে, ইহা সন্দ্বীপের জমিদারগণ অবগত আছেন কিনা জানিনা। জমিদারগণ প্রজার অশেষ হিতসাধন করিবেন, এই আশায় সরকার বাহাদুর বঙ্গদেশের জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যাহাতে অনুপার্জ্জিত সম্পত্তি-ভোগের (Unearned increment of land) কলঙ্ক-কালিমা আমাদের জমিদারগণের ছায়াস্পর্শও করিতে না পারে তজ্জন্য সকল জমিদারের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। সন্দ্বীপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে সত্য, কিন্তু জমিদারগণ তথায় কোন বিদ্যালয় বা চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন; রাস্তানির্ম্মাণ, পুষ্করিণীখনন বা জীর্ণ খালের পুনঃ সংস্করণ দ্বারা কৃষিকার্য্যের কোনরূপ সুবিধা করিয়াছেন; বা দুর্ভিক্ষের কালে ধান্যের বীজদান, আর্থিক-সাহায্য, অথবা কিঞ্চিৎ খাজনা মাপ করিয়া প্রজার জীবনরক্ষা করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনি নাই। তাই সন্দ্বীপের প্রজারা 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র' মানিয়া লইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে।

সন্দ্বীপ বহু জমিদারের অধীন। প্রধানতঃ (১) মিঃ ইছলাইন ফণ্টিং ডি ম্যাজিংহাম সাহেবা

'কোর্জ্জন ষ্টেট' নামক সন্দ্বীপের ॥৹ আনা জমিদারীর মালিক ; তারপর (২) মিঃ এলেনা জে ডেলানী সাহেবা ।৹ আনা ; (৩) শ্রীভীমশঙ্কর দত্ত তেওয়ারী ৶৹ আনা ; ও (৪) শ্রীহরিহর দত্ত ⁄৹ আনা জমিদারীর মালিক। বড় দুঃখের বিষয়, কোন তালুকে কাহারও বার কড়া জমি থাকিলেও শুধু ঐ তালুকের জন্য তাহাকে চারিবার ৪ ষ্টেটে ঐ ষোল আনার অনুপাতে খাজনা দাখিল করিতে হয়। যে প্রজা দুই তিন তালুকে অংশীদার আছে তাহার ত আর দুঃখের কথাই নাই। ফলে, কোন কোন প্রজার অংশে দেয় খাজনার পরিমাণ দুই আনা, এক আনা, দুই পয়সা, এক পয়সাও হইয়া থাকে। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয়, সন্দ্বীপের প্রত্যেক তালুকের অসংখ্য অংশীদার আছে। এবং এক এক খানি তালুক এত বৃহৎ যে দুই তিন বিভিন্ন মৌজায়ও কখন কখন ইহার অন্তর্ভুক্ত জমি আছে। প্রজারাও কেহ কেহ পরস্পর হইতে ৪।৫ মাইল দূরে সম্পূর্ণ অপরিচিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, অনেক তালুকের অন্যূন ৮০।৯০, এমন কি শতাধিকও (যথা তালুক লক্ষ্মীনারায়ণ সেন) অংশীদার দেখা যায়। বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইনের বিচিত্র বিধানে প্রজারা প্রত্যেক তালুকের মোট খাজনা আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও একত্রে দায়ী—(jointly and severally liable). পাঠকগণ ইহা হইতে অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, পরস্পরের অপরিচিত এরূপ বহু অংশীদার বর্ত্তমানে প্রায় তালুকেরই বাৎসরিক খাজনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ হয় না। কোন প্রজা দারিদ্র্যগ্রস্ত, কেহ বা আলস্য-পরায়ণ (তাহার অংশে হয়ত দেয় খাজনা দুই পয়সা মাত্র) আবার কেহ বা দুরভিসন্ধি-যুক্ত—পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ এক প্রজা অন্য প্রজাদিগকে চিনিতে না পারায় এক তালুকের সব খাজনা একত্র দাখিল করার সুবিধা হয় না। এমতা-বস্থায় সন্দ্বীপের অধিকাংশ তালুকেরই বাকী খাজনার জন্য নালিশ হয়। [বাকী খাজনা অনেক সময় মোট খাজনার অনুপাতে হয়ত $\frac{১}{৪০}$ বা $\frac{১}{২০}$ অংশ—তন্মূল্য দাবী ১০৲ টাকাও হইতে পারে] যাহা হউক, তমাদির প্রাক্কালে উপরোক্ত ৪ ষ্টেট্ হইতেই এবম্বিধ নালিশ প্রত্যেক তালুকের সকল অংশীদারের বিরুদ্ধে (যাহারা খাজনা দিয়া দাখিলা লইয়াছে তাহারাও মুক্ত নহে) 'রুজু' হয়। অতঃপর পেয়াদার সমন জারী হইতে আরম্ভ করিয়া মামলা ডিক্রী হওয়া পর্য্যন্ত মূর্খ প্রজা যেরূপে তিল তিল করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন—বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি না। পাঠক জানিবেন সন্দ্বীপের মত ক্ষুদ্রস্থানেও ২ জন মুনসেফ্, ৮ জন উকিল ও ন্যূনকল্পে ১৫ জন মোক্তারের জীবিকা-সংস্থান হইতেছে।

তারপর ডিক্রীজারী দ্বারা যেরূপ টাকা আদায় করা হয় সেই বিষয় আমাদের স্বদেশবাসী সকলেই জানেন। যদি আজকাল আবার "ইম্‌পীচ্‌মেণ্টের" মত একটা কিছু হয়, আর বার্কের মত কোন বক্তা থাকেন, তবে উপযুক্ত স্থানে তাহার প্রকৃতবর্ণনা সম্ভব হইতে পারে। প্রজার উপর যে এই রকম অবিচার হয়, তাহার সহায় ও সহচর যাঁহারা, তাঁহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই।

পাঠক, প্রতি বৎসব, প্রতি মাসেই, এরূপ ঝঞ্ঝাবাত সন্দ্বীপের প্রজার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। ফলে তাহারা এখন জীবন্মৃত। জমিদারের আমলার পেষণে শরীরে এক বিন্দু রক্ত নাই; আছে, দিন রাত্রি ব্যাপিয়া পুত্রকলত্র ও কন্যার অন্নচিন্তা ও বস্ত্রচিন্তা—আর এক কঙ্কালসার শরীর। বাস্তবিক "চিতা দহতি নির্জীবং, চিন্তা দহতি জীবিতম্।"

বহু জমিদার সন্দ্বীপের অবনতির অন্যতম কারণ। অনেকেরই চারি জমিদারের অধীনে জমি আছে। অতএব প্রজাকে খাজানা দিবার সময় নানা অসুবিধায় পড়িতে হয়। কিছুদিন পুর্ব্বে তেওয়ারী ষ্টেটে (।০ আনা) একজন জমিদার ছিল এবং এক দাখিলায় কাজ চলিত। এখন ঐ জমিদারী ৵০ আনা ও ৴০ আনা হাবে বিভক্ত হইয়া ২টী ষ্টেটেব উদ্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমান লেখক আইনজ্ঞ নহে, জমীদারেরা এরূপ ২ ভাগে খাজানার দাবী করিতে পারে কিনা জানিনা। কিন্তু উভয়ে একটী ষ্টেট্ বাখিয়া মোট আয় ঐ হারে দুই অংশ হওয়া কি সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় ছিলনা? তাহাতে প্রজাব আব একজন মনিব বাড়িত না, জমিদারেরও আর এক আমলাবহুল কাছারী বহুব্যয়ে রাখিবার দরকাব হইত না। কিন্তু সন্দ্বীপেব জমিদার হওয়া যেরূপ সুখজনক ও লাভজনক, তাহা জানিলে কে এক জমিদাব হইতে অনিচ্ছুক হইবে? কালের কুটীল গতিতে ঐ এক আনা ষ্টেট্ যে পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ৩১০ পয়সাব আব এক ষ্টেটে পবিণত হইবেনা, তাহা কে বলিতে পারে?

সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব বিষয়ক আইনেব সংশোধন ও পবিবর্ত্তন হইবে। সন্দ্বীপ এসোসিয়েসনেব সুযোগ্য সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমাব নাগ বি এল্ মহাশয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগীয় সেক্রেটারী সমীপে সন্দ্বীপেব লক্ষাধিক প্রজাব ঐরূপ বহুদিনের অভিযোগ জ্ঞাপন কবিয়াছেন, আমরা অবগত হইলাম। এবং যাহাতে এবাব বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন সংশোধনকালে তাহাতে এমন একটী ধাবা বিধিবদ্ধ হয়, যাহাতে জমিদারেরা তালুকের প্রত্যেক সরিকদাব প্রজার পৃথক পৃথক নামজাবা করিয়া লন এবং প্রজাবা শুধু স্ব স্ব অংশের খাজানার জন্য ১৮৫৯ সনেব ১১ আইন মতে দায়ী থাকে, তজ্জন্য প্রার্থনা কবিয়াছেন। আঁশা করি, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট সন্দ্বীপের প্রজাকুলের এ প্রার্থনায় কর্ণপাত কবিবেন এবং তালুকের সকল অংশীদারের বিরুদ্ধে এককালীন ডিক্রী প্রথার (Joint Decree) একটা সংশোধন করিবেন। নতুবা অচিরেই সন্দ্বীপে হাহাকার উঠিবে। বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান খাজানার আইন অনুসারে প্রজাবা জবীপেব সম্যক্ উপকারিতা ভোগ করিতে পারিতেছে না। কারণ প্রত্যেকের জমি ও জমা পৃথক ভাবে স্বিবীকৃত হইয়া থাকিলেও অংশীদারগণের দোষে তাহাদিগকে সর্ব্বদা বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

আমাদের মনে হয়, গবর্ণমেণ্ট সহজেই এই অভিযোগেব একটা প্রতীকার কবিতে পারেন। কারণ জরীপ জমাবন্দী দ্বাবা প্রজাব সত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কাহার অংশে কি পরিমাণে জমি ও তদংশের কত খাজানা তাহাও ঠিক হইয়াছে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক প্রজা ও তাহার অংশেব জমি তত্তৎ খাজানা আদায়েব জন্য প্রথমতঃ দায়ী থাকা উচিত। তাহাতেও যদি

ডিক্রীর টাকা আদায় না হয় তবে ১৮৫৯ সনের ১১ আইন মতে সমস্ত তালুক বিক্রয়ের নিয়ম করিলে জমিদারগণের কোন সত্ত্ব হানি হয় না ; পক্ষান্তরে গরীব প্রজাকুলের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

এক কথায়, জমিদারদিগের জমিদারীস্থল হইতে দূরে অবস্থানই সন্দ্বীপের প্রজাগণের সকল সর্ব্বনাশের কারণ। জমিদারের অনুপস্থিতি দরুণ এতদধিক বিষময় ফল অন্য কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ আমাদের সহৃদয় জমিদারগণ তাঁহাদের 'বিশ্বস্ত' কর্ম্মচারিবৃন্দের এরূপ কার্য্যবিধি বা প্রজার এমন দুরবস্থার বিষয় অবগত নহেন। যাহা হউক, জমিদারগণ ইচ্ছা করিলেই নিজেরা প্রজার এ দুঃখ দৈন্যের একটা প্রতিকার করিতে পারেন। যদি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহারা আমলার প্রতি এরূপ একটা কড়া আদেশ প্রদান করেন যে যাহারা খাজানা দিয়াছে তাহাদের বাড়ীতে ডিক্রী যাইতে পারিবেনা বা তাহাদের উপর অন্য কোন অত্যাচার হইতে পারিবে না এবং এই আদেশ যদি কর্ম্মচারিগণ যথার্থই পালন করিতে পারেন, তবে আশা করি প্রজাগণেব অনেক মঙ্গল হইবে। নতুবা ইহা ক্রমশঃ প্রজার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত প্রবেশ কবিয়া সকলকে সমূলে উচ্ছন্ন করিবে। প্রজাব উন্নতিতে জমিদাবের উন্নতি। জমিদারগণের সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত। সন্দ্বীপের দয়াবান জমিদারগণ প্রজার এই দুর্দ্দশায় দৃষ্টিপাত করিয়া তৎপ্রতিকারে যত্নবান হউন্—এই আমাদের অনুরোধ।

শ্রীরাজকুমাব চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা নোয়াখালী সম্মিলনীর

বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী।

দশম বার্ষিক অধিবেশনে

পঠিত।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদেব সম্মিলনী আজ একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বিগত ১৯০৫ সনের প্রারম্ভে নোয়াখালীব কতিপয় স্বদেশহিতৈষী ছাত্র এই সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে সম্মিলনী নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনে সচেষ্ট ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। যাঁহাদের সাহায্য ও আনুকূল্যে শিশু সম্মিলনী যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সফলতা লাভ করিতে পারে না।

উদ্দেশ্য

কলিকাতা প্রবাসী নোয়াখালীর অধিবাসিগণের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যস্থাপন ও সংরক্ষণ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। যিনি যেখানেই থাকুন না কেন এই সভাকে নোয়াখালীবাসিগণের

সাধারণ মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে। যে সকল বিদ্যার্থী ছাত্র দারিদ্র্য নিবন্ধন উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছেন, সম্মিলনী তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিবেন। স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়ে নোয়াখালী অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে; সেজন্য যথাসম্ভব অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। পীড়িত ও বিপন্নদিগকে সেবা শুশ্রূষা ও যথা সম্ভব অর্থদানে সাহায্যে করা আমাদের এক অভিপ্রায়। এই কার্য্যে আমাদের সম্মিলনীকে আমরা সমস্ত দেশের সহকারী স্বরূপে উপস্থিত করিতেছি। যাঁহারা সম্মিলনীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা ভবিষ্যতে নোয়াখালীর নেতৃস্থানীয় হইতে পারেন; তাঁহাদের দ্বারা যাহাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই সম্মিলনীতে আমরা নোয়াখালীর সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় অবস্থার বিষয় আলোচনা করতঃ প্রতিকার-পন্থা অবলম্বনে যত্নপর হইব।

সাধারণ বিভাগ।

পত্রাদির আদান-প্রদান, অধিবেশনের আয়োজন, অর্থ ও সহানুভূতি সংগ্রহ, আয়-ব্যয় নির্ণয় এই বিভাগের অন্তর্গত। বর্ত্তমান বর্ষে আমরা এই বিভাগের কার্য্যে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছি। আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে নোয়াখালীর অন্যতম জমিদার বঙ্গের ধনকুবের, কলিকাতা সমাজের বরেণ্য নেতা অনারেবল শ্রীযুক্ত রাজা হৃষীকেশ লাহা সি,আই, ই, মহোদয় ভবিষ্যতে আমাদের সম্মিলনীতে উপস্থিত হইবেন এইরূপ আশা প্রদান করিয়াছেন। আমাদের জেলার মফঃস্বলস্থ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্মিলনীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। সম্মিলনীর আয়ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বিগত ইং ১৯১১-১২ সনে সম্মিলনীর আয় ৪৭৲ টাকা; ১৯১২-১৩ সনের আয় ২৮৩৶৩ পাই; ১৯১৩-১৪ সনের আয় ২৫৭৷৶৩ পাই; আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনীর আয় ৩৪৬৶৯ পাই।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ঢাকা নগরীতে নোয়াখালী সম্মিলনীর এক শাখা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই শাখা যেন মহীরূহে পরিণত হইতে পারে তজ্জন্য আপনারা ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করুন। আমাদের সম্মিলনীর সভাপতি মহাশয় সভ্যগণকে তাঁহার নিজ প্রাসাদে এক সান্ধ্য সম্মিলনে আহ্বান করিয়াছিলেন। আমাদের সম্মিলনীর ইতিহাসে উহা একটী স্মরণীয় আনন্দের দিন।

এই বৎসরে সাধারণ সভার সর্ব্বসমেত নয়টী অধিবেশন ও দুইটী বিশেষ অধিবেশন হয়। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির নয়টী অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনের বিবরণ পশ্চাতে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

সেবা ও ছাত্র ভাণ্ডার।

সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের অনেক সভ্য একত্রীভূত হইয়া অনেক ছাত্রাবাসে আছেন। যেখানে নোয়াখালীর একজন ছাত্র আছেন সেখানে প্রায়ই নোয়াখালীর দুই তিন জন ছাত্র

আসিয়া জুটিয়া পড়ে। অবশ্য অনেক সভ্য যে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া বাস করেন না আমরা একথা বলিতে পারি না। এইরূপ একত্র বসবাসের ফলে সেবা বিভাগের স্বেচ্ছা সেবকগণের কার্য্য সাধারণতঃ তেমন দরকার হয় না। সে যাহা হউক, আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ আবশ্যক মত বিগত বৎসরেও কয়েকটী সেবার কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের কয়েক জন সভ্য বসন্ত রোগে পীড়িত হইলে, আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাদের হাঁসপাতালে যাওয়ার পুর্ব্বে বাটীতে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। আমাদের সভ্যগণ কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া নোয়াখালীর দুই একটী বিপন্ন পরিবারকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য দান করিয়াছেন। সেবা বিভাগে আমরা যত সামান্য কার্য্যই করিনা কেন তজ্জন্য আমরা নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। সুখের বিষয়, আমাদের এমন অনেক সভ্য আছেন, যাঁহারা জাঁকজমক না করিয়া, নাম প্রকাশ করিবার কোন অভিলাষ না রাখিয়া জনসাধারণের চক্ষুর অন্তরালে অনেক বিপন্ন ও রোগীকে আর্থিক সাহায্য দান ও অন্যান্যরূপে সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্ম করিয়াই সুখী, পরন্তু লোক লোচনের সম্মুখে তাঁহাদের আত্ম প্রশংসা বিজ্ঞাপন করিলে তাঁহারা বিশেষ লজ্জা বোধ করেন। সম্মিলনী এবম্বিধ নীরব কর্ম্মীর জন্য নিজকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতেছে। তবে আমরা কর্ত্তব্যানুরোধে লৌকিকতা রক্ষার জন্য ও সেবা বিভাগের যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যের জন্য এতৎ সম্পর্কে কয়েকজন নিঃস্বার্থপর স্বেচ্ছা সেবকের নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ আমাদের সুযোগ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুপ্ত কবিরত্ন মহোদয় আমাদের অনেক সভ্যকে শুধু যে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি অনেককে বিনামূল্যে ঔষধাদিও প্রদান করিয়া থাকেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র শূর যখনই সংবাদ পাইয়াছেন, তখনই রোগীর নিকট যাইয়া তাঁহার চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করিয়াছেন। সম্মিলনীর সেবার কার্য্যে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম, এ, শ্রীযুক্ত রসুল আমিন চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার বসু এম, এ, শ্রীযুক্ত মৌলভি নাদেরজ্জমান, শ্রীযুক্ত মৌলভি বদিয়ার রহমান, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে বি, এস-সি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ দাস বি, এ, ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সেবা বিভাগের কৃতকার্য্যতা সম্মলিনীর অন্যান্য সভ্যগণের সাহায্য ও সহানুভূতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যথা সময়ে সংবাদ না পাইলে প্রতিকার বিধান করা যায় না। কোথায় কোন্ সভ্যের অসুখ হইয়াছে বা তিনি কি অবস্থায় আছেন, তাহা সম্পাদকের পক্ষে সর্ব্বত্র নিজে নিজে অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব আমরা এই সহানুভূতির জন্য পুনরায় সভ্যগণকে বিনীত নিবেদন করিতেছি।

ছাত্র ভাণ্ডার।

এ বৎসর আমরা অন্যূন ৮ জন ছাত্র-সভ্যকে পুস্তক-সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। এ জন্য আমরা আমাদের পরার্থপর কয়েকজন কলিকাতা অধিবাসী ছাত্র ও অন্যান্য জিলার

ছাত্রগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি। আমরা অপর কয়েকজনকে অর্থদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছি। অত্রত্য ২।১টী Charitable Institution হইতে মাসিক বা এককালীন সাহায্য লাভের জন্য ও কলেজ হইতে যাহাতে আমাদের কোন কোন সভ্য অবৈতনিক ভাবে গৃহীত হইতে পারে, সম্মিলনী তজ্জন্য নিজেদের লোকদ্বারা বা অন্যকে অনুরোধ করিয়া ২।১ টী দরিদ্র ছাত্রের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সম্মিলনীর সেবা ও ছাত্র-ভাণ্ডারে আয় ও ব্যয় মাত্র ৪৬৲ টাকা। অর্থাভাবে আমরা অনেক উপযুক্ত প্রার্থীকে বাধ্য হইয়া বিফল মনোরথ করিয়াছি। সম্মিলনীব অন্যান্য বিভাগেব ন্যায় এই বিভাগে আমরা আমাদের মহানুভব ব্যক্তিগণের তেমন কৃপাদৃষ্টি লাভ কবিতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা বি, এ, এম, আর, এ, এস, মহোদয় ছাত্র-ভাণ্ডাবে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা আমাদের দেশের হিতৈষী ব্যক্তিগণের দ্বারে সেবা ও ছাত্র-ভাণ্ডাবেব জন্য ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান। আশা কবি, এই বিভাগেব মহত্ত্ব বিবেচনা করিয়া সকলে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। অর্থই ছাত্রভাণ্ডারের একমাত্র প্রধান সম্বল। ইহাব অনাটন হইলে এই বিভাগের কার্য্য এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। অর্থেব অল্পতা হেতু এই বিভাগে আরও যে অধিক কাজ হয় নাই, তজ্জন্য আমবা দুঃখিত আছি। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা, এ বৎসব ছাত্র সাহায্যে আমবা অধিক অর্থব্যয় করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমরা সুখানুভব করিতেছি। মোটের উপর সকলের আর্থিক দান ও অন্যপ্রকার সাহায্য পাইলে এই বিভাগও যে স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের ন্যায় কৃতকার্য্য হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। এই বিভাগের ভবিষ্যৎ বড়ই উজ্জ্বল দেখিতেছি। আশা করি, আপনাদের বদান্যতা ও মহানুভবতা আলোকে ইহা আরো উজ্জ্বলতর হইবে। পরিশেষে সেবা বিভাগের স্বেচ্ছা সেবকগণকে ও ছাত্র-ভাণ্ডাবে অর্থ ও পুস্তকাদি দাতাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ও তাঁহাদের মস্তোকপরি ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ আকাঙ্খা করতঃ এই বিভাগের আলোচনা সমাপন করিলাম। আমাদের বদান্যবর পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর নির্ম্মলাবৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া নোয়াখালীর বহু ছাত্রের জন্য বিদ্যামন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। এবং তিনি বহুভাবে নোয়াখালীবাসীর বিদ্যাশিক্ষার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। তাঁহার "অরুণচন্দ্র হাইস্কুল" চিরকাল তাঁহার শুভ্রকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। কালের করাল গতিতে যদি নোয়াখালী সহর সমুদ্রকুক্ষিগত না হয়, তবে কুমার অরুণচন্দ্র হাইস্কুল অচিরে অরুণচন্দ্র কলেজে পরিবর্ত্তিত হইবে, আমাদের আশা ও বিশ্বাস আছে। আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা নোয়াখালীর অনেক ছাত্রকে পুস্তক ও অর্থ দ্বারা গোপনে সাহায্য করিতেছেন, ইহাও আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এখানে উল্লেখ করিতেছি। আমরা যাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছি, তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে অসমর্থ; আশা করি ইহাতে কেহ কিছু মনে করিবেন না।

সাহিত্য-বিভাগ।

সমাজিক ও নীতিমূলক প্রবন্ধাদি পাঠ, নোয়াখালীর প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের

উপাদান সংগ্রহ, নোয়াখালীর ভাষাতত্ত্বের আলোচনা এই সকল এই বিভাগের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। উক্ত বিভাগের অধীন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত মহোদয় সাহিত্য সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ, এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস, সি, "আমাদের নোয়াখালী" শীর্ষক এক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করেন ও আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন মহাশয় উহার মুদ্রণ ব্যয় বহন করেন। উক্ত বিভাগে শ্রীযুক্ত মৌলবী নাদেরেজ্জমান সম্মিলনীর উপকারিতা সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর নোয়াখালী জেলার মুখপত্র স্বরূপ একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই আয়োজনে আমাদের মহামান্য সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর আমাদের প্রধান সহায় স্বরূপ হইয়াছেন। উক্ত বিভাগে আমরা আরও অনেক কাজ করিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু নোয়াখালীতে হঠাৎ দুর্ভিক্ষের আক্রমণ উপস্থিত হওয়ায় ভার-প্রাপ্ত সহকারী-সম্পাদক নোয়াখালী সম্মিলনী দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের ভার গ্রহণ করেন। এস্থলে আমরা তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি। আমরা অদ্যাবধি ১৫০১৷৯ পাই সংগ্রহ করিয়াছি। তন্মধ্যে আমাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ৫০০৲ টাকা, বাবু সারদা প্রসন্ন দাস ২৫৲, বাবু মন্মথ নাথ মুখার্জ্জি উকিল, হাইকোর্ট ২৫৲, বাবু নরেশচন্দ্র সিংহ, উকিল, হাইকোর্ট ৫০৲, কলিকাতা। ট্রেণিং একাডেমির ছাত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র নাথ দাঁ ২০০৲, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, (অমৃত বাজার পত্রিকা,) ১০৲, দ্রুগ্ নিবাসী Mr. G. B Chandiramani ১৫০৲, ডাক্তার এন্, কে, মজুমদার ৫০৲, কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় ১০৲, মৌলবী আবদুল করিম বি, এ, ১০৲, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন মহাশয়ের পত্নী ১০৲ বাবু ভাগীরথচন্দ্র দাস ১০৲ ও শ্রীযুক্ত উদয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন, উক্ত মহাশয়গণ এবং অন্যান্য যাঁহারা আমাদের এই ভাণ্ডারে অর্থ দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। উক্ত অর্থ হইতে ৬০০৲ টাকা আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে অর্পণ করিয়াছি। ১০০৲ সুহৃদ-সম্মিলীতে এবং ৫০৲ টাকা ফেণীরিলিফ্ ফণ্ডে দিয়াছি। ৫৭৭৷৹ আনা নোয়াখালীর দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইয়াছে। তদতিরিক্ত ৬৲ টাকা আবশ্যকীয় খরচের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। মোটের উপর ফণ্ড হইতে ১৺৩৷৹ আনা ব্যয়িত হইয়াছে।

শিক্ষা বিভাগ।

নোয়াখালীর দরিদ্র ছাত্রগণের বিদ্যালাভের উপায় নির্দ্ধারণ, নিরক্ষর শ্রমজীবি ও কৃষকগণের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এই বিভাগের কার্য্য। উক্ত বিভাগের প্রথম দুই কার্য্যে আমাদের ঐকান্তিক বাসনা থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাব প্রযুক্ত আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। এই বিভাগে স্ত্রীশিক্ষাই আমাদের প্রধানতম কার্য্য। বিগত ১৯১১ সনের ২৬শে নবেম্বর তারিখে এই সম্মিলনী নোয়াখালীবাসিনী দুইজন উৎকৃষ্ট রচনা লেখিকাকে পুরস্কার বিতরণ করিতে ইচ্ছা করে। সম্পাদক মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন

কাঞ্জিলাল, এম, এ, বি, এল, মহোদয় প্রবল বাসনা সত্বেও অর্থাভাব প্রযুক্ত উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ হন। তিনি দুঃখিত হইয়া লিখিয়াছিলেন "এইরূপ গুরুকার্য্য ভার স্কন্ধে নিতে যে অভিজ্ঞতা ও অর্থবল দরকার তাহা কি কখনও পাওয়া যাইবে? বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতাবাসী বিদ্যার্থীগণের পক্ষে এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ, সময় ও পরিশ্রমের অপচয় ভিন্ন আর কি হইবে।"

পরবর্ত্তী বর্ষে সম্মিলনী স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। উক্ত বর্ষে মং ৬৫৲ টাকা পুরস্কার বিতরণে ব্যয়িত হয়। বিগত ১৯১৩-১৪ সনে সম্মিলনী শিক্ষা বিভাগে পারিতোষিকের জন্য মং ১৩৭।৵৩ পাই ব্যয় করেন। এই আশাতিরিক্ত উন্নতির জন্য উক্ত বর্ষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার রায় এম, এ ও শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার বি, এ মহোদয় আমাদের ধন্যবাদার্হ। আলোচ্য বর্ষে সর্ব্ব সমেত ৬৩ জন মহিলা রচনার প্রতিযোগিতায় ও ৭৮ জন মহিলা শিল্পের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। উক্ত বিভাগের পারিতোষিকের জন্য মং ২০১৸৵৩ পাই ব্যয়িত হইয়াছে। মোটের উপর বলিতে পারি আমাদের এ বিভাগের কার্য্য আশানুরূপ সফলতা লাভ করিয়াছে এবং তজ্জন্য আমাদের উক্ত বিভাগের ভার প্রাপ্ত সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৌলভী গোলাম মোস্তাফা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বর্ত্তমান প্রচলিত প্রথা আমাদের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক কিনা উহা বিষম সমস্যার বিষয়। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি সাধনই আমাদের সম্মিলনীর অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের প্রচলিত প্রথা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সম্পূর্ণ উপযোগী কিনা, সে বিষয়ে মত ভেদ আছে। ভবিষ্যতে নিয়ম মত পরীক্ষা গ্রহণই আমরা সমীচীন মনে করিয়াছি। অতএব আগামীবর্ষ হইতে মহিলাগণের পরীক্ষা গ্রহণই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। আমাদের ভরসা আছে এ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, দেশের জমিদার এবং ভূস্বামীবর্গ এবং বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইব। আমরা আরও প্রস্তাব করি ভবিষ্যতে যাহাতে নোয়াখালীতে প্রাপ্ত শিল্প-দ্রব্যাদির প্রদর্শনী হইতে পারে ও আমাদের মাতৃস্থানীয়া মহিলাগণকে উহা দেখাইতে পারি এবং পুরস্কার নোয়াখালীতেই বিতরিত হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। আমাদের বিশ্বাস কলিকাতায় পুরস্কার ঘোষণা করিয়া নোয়াখালীতে মহিলাদিগের নিজ হস্তে প্রদান করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে আমরা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করিতে পারি। আমাদের কোন কোনও বন্ধু বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা গ্রহণ কার্য্য কোন প্রকারেই আশানুরূপ হইতে পারে না। তাঁহাদিগের অবগতির জন্য ঢাকা বিভাগের স্কুল সমূহের Inspectress Miss Garret মহোদয়ার মন্তব্য হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। "These societies are doing a work done by no one else......for these parts of the Province. Therefore, where Zenana governess cannot be supplied, the work of these societies should be encouraged;

for by their means women in Pardah are encouraged towards self-development."

আমাদের যুবক সভ্যগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিশীকান্ত মজুমদার মহোদয় এম, এ পরীক্ষায় যিনি আমাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তাঁহাকে একটি সুবর্ণপদক পুরস্কার দিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য টোল বিভাগে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার্থ "গৌরীনাথ সার্ব্বভৌম" পুরস্কার প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার দত্ত বি, এ পরীক্ষায় যিনি আমাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তাঁহাকে এক রৌপ্যপদক পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত আছেন। আলোচ্য বর্ষে কোনও অনিবার্য্য কারণে তাঁহার পুরস্কার স্থগিত রহিল। বর্ত্তমান বর্ষে ও আমরা আর একটি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি। সিটি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত অমূল্য কৃষ্ণ বসু, নোয়াখালী সম্মিলনী সভার under graduate সভ্যদিগের মধ্যে যিনি "আমাদের সমাজ" বিষয়ক রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে এক রৌপ্য পদক প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উক্ত রচনা আগামী ১লা জানুয়াবির মধ্যে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রচনা আমাদেব মাতৃভাষায় লিখিতে হইবে।

আলোচ্যবর্ষে আমাদিগেব সম্মিলনীর কার্য্য বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং আমাদিগকে অনেক অপ্রত্যাশিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ পুরস্কাব বিতবণ বিলম্বে হওয়ায় এবং দুর্ভিক্ষ ও পত্রিকার জন্য সাধারণ বিভাগে মোটের উপর ডাক খরচ ও অন্যান্য ব্যয় অধিক করিতে হইয়াছে। এ বৎসরেব আয় ব্যয়েব হিসাবে ছাপা খরচ কাহারও নিকট অধিক হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; তদুত্তবে আমরা জানাইতেছি যে উহাই আমাদের সম্পূর্ণ ছাপা-খরচ নহে। আমাদেব শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় তাঁহাব নিজ ব্যয়ে সম্মিলনীর নিয়মাবলী ও 'কলেরা ও বসন্ত রোগ' প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় বিষয়ে এক উপদেশ পত্র ছাপাইয়া সম্মিলনীব পক্ষ হইতে নোয়াখালীর গ্রামে গ্রামে বিতরণ করাইয়াছেন। অধিকন্তু ছাপা-খরচের জন্য ১৩।০ আমরা সভ্যগণ হইতে পাইয়াছি। দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের আবেদন পত্রাদি ছাপাইবার খরচও ৫৲ টাকা পড়িয়াছে। পত্রিকা বিভাগে এ পর্য্যন্ত সম্মিলনীর তহবিল হইতে ৩৷৷১০ কর্জ্জ লওয়া হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত পত্রিকার স্থায়ী আয়ের পন্থা নিরূপিত না হয়, ততদিন সম্মিলনীকে পত্রিকার আনুসঙ্গিক সামান্য সামান্য ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে। তাহাও সম্ভবতঃ অনধিক কালের জন্য। পত্রিকার অন্যান্য বিশেষ বিশেষ খরচাদি বর্ত্তমানে পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ই বহন করিতেছেন।

আমাদের অভাব।

সম্মিলনীর কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; দিনদিনই সম্মিলনীকে বহু ব্যয় সাপেক্ষ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে। প্রবর্ত্তিত স্ত্রীশিক্ষার প্রচার কল্পে পরীক্ষা গ্রহণ

কার্য্যও অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। এই কার্য্যের জন্য সম্মিলনীর সভ্যগণকে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে। আমাদের দাতা ও অভিভাবকগণকে সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়া দিতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী অর্থ-ভাণ্ডার (fund) না থাকিলে এরূপ গুরু-দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। সহযোগী ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভায় ও অন্যান্য সম্মিলনীতে স্থায়ী অর্থাগমের উপায় রহিয়াছে। সেখানে সদাশয় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড বার্ষিক ১০০৲ টাকা ও ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুর ১৫০৲ টাকা চাঁদা প্রদান করিতেছেন। তদুপরি উক্ত সভায় আমাদের সম্মিলনীর ন্যায় পৃষ্ঠপোষক ও সদাশয় অভিভাবকগণ নিয়মিত সাহায্য করিয়া থাকেন। দরিদ্র ছাত্রগণ হইতে প্রাপ্ত চাঁদা দ্বারা কোনও বৃহৎ কার্য্যই সাধিত হইতে পারেনা। আমার ভয় হয় একদিন হয়ত আমাদের সমস্ত আশাভরসা উপযুক্ত অর্থাভাবে বিলীন হইয়া যাইতে পারে। স্থায়ী ভাণ্ডার (fund) ও চাদার উপরই আমাদের সম্মিলনীর দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। বস্তুতঃ অর্থাভাবে আমাদের কার্য্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না। অতএব আমাদের দেশের ধনীগণকে ও আমাদের পিতৃস্থানীয় ভূস্বামী-বর্গকে এ কার্য্যে আমাদের সহায়তার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডকে আমাদের এ কার্য্যে সাহায্য করার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের ভরসা এই যদিও আমাদের সম্মিলনীর ভাণ্ডারে সুবর্ণ রজত মুদ্রার অভাব, তথাপি যাঁহারা আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক তাঁহারাই আমাদের ধনরত্ন সদৃশ। তাঁহারাই সম্মিলনীর আশ্রয় স্থল। কার্য্যকালে তাঁহাদের উৎসাহ বাক্য, বিপদে তাঁহাদের পরামর্শ, সুখদুঃখে তাঁহাদের সহানুভূতি ইহাই আমাদের অমূল্য সম্পদ।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

রিপন কালেজের স্বত্বাধিকারী, স্বদেশ হিতৈষী অনারেবল্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় সুযোগ্য সুপারিন্টেনডেণ্ট শ্রীযুক্ত অমৃতচন্দ্র ঘোষ মহোদয়গণ তাঁহাদের কলেজ গৃহে সম্মিলনীর আজন্ম অধিবেশনের স্থান দান করতঃ আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

নোয়াখালী সম্মিলনী, সঞ্জীবনী ও বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রিকায় আমাদের সম্মিলনীর সমাচার সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য .সম্পাদকগণ আমাদের ধন্যবাদার্হ। অধিকন্তু যে সকল মহাত্মা স্বীয় আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ দ্বারা সম্মিলনীর ক্ষীণ কলেবর সবল ও পুষ্ট করিয়াছেন ও যে সকল সভ্যের অদম্য উৎসাহ ও সহায়তায় আজ সম্মিলনী কৈশোরে পদার্পণ করিল, আজ দশম বর্ষের কার্য্যান্তে সম্মিলনী তাঁহাদের নিকট আপনাকে চিরঋণী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

এ বৎসর দুর্ভিক্ষের জন্য সম্মিলনীর কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করিতে হইয়াছিল ও অধিবেশন

বিলম্বে হইতেছে, আশাকরি, সহৃদয় সভ্যগণ কার্য্যের গুরুত্বজ্ঞানে সম্পাদককে তাঁহার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী ও বিলম্বের জন্য ক্ষমা করিবেন। যাঁহারা আমাকে এই বৎসরের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবার জন্য সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার কার্য্যে বহু ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটী পরিলক্ষিত হইতে পারে ও হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ আমরা এখনও কোন কার্য্যেই সম্পূর্ণতা ও সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি নাই; কিন্তু আশাকরি, আমার স্বদেশবাসী সহৃদয় ভ্রাতৃগণ আমার অজ্ঞান কৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। বিশেষতঃ সম্মিলনীর চাঁদা সংগ্রহ করা যে কি এক দুরূহ ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের বোধগম্য নহে। এই চাঁদা সংগ্রহ করিতে সকল সময় সমর্থ ছিলাম না বলিয়াও বহুকার্য্যে শিথিলতা পরিলক্ষিত হইতে পারে।

উপসংহার।

সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণ করতঃ আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছি; উপরে সর্ব্বদর্শী ভগবান, নীচে সর্ব্বংসহা ধরিত্রী, সম্মুখে আশা ও চারিপার্শ্বে আমাদের দেশ ও সমাজকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইব। ভবিষ্যতে তিমিরাবৃত আশার গহ্বর হইতে মনিমুক্তা রত্ন-কাঞ্চন সংগ্রহ করিয়া আমাদের স্বদেশ জননীকে সুসজ্জিত করিব;—শুভকার্য্যে—ঈশ্বর আমাদের সহায়;—এই আমাদের ভরসা।*

শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ
সম্পাদক, নোয়াখালী-সম্মিলনী,
কলিকাতা, ১৯১৪-১৫

পরিশিষ্ট (ক)

সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণী

প্রথম অধিবেশন।

তাং ১৬ই আগষ্ট, ১৯১৪ ইং।

নোয়াখালী জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার ৺ মৌলভি ফজরদ্দিন আহম্মদ, বি,এ মহোদয়ের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ এই সভা আহুত হয়, উক্ত সভায় যে অপর একটী প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা এই!—

* কলিকাতায় নোয়াখালী সম্মিলনীর দশম বার্ষিক অধিবেশনে রিপনকলেজ গৃহে সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

আগামী বর্ষ হইতে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে যে ১৪ জন সভ্য মনোনীত হইবে, তাঁহাদের মধ্যে ১২ জন সাধারণ সভা নির্ব্বাচন করিবেন ও অবশিষ্ট ২ জন সভ্য নির্ব্বাচিত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি মনোনীত করিবে।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

তাং ৩০শে আগষ্ট ১৯১৪ ইং।

উক্ত সভায় সম্মিলনীর কার্য্যের সুবিধার্থ, সম্মিলনীব কার্য্য চারিভাগে বিভক্ত করা উচিত বিবেচিত হয় ও চারিজন সহকারী সম্পাদকেব উপর উক্ত বিভাগ চতুষ্টয়ের ভার অর্পিত হয়।

যথা—(ক) সাধারণ বিভাগ।
(খ) সেবা ও ছাত্র-ভাণ্ডার।
(গ) সাহিত্য বিভাগ।
(ঘ) শিক্ষা বিভাগ।

উক্ত বিভাগ চতুষ্টয়ের কার্য্যে সম্পাদক ও সহকাবী সম্পাদকেব সহায়তার জন্য বিভাগীয় কমিটী গঠিত হয়।

তৃতীয় অধিবেশন।

৬ই ডিসেম্বব, ১৯১৪।

উক্ত সভাব সম্পাদককে সভাব রিপোর্ট, নিয়মাবলী ও কার্য্যবিবরণাদি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবাব অনুমতি দেওয়া হয় এবং পববর্ত্তী ববিবাব যান্মাসিক অধিবেশন আহ্বান কবিবাব অনুমতি দেওয়া হয়।

চতুর্থ ও ষান্মাসিক অধিবেশন।

১৩ই ডিসেম্বব, ১৯ ৪।

উক্ত সভায় নোয়াখালীব গৌবব শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচবণ তর্কচূড়ামণি মহোদয়কে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করিবাব জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুবোধ করিবাব প্রস্তাব গৃহীত হয়। সাহিত্যশাথার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্, সি "আমাদের নোয়াখালী" শীর্ষক এক সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রঙ্গীনচন্দ্র হালদার নানা প্রকার আবৃত্তি ও কৌতুক উদ্দীপক অভিনয় দ্বাবা সভাস্থ সকলকে পরিতুষ্ট করেন।

পঞ্চম অধিবেশন।

৩১শে জানুয়ারী, ১৯১৫।

উক্ত সভায় স্বর্গীয় নবাব অনাবেবল্ সার থাজা সলিমউল্লা বাহাদুর, জি, সি, আই, ই, কে, সি, এস, আই মহোদয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। শ্রীযুক্ত মৌলভি

নাদেরেজ্জমান সম্মিলনীর উপকারিতা সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরচিত একটী কবিতা আবৃত্তি করেন। উক্ত সভায় শিল্প ও প্রতিযোগিতার জন্য রচনাদি নির্দ্দিষ্ট করা হয়, সভাপতি শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা বি, এ, এম্, আর, এ, এস্, জমিদার মহোদয় রন্ধন ও পরিবেশন বিষয়ক রচনায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকে ২০৲ টাকা মূল্যের একটী পারিতোষিক প্রদান করিতে এবং সম্মিলনীর ছাত্র-ভাণ্ডারে ২০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন।

বিশেষ অধিবেশন।

৭ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার ১৯১৫।

সম্মিলনীর সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের প্রাসাদে সম্মিলনীর সভ্যগণ এক সান্ধ্য-সম্মিলনে উপস্থিত হন। উক্ত সম্মিলনে বিবিধ আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

বিশেষ অধিবেশন।

৫ই মার্চ্চ, ১৯১৫।

বঙ্গদেশীয় বিভিন্ন সম্মিলনীর প্রতিনিধিগণকে লইয়া এক প্রতিনিধি-সভা স্থাপন করিবার আয়োজন করা হয় ও সেই সভাতে আমাদের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়।

ষষ্ঠ-অধিবেশন।

১৪ই মার্চ্চ, ১৯১৫।

উক্ত সভায় ৺ গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে মহোদয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধি-সম্মিলনীর জন্য দুইজন প্রতিনিধি মনোনীত হয়।

সপ্তম অধিবেশন।

৪ঠা জুলাই, ১৯১৫।

দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার স্থাপনার্থে এই সভা আহূত হয়, এবং এক দুর্ভিক্ষ কমিটি মনোনীত হয়। উক্ত কার্য্যে সহায়তার জন্য এক সাব-কমিটি গঠিত হয়।

অষ্টম অধিবেশন।

৮ই আগষ্ট, ১৯১৫।

উক্ত সভায় দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের কার্য্য আরো কিয়দ্দিনের জন্য পরিচালিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় ও এক নূতন কমিটি গঠিত হয়। সম্মিলনী হইতে একখানি পত্রিকা পরিচালিত ও প্রকাশিত হইতে পারে কিনা ইতি-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থ এক ক্ষমতা প্রাপ্ত সাব-কমিটি মনোনীত হয়। নোয়াখালীর দুর্ভিক্ষ দমন কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মজুমদার মহাশয় দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে এককালীন ৫০৲ টাকা ও প্রতি মাসে ১০৲ টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার নিঃসহায় ভদ্রলোকদিগের সাহায্যার্থে যত্নপর হইবে স্থিরীকৃত হয়।

নবম অধিবেশন।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫।

বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী ও শিল্প-প্রদর্শনী সভা।

উক্ত সভায় বহু গণ্য-মান্য ও সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এম, এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ডাক্তার এন্, কে মজুমদার প্রদত্ত সুবর্ণ-পদক ও সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রে কৃতিত্বের জন্য ৺গোবীনাথ সর্ব্বভৌম পুরস্কার ছাত্রগণ মধ্যে প্রদত্ত হয়। শিল্প ও প্রবন্ধের জন্য যথাক্রমে ২৩টী ও ২০টী পুরস্কার মহিলাদিগের প্রতিনিধি মারফত বিতরিত হয়। এ বৎসরে সর্ব্বসমেত ২০১৮/৩ টাকার পারিতোষিক বিতরিত হয়। উক্ত সভায় শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত এন্, কে, মজুমদার মহোদয় গৃহস্থালীর জন্য একটী রৌপ্য পদক, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র সেন স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগে তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে একটী রৌপ্যপদক (সীতা মেডেল), শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ বসু Under graduate ছাত্রদিগের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য একটী রৌপ্য পদক, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগে একটী পুরস্কার, শ্রীযুক্ত বিকেশলোভন সেন কার্পেটের জুতার জন্য একটী পুরস্কার ও শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার মজুমদার জামা প্রস্তুতের জন্য এক পুরস্কার ঘোষণা করেন। শ্রীহট্টের অন্যতম নেতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম, বি মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট [খ]

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিবরণ।

প্রথম অধিবেশন।

১৪ই আগষ্ট, ১৯১৪।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে ভবিষ্যতে সাধারণ সভা হইতে দ্বাদশজন সভ্য প্রেরিত হইবে উক্ত নির্ব্বাচিত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আরো দুইজন সভ্য মনোনয়ন করিতে পারিবে, এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার কার্য্যের সুবিধা ও প্রসারার্থ কার্য্যাদি চারি ভাগে বিভক্ত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৪।

সম্মিলনীর কার্য্যাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত বলিয়া বিবেচিত হয়। উক্ত সভায় ষান্মাসিক অধিবেশনে প্রীতি-সম্মিলনীর বন্দোবস্ত করা অনুমোদিত হয়।

ভবিষ্যতে কার্য্যের সুবিধার জন্য সম্মিলনীর বিশিষ্ট সভ্যদিগকে পরিচালক ও বিশিষ্ট সভ্য এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

তৃতীয় অধিবেশন।

২৯শে ডিসেম্বর।

বিভাগীয় কমিটীর (Sub-Committeeর) প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়।

চতুর্থ অধিবেশন।

২৪শে জানুয়ারী, ১০১৫।

ছাত্র-ভাণ্ডার ও সেবা বিভাগে সাহায্য সংগ্রহের জন্য সভ্যদিগকে অনুরোধ করা হয়। স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি কল্পে এ বৎসরও পুরস্কারাদি ঘোষণা করা ঠিক হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। আমাদের দেশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকা-বিদ্যালয় ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের সাহায্যাভাবে বিলুপ্ত হইতেছে, উক্ত বিদ্যালয় সমূহকে ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থ সাহায্য ও উৎসাহদ্বাবা রক্ষা করিতে চেষ্টিত হওয়া এবং এই প্রকার বিদ্যালয় স্থাপনে যত্নপব হওয়া আমাদের সম্মিলনীর কর্ত্তব্য। সভার আর্থিক অবস্থার উন্নতির উপর এই কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

পঞ্চম অধিবেশন।

১০ই মার্চ্চ, ১৯১৫।

প্রতিনিধি সম্মিলনীতে (All Bengal Sammilani) দুইজন প্রতিনিধি প্রেরণ কবা স্থিরীকৃত হয়। সম্মিলনীর খাতা-পত্রাদি রাখিবার জন্য একটী বাক্স ক্রয় করিতে সম্পাদক অনুমতি প্রাপ্ত হন।

ষষ্ঠ অধিবেশন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯১৫।

আগামীবর্ষ হইতে স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগে নিয়মমত পরীক্ষা গ্রহণ করা স্থিরীকৃত হয়। উক্ত সভায় বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পুরস্কার প্রাপক ও প্রাপিকাগণের নির্ব্বাচন হয়। এই সভায় ঢাকাস্থ নোয়াখালী সম্মিলনীকে আমাদের শাখা-সম্মিলনীরূপে গ্রহণ করা হয়। শীঘ্রই বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারীর সহিত নোয়াখালী জেলার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ জ্ঞাপন ও তদ্বিষয়ক আলোচনার্থ এক ডেপুটেশন বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সপ্তম অধিবেশন।

৫ই সেপ্টেম্বর। ১৯১৫

আমাদের মফঃস্বলস্থিত বিশিষ্ট সভ্যগণের নির্দ্দেশানুসারে নোয়াখালীর দুর্ভিক্ষপীড়িত নিঃসহায় ভদ্রলোকদিগের অবস্থা বিবেচনা করতঃ অনধিক ৬০০৲ ছয় শত টাকা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভদ্রলোকদিগের জন্য ব্যয়িত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অষ্টম অধিবেশন।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ৯১৫।

এম, এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পুরস্কাব প্রাপক নির্ব্বাচিত হয় ও ইহা স্থিরীকৃত হয় যে ভবিষ্যতে বি, এ পবীক্ষায় সম্মানেব সহিত (With Honours) উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হইবে না। পারিতোষিকেব পুস্তক নির্ব্বাচনের জন্য এক বিভাগীয় কমিটী গঠিত হয়। শিল্প বিভাগে আব ১১ জন মহিলাকে পুবস্কার দেওয়ার জন্য সম্পাদককে অনুমতি দেওয়া হয়।

নবম অধিবেশন।

১লা অক্টোবব।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সম্পাদকেব নিকট হইতে সম্মিলনীব আয়-ব্যয়েব হিসাব গ্রহণ করেন।

পরিশিষ্ট [গ]

আয়-ব্যয় নির্ণয় পত্র

আয়েব তালিকা

১। শ্রীযুক্ত কুমাব অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুব	৬৫৲
„ বিমলাচবণ লাহা	৪০৲
ডাক্তার এন্, কে, মজুমদাব	৩০৲
শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুপ্ত	১০৲
„ অক্ষয়কুমার সেন	১২৸০
„ সুরেন্দ্রকুমাব চক্রবর্ত্তী	১৯৷৵৯
„ দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	১৪৲
„ সাবদাপ্রসন্ন দাস	৫৲
„ ভগীবথচন্দ্র দাস	৮৲
„ ত্রিবেণীকান্ত গুপ্ত	৫৲
„ সাবদাকুমার দত্ত	৫৲
„ উদয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৫৲
„ বসন্তকুমাব বসু	৫৲
„ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	৮৲
সম্মিলনীব সভ্যগণ হইতে সংগৃহীত	১১৩৸০
	৩৪৬৵৯

ব্যয়ের তালিকা।

বিভাগ	ডাক-খরচ	কাগজপত্রাদি	গাড়ি ভাড়া	সরঞ্জাম	ছাপা-খরচ	পারিতোষিক	প্রীতি-সম্মিলন	মোট
সাধারণ	৪৸৶৩	৪৸/৯	৪।৶০	৬/৯	৭।৵০		৩১।৵৬	৫৯৵৩
সাহিত্য শিক্ষা	৩/৯				৯৸০	২৩৲		৩৫৸/৯
স্ত্রী-শিক্ষা	৫।৬		৸৶০		৬॥০	১৭৮৸/৩		১৯১॥৯
পত্রিকা	২।৩		১।৩					৩॥৬
দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার	৫৵৩				৫৲			১০৵৩
ছাত্র-ভাণ্ডার						দরিদ্র ভাণ্ডার ৪৬৲		৪৬৲
	২০৸০	৪৸/৯	৬॥৵৩	৬/৯	২৮॥৵০	২৪৭৸/৩	৩১।৵৬	৩৪৬৶৬

মোট আয় . ৩৪৬৶৯ পাই

মোট ব্যয় ... ৩৪৬৶৬ ,,

উদ্বৃত্ত তহবিল ৩ পাই

এই হিসাব নির্ভুল হইয়াছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্রসন্ন কুমার চক্রবর্ত্তী।

(স্বাক্ষর) শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী।

পরিশিষ্ট [ঘ]

নোয়াখালী সম্মিলনীর

পুরস্কার তালিকা ১৯১৪-১৫ ইং

১। এম, এ, পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মজুমদার এম, এ,
দাতা—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মজুমদার

২। নোয়াখালীবাসী ছাত্রগণের মধ্যে যিনি কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন।
প্রাপক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (দেবপাড়া টোল)
দাতা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

(খ) রচনা বিভাগ (স্ত্রী-শিক্ষা)

১। দাতা শ্রীযুক্ত কুমাব অরুণ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর
প্রাপিকা—শ্রীমতী অমিয়বালা দত্ত,—সুবর্ণ পদক (মাইজদী)

২। দাতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রক্ষিত এম্, এ।
প্রাপিকা—শ্রীমতী বসন্তকুমারী রায় (করপাড়া)

৩। দাতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস (পোষ্টমাষ্টার) ছমি মুন্সীরহাট
প্রাপিকা—শ্রীমতী নগেনবালা দেবী,—(টাউন)

৪। দাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন চৌধুরী বি, এ (কুমিল্লা)
প্রাপিকা—শ্রীমতী মাহামুদা খানম্ (মাছিমপুর)

রন্ধন ও পরিবেশন।

১ম পুবস্কার দাতা শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা বি, এ, এম, আব, এ, এস. জমিদার।
প্রাপিকা —শ্রীমতী পঙ্কজিনী বায় (করপাডা)

১ম পুবস্কাব দাতা শ্রীযুক্ত বিমলাচবণ লাহা বি, এ, এম, আব, এ, এস, জমিদাব।
প্রাপিকা—শ্রীমতী সাবিত্রী বালা আইচ (টাউন)

দ্বিতীয় পুরস্কার

দাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্, সি।
প্রাপিকা—শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী, শ্রীফলতলা (খিলপাড়া)

তৃতীয় পুরস্কার

দাতা শ্রীযুক্ত মৌলবী গোলাম মুস্তাফা
পাপিকা—শ্রীমতী তাহেরা খাতুন (লক্ষ্মীপর)

বিশেষ পুরস্কার

দাতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম্ এ, এম, আর, এ, এস,
প্রাপিকা—শ্রীমতী গঙ্গাসুন্দরী সিংহ (লামচর)
(২) শ্রীমতী হরসুন্দরী মজুমদার (দালাল বাজার)

বিষয়ঃ—সামান্য সামান্য রোগ ও তাহার প্রতিকার।

১ম পুরস্কার

দাতা—শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুপ্ত কবিরত্ন
প্রাপিকা—শ্রীমতী সরোজিনী শূর (রৌপ্য পদক) (বরই তলা)

২য় পুরস্কার

দাতা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন কাঞ্জিলাল এম, এ, বি, এল।
প্রাপিকা—শ্রীমতী বসন্তকুমারী রায় (করপাড়া)

বিষয়ঃ—নোয়াখালি মেয়েলী ব্রতকথা।

১ম পুরস্কার

দাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস, সি।
প্রাপিকা—শ্রীমতী শৈলজা রায় (করপাড়া)

২য় পুরস্কার

দাতা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন
প্রাপিকা—শ্রীমতী কুসুমকামিনী আচার্য্য (জয়াগ)

বিষয় পতিভক্তি

১ম পুরস্কার

দাতা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন দাস এম, এ।
প্রাপিকা—শ্রীমতী অমিয়বালা দত্ত (মাইজদী)

২য় পুরস্কার

দাতা—সম্মিলনী প্রদত্ত
প্রাপিকা—শ্রীমতী সরোজ বালা রায় (করপাড়া)

৩য় পুরস্কার

দাতা—শ্রীযুক্ত মৌলবী নাদেরজ্জমা
প্রাপিকা—শ্রীমতী কুসুমলতা দেবী (টাউন)

বিশেষ পুরস্কার

দাতা—সম্মিলনী

প্রাপিকা—(১) শ্রীমতী কিরণবালা গুহ রায় (সন্দীপ)
(২) শ্রীমতী কুসুমকুমারী মজুমদার (ধলিয়া, ফেনী)

অবরোধ প্রথা

১ম পুরস্কার—শ্রীমতী বসন্তকুমারী রায় (করপাড়া)। পুরস্কার প্রাপিকা সম্মিলনীকে এই পারিতোষিকের মূল্য দান করিয়াছেন।

২য় পুরস্কার—শ্রীমতী সুরবালা রায় (দুর্গাপুর)

দাতা—সম্মিলনী।

শিল্প বিভাগ

১ম পুরস্কার

দাতা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভগীরথচন্দ্রদাস এম, এ, বি, এল।
প্রাপিকা—শ্রীমতী প্রিয়বালা চৌধুরাণী (জয়াগ)

দাতা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ, এম, আর, এ, এস।
প্রাপিকা—শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী কর (শুভপুর, ফেনী)

দাতা—শ্রীযুক্ত ত্রিবেণী কান্ত গুপ্ত, তেওতা, মাণিকগঞ্জ
প্রাপিকা—শ্রীমতী মৃণালিনী বসু, (বরইতলা)

দাতা—সম্মিলনী
প্রাপিকা—শ্রীমতী সুভদ্রা বালা দেবী (সহর)

দাতা—শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ মিত্র
প্রাপিকা—শ্রীমতী আশালতা দাস (হাতিয়া)।

দাতা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ, এম্, আর, এ, এস্।
প্রাপিকা—শ্রীমতী বসন্ত কুমারী রায় (করপাড়া)

দ্বিতীয় পুরস্কার (শিল্প)

(ক) দাতা—সম্মিলনী প্রদত্ত।
প্রাপিকা—শ্রীমতী পঙ্কজিনী রায় (করপাড়া)।

(খ) দাতা—শ্রীযুক্ত হেমকুমার বসু।
প্রাপিকা—শ্রীমতী ছালেমাখাতুন (টাউন)

(গ) দাতা—শ্রীযুক্ত রহুল আমিন চৌধুরী বি-এ।
প্রাপিকা—শ্রীমতী হেমলতা মিত্র (সিন্দুরপুর, রামগঞ্জ)

বিশেষ পুরস্কার (শিল্প)

(ঘ) দাতা—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম, এ।
প্রাপিকা—শ্রীমতী প্রিয়বালা সোম (ফেণী)

চিত্রে পুরস্কার।

(ঙ) দাতা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
প্রাপিকা—শ্রীমতী প্রীতিবালা আইচ (টাউন)

তৃতীয় পুরস্কার (শিল্প)

(ক) দাতা—শ্রীযুক্ত লালমোহন মুখার্জ্জি এম, এ।
প্রাপিকা—শ্রীমতী সরোজিনী দেবী (সোণাচাকা)

(খ) দাতা—সম্মিলনী।
প্রাপিকা—শ্রীমতী কিবণবালা গুহ বায় (সন্দ্বীপ)

(গ) ,, ,, সুববালা বায় (দুর্গাপুব)
(ঘ) ,, ,, কুসুমলতা বসু (কবইতলা)
(ঙ) ,, ,, আশালতা দেবী (টাউন)
(চ) ,, ,, প্রফুল্লময়ী শূব (বড়গাঁও)
(ছ) ,, ,, তাহেবা খাতুন (টাউন)
(জ) ,, ,, বিনোদিনী দেবী (শ্রীফলতলা)
(ঝ) ,, ,, খায়েবেন্নেছা (টাউন)
(ঞ) ,, ,, তাহেবা খাতুন (মাছিমপুব)
(ট) ,, ,, আশবফেবন্নেচ্ছা (খোঁডাবপাডা)

শ্রীমহেন্দ্রকুমাব ঘোষ,
সম্পাদক।

শ্রীগোলাম মোস্তাফা।
সহকাবী সম্পাদক, শিক্ষা বিভাগ,
নোয়াখালী সম্মিলনী, কলিকাতা।

নোয়াখালী সহর।

(প্রাচীন ইতিবৃত্ত)

ষোড়শ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জল দস্যুগণেব অত্যাচাবে নোয়াখালীর দক্ষিণ উপকুলের লোকগণ বড়ই প্রপীড়িত হইতেছিল। তাহাদের উপদ্রবে এই দেশীয়-দের ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না। সময় সময় দস্যুগণের অত্যাচাব এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত যে,

ইহারা এই জিলার লোকদিগকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইত। পর্ত্তুগিজ ও মগ এই জল দস্যুদিগের অগ্রণী ছিল। ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণে সময় সময় দ্বীপবাসী মুসলমানগণ ও এই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিত। এই জিলার অভ্যন্তরে ডাকাতিয়া, ভবানীগঞ্জের খাল, মহেন্দ্র খাল, নোয়াখালী খাল এবং ছোট ফেণী প্রবাহিত। এই সকল স্রোতস্বতীর সাহায্যে জল দস্যুগণ জিলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইত।

মোগল বাদসাহদিগের সময়ে ভুলুয়ায় (হুদাভুলুয়ায়) সৈন্যেব একটী থানা স্থাপিত হয়। এই সকল সৈন্যগণ মহেন্দ্র ও ডাকাতিয়া খাল প্রবিষ্ট জল-দস্যুদিগকে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইত বলিয়া বোধ হয়। দূরবর্ত্তী নোয়াখালী খালের ডাকাইতদিগকে দমন করা ইহাদের পক্ষে কষ্ট কর ছিল। এই খালের সাহায্যে দস্যুগণেব অত্যাচার বর্দ্ধিত হওয়ায় মোগল সম্রাট্ ১৬২০ খৃঃ অব্দে নোয়াখালী খালের মুখে, বর্ত্তমান নোয়াখালী সহরে, সৈন্যের একটী থানা স্থাপিত করেন। এই ঘটনা হইতে বর্ত্তমান নোয়াখালী সহরের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। থানা সংস্থাপিত হইবাব বহুপূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান নোয়াখালী সহরে লবণ প্রস্তুতের প্রধান কারখানা ছিল। নোয়াখালী, বাম্‌নী, হাতিয়া ও সন্দ্বীপে প্রতি বৎসর বহু সহস্র মণ লবণ প্রস্তুত হইত। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলে বিক্রীত লবণেব উপব শতকরা ৩৫৲ পয়ত্রিশ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করতঃ এক ইংরাজ কোম্পানীকে এই জিলাব লবণেব একচেটিয়া ব্যবসা প্রদান করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং লবণ ব্যবসায়ের ভাব গ্রহণ করেন ওয়াল্‌টার সাহেবের রিপোর্টে জানা যায় ১৭৮০ খৃঃ অব্দে এই জিলায় তিন লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইত; এবং বিশ হাজার লোক এই কারবারে নিযুক্ত ছিল। কালক্রমে নোয়াখালীতে গবর্ণমেণ্টেব একজন লবণের এজেণ্ট নিযুক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্লাউডেন সাহেব লবণেব এজেণ্ট হইয়া এই জেলায় আগমন কবেন। এই সময়ে এই অঞ্চলে প্রায়ই নবহত্যা, ডাকাতি সংগঠিত হইত। নিরী[redacted]গণের প্রতি অত্যাচারেব মাত্রা এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে প্লাউডেন সাহেব ইহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া অত্যাচাব কাহিনী বিবৃত কবতঃ গবর্ণমেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তৎকালে এই জিলাব অধিকাংশ ভাগ ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ছিল। যাতায়াতের অসুবিধা নিবন্ধন ত্রিপুরার ন্যায় দূরবর্ত্তী স্থান হইতে শাসন কার্য্য সুপরিচালিত হওয়া অসম্ভব বিবেচনায় তিনি এই জিলায় স্বতন্ত্র কালেক্টার নিয়োগের প্রস্তাব করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যুক্তি যুক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকেই নোয়াখালীর কালেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। তিনিই প্রথম নোয়াখালীব কালেক্টর। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে নোয়াখালীর কালেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। যদিও কালেক্টর নোয়াখালী সহরে অবস্থান করিতেন, তথাপি এই জিলা ভুলুয়া নামেই অভিহিত হইত। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ভুলুয়া জিলার পরিবর্ত্তে এই জিলা নোয়াখালী নামে অভিহিত হয়। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে এই জিলার এলেখার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে নোয়াখালীতে সেসন্ জজের নিয়োগ হয়। নোয়া-

খালী খালের পাড়ে অবস্থিত বলিয়া এই সহর নোয়খালী নামে অভিহিত হইয়াছে। নোয়াখালী সহরের সুপ্রসিদ্ধ মজুমদার বংশের খ্যাতনামা সুধারাম মজুমদারের নামানুসারে এই সহর সুধারাম নামে ও কথিত হইয়া থাকে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন।

মিঃ এল্, আলি বার-এট-ল মহোদয়ের অভ্যর্থনা উপলক্ষে—

স্বাগত

এতদিন পরে, আপনার ঘরে
এস সখা ফিরে এস গো।
দুঃখদৈন্য শত, কর পরাহত
লজ্জা ভীতি যত নাশগো।
শৈশবের সাথী প্রিয় পরিজন,
স্বদেশ নিবাসী পুলকিত মন,
মুছি অশ্রুজল, এসেছে সকল
সকলেরে ভাল বাসগো।
সদা স্নেহময়ী জননীর বুকে
তোমারি আসন আছে সুখে দুঃখে
সন্তানের সাজে, স্বদেশে সমাজে
সকলের মাঝে হাসগো।

৯ই জানুয়ারী, ১৯১৬।

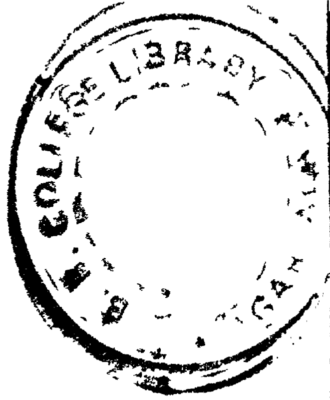
সম্ভাষণ

এস এস প্রিয় সখা আজি সুখ-সম্মিলন।
কণ্ঠে প্রীতি-পুষ্পমালা শিরে মায়ের আশীর্ব্বচন
উন্মীলিত করি নেত্র, দেখেছ নবীন চিত্র
ভবিষ্য কর্মক্ষেত্র পুণ্যধর্ম্মাধিকরণ।
দেশবাসী দুঃখী দিন, কত অন্ন-বস্ত্রহীন
চেয়ে আছে তোমাপানে সবে আনন্দিত মন।
নির্ভয়ে দাঁড়াও আসি, অজ্ঞান তিমির নাশি,
বিভুপদে কর সব কর্ম্মফল সমর্পণ।
মনে রেখো এ জীবন, নহে "নিশার স্বপন"
মনুষ্যত্ব পরসেবা মহা কর্ত্তব্য সাধন।
প্রাণহীন মৃতকল্প, দেশে নাই শিক্ষা শিল্প,
মনে রেখো মাতৃসমা জন্মভূমি আপন।

"নোয়াখালী সম্মিলনী," কলিকাতা,

সূচী।

Printed by T. C. DASS at the CHERRY PRESS LD. 251, Bowbazar Street.
Published by RAJKUMAR CHAKERVERTY, 96, Harrison Road,
CALCUTTA.



C P. Ld. Calcutta

নোয়াখালী।

১ম বর্ষ	বৈশাখ—১৩২৩	২য় সংখ্যা

মঙ্গল-চিন্তা।

আমাদের নিকট যাহা পরিহার্য্য, ঈশ্বরের নিকট তাহা প্রয়োজনীয়; আমরা যাহা প্রতিহত করিতে চেষ্টা করি, ঈশ্বর তাহা সংঘটন করিতে ইচ্ছা করেন; আমরা যথায় ভয় প্রাপ্ত হই, ঈশ্বর তথায় সকল সৌন্দর্য্য রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে দুই ভাব আছে;—সুখ, দুঃখ; সম্পদ, বিপদ; হাস্য, অশ্রু; কিন্তু ভগবান এই দুই ভাবের অতীত,—লীলাময়। ভক্তগণ সেই লীলাভূমিতে অবস্থান করিয়া ঘটনা সমূহ অবলোকন করিয়া থাকেন। মানুষ যখন পুরুষকার প্রভাবে প্রকৃতির গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না, তখনই তাহার অন্তঃকরণে মঙ্গল চিন্তার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়; তখন সে দাবানলের মধ্যেও পদ্ম-পত্রের শীতল আস্তরণ অনুসন্ধান করে; তখনই সে কণ্টকাগ্রে কুসুম কোমল স্পর্শের জন্য ব্যাকুল হয়।

পাঁচবৎসর পূর্ব্বে যখন সমুদ্র নোয়াখালী সহরকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তখন আমরা সকলেই আতঙ্কে অস্থির হইয়াছিলাম; নোয়াখালী নগরীর ধ্বংস অনতিদূরবর্ত্তী ভাবিয়া তাহার রক্ষার জন্য কত প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু পিতৃ-স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট রহিলেন; চিকিৎসক-স্বরূপ ইঞ্জীনিয়ারগণ কোন ভরসা দিলেন না। কত বাগান, কত বাড়ী, কত মাঠ, উদরস্থ করিয়া ক্রুদ্ধ দানবের মত এখনও সমুদ্র আমাদের শিয়রে গর্জ্জন করিতেছে, আর আমরা নিরুপায় হইয়া বসিয়া রহিয়াছি।

যে সকল কারণে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, নদী-স্রোতের অভিঘাত (the erosion of the river) তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই প্রকার পরিবর্ত্তনের ফলে ভূস্তরের পুরাতন মৃত্তিকা নিরন্তর নূতনভাবে পুনর্গঠিত হইতেছে। স্বর্ণকার যেমন পুরাতন ও মলিন আভরণ অগ্নির উত্তাপে বিগলিত করিয়া পুনরায় নূতন রকমের উজ্জ্বল ও সুদৃশ্য অলঙ্কার প্রস্তুত করে, তেমনি এই বিশাল প্রকৃতিরাজ্যে এমন সকল ব্যবস্থা রহিয়াছে যাহাতে পুরাতন, নিত্য নূতন ভাবে জন্মগ্রহণ করিতেছে। নোয়াখালী একদিন ধন-রত্নাদি সম্পদ-সম্ভারে অলঙ্কৃতা হইয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে লক্ষ্মীর মত উত্থিত হইয়াছিল; যে সকল শস্য-প্রান্তর, ফলোদ্যান

অথবা আবাসভূমি আজ অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা আবার সহস্রগুণ উর্ব্বরতা-শক্তি সমন্বিত হইয়া উত্থিত হইবে। তখন আমরা মহাকবি কালিদাসের কথা স্মরণ করিয়া বলিব, "সহস্রগুণ মুৎস্রষ্টু মাদত্তে হি পয়োনিধিঃ"। অমঙ্গলের মধ্যে এই মঙ্গল-চিন্তা আমাদের ভবিষ্যতের আশাকে পরিপুষ্ট করুক, আমাদের চেষ্টাহীন চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করুক, আমাদের ব্যাকুল হৃদয়ের শান্তিবিধান করুক।

রেলের রাস্তার উপকার।

ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য সম্প্রতি বিশেষরূপে আলোচনা হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার বেণ্ট্‌লি কয়েকদিন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট্ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তার বেণ্ট্‌লি বলেন, খুব বড় বিল বা জলা জায়গা হইলেই যে ম্যালেরিয়া হইবে, এমন কোন কথা নাই। বরঞ্চ যে সকল দেশে প্রচুর জল আছে, সে সকল দেশে ম্যালেরিয়াব প্রকোপ নাই। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, যে সকল দেশে ম্যালেরিয়া আছে, সেই সকল দেশে জলের অভাবও বেশী। যাতায়াতের সুবিধার জন্য উচ্চ রাস্তা ও রেল পথের বিস্তার হওয়ায় নদী ও খালের স্রোতঃ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নদীগুলি ক্রমশঃই ভরাট হইয়া যাইতেছে। ইহাই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও প্রচুর জল আছে। পদ্মা ও মেঘনার তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ বর্ষাকালে বেশ জলে ধুইয়া যায়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জেলা সমূহেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অধিক। বঙ্গদেশের মানচিত্র খুলিয়া দেখিলেই সকলে একথা বুঝিতে পারিবেন। ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীর দিয়া যেমন ইষ্টারণবেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ে চলিয়া গিয়াছে, তেমন পশ্চিম তীর দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল লাইন রহিয়াছে। হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাতে মাকড়সার জালেব মত রেল লাইন পাতা বহিয়াছে। যশোহর, নদীয়া ও মুরশিদাবাদ জেলায় ইষ্টারণ বেঙ্গল বেলের অসংখ্য শাখা প্রশাখা। রূপনারায়ণ, অজয়, দামোদর প্রভৃতি ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের উপনদীগুলি যেমন দিন দিন শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, তেমনি পূর্ব্ব তীরের মাথাভাঙ্গা, জলাঙ্গী, মধুমতী, গড়াই, ইচ্ছামতী প্রভৃতি শাখা নদীগুলিও ভরাট্ হইয়া উঠিতেছে। পাংসা হইতে গোয়ালন্দ ও ফরিদপুর পর্য্যন্ত রেল লাইন থাকাতে পদ্মার দক্ষিণ-তীর একেবারে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে; তাহার ফলে ফরিদপুর, রাজবাড়ীতে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য, অথচ পদ্মার অপর পারে ও বিক্রমপুর পরগণায় ম্যালেরিয়া নাই। বিক্রমপুরে যদিও শীতকালের শেষভাগ হইতে বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জল কষ্ট থাকে, কিন্তু তাহাতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটেনা, কারণ বর্ষাকালে যে প্রচুর জলে স্থলভাগ ধুইয়া যায়, তাহাতেই অনেক উপকার হয়। রাজসাহী বিভাগটীকে ত একেবারে রেল লাইনের ক্রুশে বিঁধিয়া রাখা হইয়াছে। উত্তর হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে

পশ্চিম পর্য্যন্ত দুইটী রেল লাইন রাজসাহী বিভাগের মধ্যস্থলে আড়াআড়ি ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। রাজসাহীর পূর্ব্ব সীমানায় ব্রহ্মপুত্র ও দক্ষিণ সীমানায় গঙ্গা থাকিলেও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে নাই। ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর পশ্চিম সীমায় মেঘনা। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ত্রিপুরার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া বিস্তৃত আছে সুতরাং তাহাতে মেঘনার স্রোতঃ আটকাইতে পারে নাই। এই দুই জেলাতে সর্ব্বদা প্রচুর জল থাকে। বিশেষতঃ ত্রিপুরা জেলায় বৃষ্টিপাতও বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। ত্রিপুরা ও নোয়াখালীতে ম্যালেরিয়া নাই।

ভারতবর্ষে যেরূপ ধরণের রেল ইঞ্জিন ও গাড়ীর চলাচল, তাহাতে রেলের রাস্তাকে খুব মজবুত করা দরকার। সুতরাং রাস্তাকে খুব উচ্চ করিতে হয়। রাস্তায় পুলের (ব্রিজ্) সংখ্যা যত কম হয়, ততই রাস্তা শক্ত হয়। পুলের সংখ্যা কমাইয়া দিলে মাঠের জল চলাচলের অসুবিধা হয়। আবার নদীর উপরে পুল তৈয়ারী করিলে নদীর স্রোতোবেগ কমিয়া যায়, সুতরাং শীঘ্রই নদীসমূহ ভরাট্ হইয়া আসে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের অসংখ্য শাখা প্রশাখার বিস্তারহেতু পশ্চিম বঙ্গস্থিত গঙ্গার উপনদীসমূহের স্রোতঃ মন্দীভূত হইয়াছে, তার ফলে এখন গঙ্গাতে কেবল চরভূমির সৃষ্টি হইতেছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বিদ্যাধরী নদীত একেবারে বুজিয়া যাইবার গতিক হইয়াছে, অথচ এই বিদ্যাধরী নদীই কলিকাতার সমস্ত আবর্জ্জনা বহন করিয়া নেয়। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কলিকাতা করপোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার ও মাতব্বরগণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই যে দার্জ্জিলিং লাইনে পদ্মার উপরে "সারা ব্রিজ" তৈয়ারী হইয়া গেল, ইঞ্জিনিয়ারগণ খুব বাহাদুরী নিলেন, কোটী কোটী অর্থব্যয় করিয়া বিজ্ঞানের কৌশল প্রকৃতির শক্তিকে পরাজিত করিল, তাহার ফলে কি হইবে? ফলে হইবে, শিয়ালে কুকুরে হাঁটিয়া পদ্মা পার হইবে। বারাকপুর, ঘুসুড়ি প্রভৃতি স্থানের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে। বাংলার সকল নদীই একরকম মরিয়াছে, বাকী ছিল পদ্মা; এবারে পদ্মাকে মারিবার আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। যাহা হউক আমরা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নহি, ইঞ্জীনিয়ারও নহি, আমাদের মুখে এসকল কথা এখন শোভা পায় না। তবে ডাক্তার বেণ্ট্‌লি যাহা বলিয়াছেন, অনেক মূর্খ বাঙ্গালী বহু বৎসর পূর্ব্বে এইসকল কথা বলিয়াছিল। কিন্তু তখন রেলের রাস্তার উপকারে আমরা এতদূর মোহিত হইয়াছিলাম যে ইংরাজ রাজত্বের সুফলের কথা উল্লেখ করিতে আমরা সর্ব্বপ্রথমই রেল রাস্তার কথা বলিতাম। স্কুলের ছাত্রেরা এই কথা মুখস্থ করিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় রেলের রাস্তার গুণকীর্ত্তন যত আছে, পুরাণে বোধ হয় ব্রহ্মা-বিষ্ণুর স্তব স্তুতিও এত নাই। কিন্তু বেণ্ট্‌লি সাহেবের কথাগুলি কি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিবে? তিনি আরও বলেন যে রেল রাস্তা তৈয়ারী করিবার জন্য রাস্তার দুইধারে যে বড় বড় গর্ত্ত খনন করা হয়, তাহাতেই ম্যালেরিয়ার মশার বেশী জন্ম হয়। এইসকল গর্ত্ত ভরাট্ করিয়া দিবার কোন বন্দোবস্ত রেল কোম্পানী করেনা। অবশ্য লাইট্ রেলওয়ে লাইন খুলিলে রাস্তাতে

অনেক পরিমাণে পুল দেওয়া যায়, কিন্তু ভারতবর্ষে অধিকাংশ রেল লাইন রাজনৈতিক হিসাবে এত দরকারী যে সেগুলিকে লাইট রেলওয়ে করা যায় না। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ও নর্থ ওয়েষ্ট রেলওয়ে ভারতসীমান্তে অবস্থিত; সুতরাং তাহা মিলিটারী লাইন বলিয়া গণ্য। এখন মিলিটারী লাইনগুলিত আর যেমন-তেমন হইলে চলে না। ভবিষ্যতের নানাবিষয় বিবেচনা করিয়া সেগুলিকে খুব দৃঢ় করিতে হয়। তদ্রূপ কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল অথবা বোম্বাই ও মাদ্রাজ সংশ্লিষ্ট প্রধান রেল লাইনগুলিকেও (জি, আই, পি ও বি, এন্ আর প্রভৃতি) লাইট রেলওয়ের মত করা যায় না। আবার বঙ্গদেশে নদীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী; আর নদীগুলিও ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সুতরাং নদীর উপর পুল তৈয়ারী না করিয়া রেল পথ বিস্তার করা অসম্ভব। এইসকল কারণে গঙ্গার স্রোতোবেগ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে, কলিতে কত হাজার বৎসর পর্য্যন্ত নাকি গঙ্গার মহিমা থাকিবে; এইসকল ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় শাস্ত্রের কথা সত্য। গঙ্গার মহিমার মেয়াদ বুঝি ফুরাইয়া আসিয়াছে।

দেশের উন্নতির লক্ষণ।

ভারতবর্ষে ৩৪০০০ মাইল রেল-পথ আছে। প্রতিবৎসর গড়ে ১০০০ মাইল নূতন রেল-পথ প্রস্তুত হইতেছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রফল ১৮,০০,০০০ বর্গমাইল। সুতরাং প্রতি ৫৩ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে ১ মাইল রেল-পথ বিস্তৃত আছে। নোয়াখালীর ক্ষেত্রফল ১৯০১ সালের গণনা অনুসারে ১৬৮৪ বর্গমাইল। আসাম বেঙ্গল রেলের যে অংশ ফেণী হইয়া চট্টগ্রাম যাইবার সময় নোয়াখালীর ভিতর পড়িয়াছে, তাহা ১৫ মাইল ও লাকসাম হইতে নোয়াখালী সহর পর্য্যন্ত লাইনকে ৩৫ মাইল ধরিলে দেখা যায় নোয়াখালী জেলায় ৫০ মাইল রেলের রাস্তা রহিয়াছে। নোয়াখালীতে প্রতি ৩৩ বর্গমাইল পরিমিত ভূমিখণ্ডে ১ মাইল রেলপথ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় নোয়াখালীতে রেলের রাস্তার পরিমাণ অনেক বেশী। এই দুইটী রেল লাইন্ নোয়াখালীকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। লাকসাম হইতে নোয়াখালী পর্য্যন্ত যে রেলের রাস্তা গিয়াছে তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বস্থিত স্থানসমূহ মেঘনার জলধারা হইতে বঞ্চিত হইল। নোয়াখালী সহর হইতে একটা রেলের রাস্তা লক্ষ্মীপুর রায়পুর হইয়া চাঁদপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক, এরূপ কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়া থাকেন। তাহা হইলে সমগ্র নোয়াখালী জেলা মেঘনার জল সংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইবে। আর ডাক্তার বেণ্ট্লির কথা অনুসারে ভীষণ ম্যালেরিয়ার গ্রাসে নিপতিত হইবে। কেবলমাত্র যাতায়াতের সুবিধার দিকে নজর রাখিয়া দেশের উন্নতিসাধনে কেহ মনোযোগী হইবেন না। আজকাল যাঁহারা দেশের উন্নতি বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই প্রথমতঃ রাস্তা নির্ম্মাণে ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনে আপনাদের শক্তি প্রয়োগ করেন। দেশে ভাল রাস্তা থাকিলে চলা-ফেরার সুবিধা হয় বটে,

কিন্তু আর একদিকে যে জল চলাচল বন্ধ হইয়া ম্যালেরিয়া ব্যাধির সৃষ্টি করিতে পারে, সেই আশঙ্কাও অমূলক নহে। সুতরাং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অথবা লোকেল বোর্ডের রাস্তা নির্ম্মাণেও সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। একটা সুবিধাব কথা এই যে নোয়াখালীতে খুব উচ্চ রাস্তা টিকে না; নোয়াখালীর মাটীই এমন যে রাস্তা পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই খুব নীচু হইয়া পড়ে। এমন কি বর্ষাকালে অনেক রাস্তার উপর দিয়াই জলস্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে যাতায়াতের অসুবিধা হইলেও, আমরা দুরন্ত ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া নিরাপদে আছি। নোয়াখালীতে রেলের রাস্তা যতদূর হইয়াছে, তাহাই অনেক বেশী; তার উপর আবার নূতন লাইন খুলিবার প্রস্তাব আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে, সন্দেহ নাই। নোয়াখালীতে যে সকল খাল আছে, তাহা বৎসরের অধিকাংশ সময়ই জলে পূর্ণ থাকে, সুতরাং নৌকাযোগে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের যে সুবিধা আমাদের রহিয়াছে তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। নির্ম্মল আকাশে ইঞ্জিনের চিম্‌নি হইতে যে কাল কাল ধোঁয়ার বল্‌কা উঠে, তাহাকেই যেন আমরা উন্নতির ধ্বজা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হই।

কৃষিবিদ্যালয়।

চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমাদেব গবর্ণমেণ্টের কথায় ময়লা নাই; কৃষি বিভাগের কর্ত্তা এবার পুষার সভায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া এইরূপ মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিরূপে সাধারণ কৃষক শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা যাইতে পারে;--পুষার কৃষি-বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র আব্‌গারীর ডিপুটী অথবা ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারী তৈয়ারী না করিয়া কিরূপে প্রকৃত কৃষকের সৃষ্টি করা যাইতে পারে,—মাতৃভাষার সাহায্যে কিরূপে কৃষকগণকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে;—পণ্ডিতগণের বিদ্যাবুদ্ধি কেবল মাত্র পুষার কৃষিক্ষেত্রে আবদ্ধ না রাখিয়া কিরূপে সমস্ত দেশেব মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে, ইত্যাদি বিষয়ের আলাচনায় গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন। কৃষি সভায় যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত, আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে ও যে সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা হইয়াছে, আমরা সে সকল বিষয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। রাজা যে আমাদের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা ত আজ নূতন নহে,—আর আমবাও যে আশান্বিত হইয়া আছি, তাহাও পুবাতন কথা। এই দেশে কৃষিবিদ্যা প্রচারেব জন্য রাজা যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা কেবল মাত্র বিদ্যালয়ের বিষয়ীভূক্ত (academical) না হইয়া যাহাতে ব্যবহারিক (practical) হয়, যাহাতে সেই শিক্ষা কেবল জ্ঞান-পন্থানুগত (scholastic) না হইয়া অন্ন-সংস্থান মূলক হয়, সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টিত হইতেছেন। বক্তৃতা থাকুক, আমরা কার্য্য চাই! নোয়াখালী জেলায় ধান্য ফসলের যে একটা উফ্‌রা ব্যাধি আছে, তাহার কোন নিশ্চিত প্রতিকারের উপায় এই পর্য্যন্ত পুষা-বিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ বাহির করিতে পারেন নাই;—আমাদিগের দেশে আমের পোকা নিবারণেব কোন ঔষধ পুষার লেবরেটরীতে তৈয়ার

হয় নাই। যে সকল উপায় তাঁহারা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা "দুই খানা কাঠের মধ্যে চাপা দিয়া ছারপোকা মারার" মত। যাহা হউক পুষ্প যে মনোহর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা যে বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় ও শীতলতা অনুসন্ধানে ব্যস্ত রহিয়াছি, আমরা তাহার সুমিষ্ট ফলের প্রত্যাশা করি। ফুলের পাপ্‌ড়ী ঝরিয়া যাক্‌, ক্ষতি নাই।

নারিকেল।

নারিকেলের ভিতরের শাঁস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া তার পর বিদেশে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। এই খণ্ডিত ও শুষ্ক শাঁসকে ব্যবসায়িগণ কপ্‌রা বলিয়া থাকেন। ইহাতে শতকরা ৩০ ভাগ হইতে ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত তৈল থাকে। সম্প্রতি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন, যে এই কপরা অতঃপর কেহ শত্রুর দেশে প্রেরণ করিতে পারিবে না। জারমানিতেই অধিকাংশ কপ্‌রা রপ্তানী হইত। জারমানির মত প্রবল শত্রুকে কপ্‌রা হইতে বঞ্চিত করিবার কারণ কি? কপ্‌রা হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা গো শূকরাদি গৃহপালিত পশুর পক্ষে উত্তম খাদ্য। আমাদের দেশে যেমন সরিষার খলি ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ। তার পর সেই তৈল হইতে প্রচুর পরিমাণে মাখন ও গ্লিসিরিণ প্রস্তুত হয়। এই নারিকেলের মাখন সৈন্যগণের খাদ্য স্বরূপ প্রচলিত। গ্লিসিরিণ হইতে বোমা তৈয়ারী করিবার উপযুক্ত বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত হয়। সুতরাং জারমানি এই কপ্‌রা হইতে অনেক উপকার পাইতেছিল। জারমানির রাজস্ব-সচিব বলিয়াছেন যে জারমানিতে নাকি দুইকোটী শূকর আছে। এই শূকরের মাংসে সৈন্যগণের দীর্ঘকাল খাদ্যের বন্দোবস্ত হইতে পারে। যদি জারমানিতে আমরা কপ্‌রা চালান করি, তবে তাহা খাদ্য-স্বরূপ শূকরের পেটে, মাখন-স্বরূপ মানুষের পেটে, আর বোমা স্বরূপ কামানের পেটে প্রবেশ করিবে। সুতরাং জারমানিতে কপ্‌রা পাঠাইলে শত্রুকে খুব সাহায্য করা হইল। এই কারণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট জারমানি অস্ট্রিয়া প্রভৃতি শত্রুর দেশে কপ্‌রা না পাঠাইবার হুকুম করিয়াছেন। জারমানিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কপ্‌রা ক্রয় করিত। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কপ্‌রার মূল্য প্রতিমণ চারি টাকা ছিল। এখন প্রতি মণের মূল্য প্রায় বিশ টাকা হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্তর্গত লঙ্কাদ্বীপ, আন্দামান, মাদ্রাজ ও বোম্বাই হইতে কপ্‌রা বিদেশে রপ্তানী হয়। জারমান দেশীয় পণ্ডিত ডাক্তার শ্লিঙ্ক সর্ব্ব প্রথমে নারিকেলের তৈল হইতে মাখন প্রস্তুত করেন। এই মাখন দুগ্ধের মাখন অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে ভাল; সেইজন্য সৈন্যদলে ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তার পর আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থানে নারিকেলের মাখন তৈয়ারি করিবার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পঁদিচেরিতে মেসার্স গডার্ট এণ্ড কোম্পানীর এইরূপ একটা কারখানা আছে বলিয়া জানি। যাহা হউক আমাদের নোয়াখালীর কৃষক যখন বাজারে যাইয়া দশটী নারিকেল বিক্রয় করে, তখন সে জানে না, যে এই নারিকেল

রূপান্তরিত হইয়া ইউরোপের যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইতেছে। সে গরমের সময় একটু ডাবের জল আর কচি শাঁস খায়; উৎসবে আনন্দে, পূজায় পার্ব্বণে নারিকেলের লাড়ু তৈয়ারী করে, গাছের পাতা ও গুঁড়ি দিয়া ঘর বাঁধে, শুক্‌না ছোব্‌ড়া জ্বালাইয়া ফেলে। নারিকেলের আর কোন খবর সে রাখে না। আমরা সাধারণতঃ যে সাবান ব্যবহার করি, তাহা সমুদ্রের জলে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু নারিকেলের তৈল হইতে যে সাবান প্রস্তুত হয়, তাহা সমুদ্রের জলের সহিত ব্যবহার করা চলে, সুতরাং নাবিকগণের তাহা বিশেষ প্রয়োজন। তারপর খারাপ নারিকেল তৈল হইতে মোমবাতির রকম বাতি প্রস্তুত হয়। এই সকল সংবাদ জানিলে নোয়াখালীর কৃষকগণ নারিকেল চাষে আরও মনোযোগী হইত। নোয়াখালীর ভূমি স্বভাবতঃ নারিকেলের উপযোগী। আমরা প্রকৃতির এই অনুগ্রহ, ভগবানের এই দান হেলায় পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতেছি। মাদ্রাজে ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ যত্নের সহিত নারিকেলের চাষ করিতেছেন। আসামে যেমন তাঁহারা অনেক জমি বন্দোবস্ত লইয়া চা বাগান খুলিয়াছেন, তেমনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে তাঁহারা নারিকেলের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে নারিকেল তৈলের কারখানা নাই, তাহার কারণ প্রচুর নারিকেল ফলের অভাব। যদি সুন্দর বনে, বরিশালে ও নোয়াখালীতে রীতিমত নারিকেলের চাষ করা যায়, তবে বোধ হয় এই অভাব দূর হইবে। ভারতের মধ্যে কোচিনের তৈলই বিখ্যাত। যদি কেহ নারিকেল চাষ-সম্বন্ধে অথবা তৈলের কারখানা সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি অনায়াসে কোচিনে যাইয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আসিতে পারেন। কোচিনের রাজধানী আর্ণাকুলম মাদ্রাজ রেলওয়ের সোরাণপুর ষ্টেসনের সহিত রেলপথে যুক্ত আছে। সুতরাং যাওয়াও বিশেষ কষ্টজনক নহে।*

ফিরে এস।

এসে কতবার দুয়ারে আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেছ চলি!
বাসনার বশে কখনো স্মরিনি তব নাম অবহেলি!
দৈন্য কঠোর ছিন্ন ক'রেছে মায়ার বাঁধন ডোর;
চিত্ত বেদনা ক্ষিপ্ত আজিকে ঝরিছে নয়ন লোর!
একবার, ওগো, শুধু একবার, ফিরে এস, নাথ, আজ!
খুলিয়া রেখেছি সকল দুয়ার এস ওগো হৃদিরাজ!

শ্রীচারুপ্রভা বসু।

---

* শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস সি মহাশয় ১৩১৬ সালের "সুপ্রভাতে" নারিকেল চাষ ও তাহার ব্যবহার শীর্ষক কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক জানিবার বিষয় আছে। নোয়াখালীর নারিকেল চাষ সম্বন্ধে আমরা আরও বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

শিক্ষা ও সাহিত্য।

শিক্ষালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে, প্রথমতঃ শিক্ষা কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্দেশ্য কি,তাহা বুঝিতে হইবে? শিক্ষাব উদ্দেশ্য নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী ক্ষমতা লাভকরা, তাহা সমস্ত প্রাণীরই আছে। শিক্ষাদ্বারা প্রত্যেক জীবই স্বকীয় অধিকারানুযারী কার্য্যে অধিকতর পটুতালাভ করিতে পারে। যাহা দ্বারা মানবত্বের ক্রমবিকাশ হয়, তাহাই মানবের শিক্ষা এবং মানবের শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব লাভ। শিক্ষা সর্ব্ববিধ উন্নতির একমাত্র উপায়। শিক্ষার সুবিমল রশ্মিসম্পাত হইলেই, মানবের হৃদয়-কমল-কলিকা অপূর্ব্ব সৌরভ শোভা বিকীর্ণ করিয়া সম্যক বিকশিত হইতে পারে।

স্মরণাতীত কাল হইতে বিভিন্নদেশের প্রতিভাবান মনীষিগণ, সংসার সমুদ্র মন্থন করিয়া যে জ্ঞান-সুধারাশি সঞ্চয় কবিয়া রাখিয়া যাইতেছেন, একমাত্র শিক্ষাদ্বারাই আমরা তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছি। জগতে একের জ্ঞান, অন্যে আহরণ করে; যদি এইরূপ শিক্ষা রীতি প্রচলিত না হইত, তবে বোধহয় এখন পর্য্যন্ত আমবা, আদিম পশুবৎ অসভ্যাবস্থাতেই অবস্থিত থাকিতাম। শিক্ষা যে জগতের কি উপকার করে, তাহা আমাদের আদিম অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলেই সম্যকৃরূপে বুঝিতে পারা যায়।

কেবল পুস্তকগত কাব্যাদি শাস্ত্রশিক্ষাই শিক্ষা নহে বা বর্ত্তমান কেবল স্কুল কলেজের শিক্ষাও প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য নহে। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রকার ভেদ অসংখ্য। তন্মধ্যে প্রধানতঃ শাস্ত্রশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষাই উল্লেখ যোগ্য। সমাজবদ্ধ মানবগণের পক্ষে এই সমুদয় শিক্ষাই অত্যাবশ্যকীয়। শাস্ত্রশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করা, শিল্পশিক্ষার প্রয়োজন, সংসার বাসের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও বিলাস বাসনার পরিপূরণ। বাণিজ্য শিক্ষার প্রয়োজন পরকীয় ও স্বকীয় শিল্পোৎপন্ন পণ্যের আদান প্রদান দ্বারা জীবনের অভাব-দূরীকরণ ব্যাপদেশে স্বদেশের ধনবৃদ্ধি। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন, সর্ব্ববিষয়ক ক্রমোন্নতি সাধন ও নবাবিষ্কার। ইহার মধ্যে যে কোন বিষয়ক শিক্ষার অভাবেই মানব-সমাজ অচল হইয়া পড়ে, সুতরাং এই সমুদয় শিক্ষা সকলের পক্ষেই অবশ্য গ্রহণীয়।

এই মহীয়সী শিক্ষা, আমাদের দেশে, আমাদের হৃদয়ে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিতেছে, প্রণিধান করিয়া দেখিলে চক্ষুঃস্থির হইয়া যায়। প্রথমতঃ বর্ণ-পরিচয়কেই যদি শিক্ষা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে, দেখিতে পাই—তদ্রূপ শিক্ষিতের সংখ্যা আমাদের দেশে এক আনা মাত্র। আর পনর আনা অধিবাসীই অক্ষর-মাত্র-জ্ঞানেও বঞ্চিত। এই পনর আনা লোক দীর্ঘ কাল যাবৎ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া, দেশের ঘোর দুর্ভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে যুগে মৃত্তিকাও সোণায় পরিণত হইতেছে, যে বিংশ শতাব্দী, উন্নতির ধারা প্রবাহে বিশ্বপ্লাবিত করিতেছে, সেই সুবর্ণ-যুগে, সেই বিংশ শতাব্দীতেও

যেদেশের এত অসংখ্য লোক, অবনতির তিমির গর্ত্তে নিপতিত থাকে, সেদেশের দুর্ভাগ্যের পরিমাণ কতটুকু, চিন্তা মাত্রই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর আজকাল আমরা যে শিক্ষার অহঙ্কারে ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছি, "শিক্ষিত শিক্ষিত" বলিয়া যাহাদের নামে করতালি দিতেছি, তাহার অধিকাংশই যে কুশিক্ষিত বা কলেজের নব শিক্ষিত তাহাতে কি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আছে? বর্ত্তমান কালের শিক্ষাপ্রণালী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এই শিক্ষাপ্রণালী আমাদিগকে এক অন্তঃসার শূন্য পদার্থে পরিণত করিয়া বিলাসিতা ও দাসত্ব শিক্ষা দিতেছে। এ শিক্ষায় চিত্তের বিকাশ হয় না, সৎসাহস বৃদ্ধি পায় না, ধর্ম্মে মতি হয় না। যদি দেশে প্রকৃত শিক্ষা-বিস্তার থাকিত তবে কি দিন দিনই জীবন যাত্রা জীবন সংগ্রামে পরিণত হইত? যদি প্রকৃতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইত, তবে কি দিন দিনই লোকে নাস্তিক সাজিয়া ধর্ম্মের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া খাইত? যদি বাস্তবিকই সুশিক্ষার প্রচলন হইত, তবে কি দেশে জাল, জুয়াচুরি, ডাকাতি প্রভৃতি দিন দিনই এত বৃদ্ধি পাইত? দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে কি আমরা বুঝিতে পারি যে সত্য সত্যই দেশবাসীর জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আজকাল শিক্ষা বলিয়া লোকে যাহা গ্রহণ করিতেছে, তাহা কেবল কতকগুলি পুস্তকের পংক্তি মুখস্থ দ্বারা পাশের নিশান লওয়া মাত্র। কি ভাবে আমাদের শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা উচিত? বরোদা রাজ্যে যেরূপ অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, আমাদের দেশেও প্রথমতঃ সেইরূপ শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন দ্বারা নিম্নশিক্ষা দান করতঃ প্রকৃত জ্ঞানলাভের পন্থা সুগম করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। মহামনীষী দেশ সেবক স্বর্গগত গোখ্‌লে মহোদয়, এইজন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যে দেশের পনর আনা লোক অশিক্ষিত সে দেশে প্রথমতঃ নিম্নশিক্ষার যে এইরূপ বন্দোবস্তই অত্যাবশ্যকীয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে মতদ্বৈধ হইতেই পারে না।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া নীতি, ধর্ম্ম ও স্বাবলম্বন সম্বলিত প্রকৃত সুশিক্ষার প্রবর্ত্তন ভিন্ন আমাদের মঙ্গল নাই। কিন্তু সেরূপ পরিবর্ত্তন কি সম্ভব পর? প্রায়শঃ দেশবাসী অন্ধ, দেশবাসী পঙ্গু, দেশবাসী কিছুই করিতে পারে না, কেবল পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে; সুতরাং আত্ম-নির্ভর-হীনতার সমুচিত ফলই লাভ হইতেছে।

যদি আমাদের শিক্ষার ভার কতকাংশেও নিজেদের হাতে না লওয়া যায়, তবে আর কিছুতেই আমাদের মঙ্গল নাই। "হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়" কবে আবির্ভাব লাভ করিবে, সেই আশায় বহুদিন বসিয়া আছি, তদ্দ্বারা যে দেশের সুশিক্ষার পথ, অনেক উন্মুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মই জাতীয় জীবনের মূল। ধর্ম্ম বিহীন হওয়াতেই যে আমাদের নানাবিধ অবনতি হইয়াছে এবং ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলেই যে আমাদের পুনরুন্নতি ও মঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র স্কুল কলেজে সে শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই বলিয়াই যে আমরা

ধর্ম্মের ধ্বজাতল হইতে ক্রমশঃই অধিক দূরে সরিয়া পড়িতেছি, তাহা বোধ হয় সর্ব্ববাদি সম্মত। কিন্তু ধর্ম্ম, নীতি, প্রভৃতি শিক্ষার যে আরও ক্ষেত্র ও উপায় আছে, তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখিনা। রামায়ণ মহাভারতের পঠন-পাঠন আজ কাল একরূপ উঠিয়া যাইতেছে, পূর্ব্বকালে যাহারা একটু লেখাপড়া জানিত তাহারাও এই দুই মহাগ্রন্থ পড়িতে ছাড়িত না, আর যাহারা ইহাও না পারিত তাহারা অন্যের মুখে শুনিয়া অনেক শিক্ষালাভ করিত। ইহা অপেক্ষাও নীতি ও ধর্ম্ম প্রচারের উৎকৃষ্ট উপায় ছিল—কথকতা। পূর্ব্বে কথকতার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তাহাতে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষালাভের এত অবসর পাইত যে, তাহার তুলনা নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাতে লোকের আগ্রহ অত্যন্ত হ্রাস হওয়াতে এই মঙ্গলময় প্রথা তিরোহিত-প্রায় হইয়াছে। পুনরায় যদি আমরা এই কথকতার প্রচলন করিতে পারি, তবে তদ্দ্বারা অল্প সময়ে দেশের মধ্যেই সমাজে ধর্ম্মানুরাগ, নীতি পরায়ণতা ও সদ্ভাবের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইব। এই সহজ উপায় আমাদের দেশবাসিগণ ভুলিয়া যাইতেছেন, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

আমরা দেশবাসীকে আপাততঃ কেবল লোকশিক্ষা বিষয়েই অধিক মনোযোগ প্রদান করিতে পরামর্শ দিই এবং যাহাতে সেই শিক্ষার অস্থিমজ্জা ধর্ম্মদ্বারা গঠিত হয় তজ্জন্যও তাহাদিগকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে বলি। ধর্ম্মে যদি আমাদের আস্থা জন্মে, তবেই আমরা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের বিশেষত্ব—আমাদের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। বিংশশতাব্দীর নবীন আলোকে সুপথ চিনিয়া লইয়া আমরাও দ্রুত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব। তখন আর আমাদের পতনের ভয় থাকিবে না, আমরা কেবলই অগ্রসর হইতে পারিব। "ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকম্।"

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাই ভারতবাসিগণ তখন নানা শাস্ত্রে, শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্যে পৃথিবীতে এক নবযুগের অবতারণা করিতে পারিয়াছিল। অধুনা শিক্ষার মঙ্গলময় পরিণামস্বরূপই পাশ্চাত্য জগতের উন্নতি সাধন হইতেছে। আশ্চর্য্য বাণিজ্য শিক্ষাবলে ইউরোপীয়েরা আজ, অসার বস্তুর বিনিময়ে বিদেশ হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিজ দেশে লইয়া যাইতেছে। আশ্চর্য্য শিল্পশিক্ষা বলে মহাসমুদ্র উত্তরণোপযোগী "লুসেটেনিয়া" ও "টাইটানিকের" মত সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় পোত বাজের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। বিজ্ঞান কৌশলে জলে, স্থলে, আকাশে, পাতালে আশ্চর্য্য সমরাভিনয়, মেঘনাদের যুদ্ধ প্রবাদকে বস্তুত্বে পরিণত করিয়াছে। "বায়স্কোপের" প্রাণহীন চিত্র জীবন্তবৎকায় ব্যাপার—সম্পাদন করিতেছে। কণ্ঠহীন "গ্রামোফন", সুকণ্ঠ গায়কের ন্যায় অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত সুধাবর্ষণে শ্রুতিমূল সুশীতল করিতেছে। তারহীন তড়িদ্‌বার্ত্তা মত সহস্র যোজন দূরে নিমেষে কত সুখ দুঃখের সংবাদ বহন করিতেছে; কত মুমূর্ষুর জীবন দান করিতেছে; কত জীবের প্রাণ হনন করিতেছে; পাহাড় গলাইয়া সাগর করিতেছে; সাগর শুকাইয়া পাহাড় গড়িতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিজ্ঞানের বলে কত আশ্চর্য্য ঘটনা হইতেছে, সেই সমস্ত শুনিলে

আমাদের দেশের লোক সকল স্থলে বিশ্বাসও করিবেনা। সেই সকল কথা আমি এখানে বলিব না। যে তৃণ গুল্ম এতদিন কেবল পশুভোজ্য বলিয়াই জগতে বিদিত ছিল, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ আজি তাহা মনুষ্যেরও উপাদেয় খাদ্যরূপে পরিণত করিতেছেন। বিজ্ঞান বাস্তবিকই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান বাস্তবিকই বিধাতার আশীর্ব্বাদ।

যে শিক্ষা এই সকল শিল্পবিজ্ঞানের জনয়িত্রী, উন্নতি স্বর্গের পুষ্পাবৃত সোপান শ্রেণী, সেই শিক্ষা যে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানবের অবশ্য গ্রহণীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে?

সাহিত্যই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়। সাহিত্যের সাহায্যেই আমরা পরস্পর পরস্পরের শিক্ষা, অধিকতর সুখে গ্রহণ করিতে সমর্থ হই।

সুসভ্য মানবের শ্রেষ্ঠ ভাব বৈভবই সাহিত্যের প্রধান উপাদান। এই ভাবরাশির সাহায্যে কবি, তাঁহার কল্পনায় সৌন্দর্য্যের অপ্সরা-রাজ্য সৃষ্টি করেন। এবং দার্শনিকেরাও জগৎপ্রপঞ্চ ও পরমাত্মার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতে চেষ্টিত হইয়া থাকেন। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে কবি, সৌন্দর্য্য রচনার ভিতর দিয়া এবংদার্শনিকগণ, তত্ত্বানুসন্ধান-পন্থা অবলম্বন করিয়া একই সত্যতত্ত্বের অন্বেষণ করিয়া থাকেন।

নীরস শিক্ষা কেহই সহজে গ্রহণ করিতে চায় না বা পারে না। তাই শিক্ষার প্রধান উপায় সাহিত্যকে, যে জাতি, যত সরস, যত প্রাণস্পর্শী, যত গভীর করিতে পারিয়াছে, সেইজাতি সাহিত্যের দ্বারা সর্ব্ববিষয়ক শিক্ষা, তত শীঘ্র প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রাচীন-ভারতের এত উন্নতির কারণ কি? সাহিত্যের উন্নতি। সাহিত্য ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। শিক্ষা প্রধানতঃ সাহিত্যেরই অনুগামিনী। সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বযুগে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা এত প্রসরতা লাভ করিতে পারিয়াছিল। আমাদের উন্নত সাহিত্যই আমাদের মাতৃভূমিকে প্রকৃত স্বর্ণভূমিতে পরিণত করিয়াছিল।

ভারতীয় সাহিত্যে ধর্ম্মের প্রভাব যেরূপ প্রবল, বোধ হয় পৃথিবীর কোনও সাহিত্যে সেরূপ নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের অবনতির প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত, ভারতের সাহিত্যে এই একই সত্য, প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। আদি কবি বাল্মীকি হইতে—এমন কি ঋগ্‌বেদের কাল হইতেই এই ধর্ম্মধারা, ভবভূতি, কালিদাস ও জয়দেব পর্য্যন্ত নির্ঝরের অমৃতধারার মত প্রবাহিত হইয়াছিল, সেইজন্য ভারতীয় সাহিত্যের এত উন্নতি হইয়াছিল। কেবল সাহিত্য কেন? ভারতের সকল কর্ম্মের মূলেই ধর্ম্ম! এই ধর্ম্মবত্তাই ভারতের বিশেষত্ব। কোথায় ধর্ম্মের সংস্রব নাই? আচার, ব্যবহার, ক্রিয়াকাণ্ড, জীবন, মরণ, সমস্তই ধর্ম্ম সংস্রব সংযুক্ত কিরূপ সাহিত্য লোকে সমধিক আদরে গ্রহণ করে, ভারতবর্ষ তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। পদ্য সাহিত্য, যত সহজে মানবের মনাকর্ষণ করে, গদ্য সাহিত্য সেরূপ পারেনা। সেই জন্যই প্রাচীন ভারতে এত পদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই সেই সুললিত, বিচিত্র ছন্দো-বদ্ধ-পদ-রাজীব-রাজি-রচিত

সাহিত্য, নীরস চিকিৎসা শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতিকেও কত সরস ও সুন্দরভাবে গঠন করিয়াছিল। পদ্য-সাহিত্যের এই উপযোগিতা ও মনোহারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তখনকার সাহিত্যিকেরা তৎপ্রতি এত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তখন গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টি হইত না বলিলেই চলে। এই কবিতা প্রিয়তার ফলে, তখন দর্শন শাস্ত্রের কোন কোন পুস্তক পর্য্যন্ত পদ্যে রচিত হইয়াছিল। এমন কি "কলাপ ব্যাবরণের" কতিপয় সূত্র পর্য্যন্ত একরূপ প্রচ্ছন্ন পদ্যে রচিত, দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা প্রিয়তার ফলে গদ্য-সাহিত্য অনেক খাটো হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই এক "কাদম্বরী" ভিন্ন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য গদ্য কাব্যের নাম করিতে পারিতেছি না। আর পদ্য সাহিত্যে এত উৎকৃষ্ঠ রাশি বাশি গ্রন্থের উদ্ভব হইয়াছিল যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়া তাহাদের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

পদ্য সাহিত্য যেমন মনোজ্ঞ, তেমনি সহজ আয়ত্ত সাধ্য; এই সার সত্যটী উপলব্ধি করিতে পারিয়াই যে ভারতীয় সাহিত্যিকেরা, পদ্য-সাহিত্যেব প্রতি এত আসক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার অনুকবণেই বোধ হয় বাঙ্গালাতেও এ পর্য্যন্ত পদ্য-সাহিত্যেবই অধিক প্রচার হইতেছে।

সাহিত্যের দ্বার দিয়াই সকল জাতি উন্নতির মঙ্গলময় রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে। ইউরোপেও আগে সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল; তারপর শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতিব এত অসম্ভাবিত উন্নতি সম্ভবপব হইয়াছে। যদি সেক্ষ্‌পিয়াব্, মিল্‌টন্, কার্লাইল্, ভল্‌টেয়াব্, রুসো, হোমাব্, ভিক্টর্‌হিউগো প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ, পাশ্চাত্যভূমে অবতীর্ণ না হইতেন, জানিনা তাহা হইলে তথায় আজিকার উন্নতির এই তীব্রোজ্জ্বল কিরণচ্ছটা এত বিস্তৃত হইয়া, দশদিক্ এমন ভাবে আলোকিত করিতে পারিত কিনা!

শিক্ষা সাহিত্যের হাত ধরিয়াই দণ্ডায়মান হয়। সাহিত্যই শিক্ষার প্রধান সহচর, সাহিত্যই শিক্ষার পরিপোষক। ভারতের অতীত গৌরবের কাবণ ও পাশ্চাত্য দেশের বর্ত্তমান উন্নতির কারণরূপে যখন আমরা প্রধানতঃ সাহিত্যকেই লক্ষ্য কবিতেছি, অতীত বর্ত্তমান কালদ্বয়েই যখন আমরা সাহিত্যকেই যুগান্তবেব প্রবর্ত্তক বলিয়া জানিতে পারিতেছি, তখন ভবিষ্যতেও যে সাহিত্যই উন্নতির কণ্টকময় বন্ধুব বর্ত্মসকল, সুকোমল পুষ্পপুঞ্জে পূর্ণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমাদের দেশ এখন সর্ব্বতোভাবেই অবনতির সুগভীর তিমির গর্ভে নিপতিত। যদি এই দেশের প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্যকে পূর্ণাবয়বরূপে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। ধীরে ধীরে জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে সৎসাহিত্যের সুপ্রচার করিতে হইবে, তবেই যদি কখনও আমাদের উন্নতি সম্ভবপর হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ভারতের সকল কর্ম্মই ধর্ম্মমূলক। ভারতবর্ষে যখনই যে বিজ্ঞান উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে, আমরা তখনই দেখিতে পাইয়াছি, মূলে ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্মভিন্ন ভারতের কোন বিদ্যাই স্ফুর্ত্তিলাভ করে নাই এবং ভবিষ্যতেও ধর্ম্মহীন হইয়া

ভারতে কোনও কিছু উত্তমরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। এখন আমাদের অধর্ম্ম ভাবোন্মূলক ও ধর্ম্ম-ভাবোদ্দীপক দোষ লেশশূন্য উন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইবে। দেশময় বিস্তৃত-ধর্ম্মবিপ্লবের বিকট চিৎকারকে অভিভূত করিয়া ধর্ম্মের তানলয়ে সাহিত্যের বিজয়ভেরী বাজাইতে হইবে। তবেই আমাদের সুপ্রভাতের সূচনা হইবে। সহস্র বাধা সত্ত্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, আমাদের এই সুপ্রভাত একেবারে সুদূর পরাহত নহে।

উদরান্নের জন্য আমাদিগকে বিদেশী ভাষাও সাহিত্যে অধিকলিপ্ত থাকিতে হইতেছে বলিয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটিতেছে। বিদেশী সাহিত্য চর্চ্চারফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিজাতীয়ভাবে গঠিত হওয়াতে তাহা প্রকৃত সৌষ্ঠব-সম্পন্ন না হইয়া বরং অসৌষ্ঠবেরই হেতু হইতেছে। ইংরেজি ঢঙ্গের বহু নকল না করিয়া যদি কেবল ইংরেজি সাহিত্যের সারপদার্থ সংগ্রহ করা হইত তবেই আমাদের উপকার হইতে পারিত। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমরা এমনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, তাই এভাবে ইংরাজির নকল চলিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি পথে আর একটা দুস্ত্যজ্য বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে আজ কাল সাহিত্যিকের অভাব নাই। কিন্তু যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি, দূরদর্শন ও আত্মমর্য্যাদা থাকিলে সাহিত্য সৃষ্টির অধিকার জন্মে, সেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি ইঁহাদের নাই পরন্তু তাহারা অতিশয় স্বেচ্ছাচারী। সাহিত্যের কোন বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে অথবা তার ধার ধারিতেও ইহারা একেবারেই নারাজ। যাহার যেরূপ ইচ্ছা, বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া সে সেইরূপ খেলা খেলিতেছে, বাঙ্গালা সাহিত্য যেন বেওয়ারিশ্ মাল। অধিকাংশ লেখকেরা আজ কাল সাহিত্যের নামে যে ভেজাল জিনিষের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহাতে সাহিত্য জীবীদের যে কিরূপ স্বাস্থ্য হানি হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে দুঃখে মন বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। এমন কেহ সাহিত্য সম্রাট জীবিত নাই, যাঁহার শাসনে এই যথেচ্ছা-চারিতার দমন হইতে পারে। তাইত আজ যাহার যেরূপে ইচ্ছা সাহিত্যকে সেইরূপে ভাঙ্গিতেছে ও সেইরূপে গড়িতেছে। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মগণ যেভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি করিয়া তুলিতেছিলেন, যদি সেই ভাবে তাঁহাদের প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে, অদ্যাপর্য্যন্ত সমুদয় সাহিত্যিকেরা চলিতেন, যদি যথেচ্ছাচারী না হইতেন, তবে যে বাঙ্গালা সাহিত্যের আজ কাল কি উন্নতি হইত, তাহা অনুমান করিতেও শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়। বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্যিকদিগকে সুসংযত করিবার জন্য একজন শক্তিশালী শাসকের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত মহাত্মা বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ন্যায় কিম্বা তাঁহাদের অপেক্ষাও একজন শক্তিশালী সাহিত্য-রথীর আবির্ভাব না হইবে, ততদিন এই উচ্ছৃঙ্খলতার নিবারণ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

যখনই যে বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা আরম্ভ হয়, তখনই তাহা দমন করিবার জন্য একজন শক্তিমান্ পুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়া থাকে।

এক সময়ে ভারতে ধর্ম্মমতের বিভিন্নতা এতবৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাতে জন সাধারণ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়" হইয়া পড়িয়াছিল। চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, পাশুপত ভাগবত প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বীরা বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া ভারতকে আকুলীকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের সেই স্বেচ্ছাচার দমন করা তখন একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, তাই অনতিবিলম্বে আচার্য্যবর্য্য শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ। সংস্কৃত ব্যতিরেকে বাঙ্গালা, অন্ধ, খঞ্জ ও পঙ্গু, হইয়া পড়ে এবং অবশেষে প্রাণহীন হয়। অধিক কি সংস্কৃত অক্ষরগুলি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত আকারে বঙ্গাক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় সম্ভবমত সংস্কৃতের আদর্শ সমূহই বাঙ্গালাতে অনুসৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সম্ভবমত সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত অলঙ্কার, ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণ করিলেই, বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্যক্ উন্নতি সাধন হইতে পারে। এই কথাগুলি আমাদের বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি সাহিত্যিকদিগকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মগণ, বাঙ্গালাতে বাহুল্যরূপে সংস্কৃতের আদর্শই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারিত। অবশ্য দেশ, কাল অনুসারে সাময়িক ছোট খাটো পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া থাকে কিন্তু তাহা সঙ্গত ভাবে সম্পন্ন হইলে কোন কথাই থাকে না।

কোন শ্রেষ্ঠ কার্য্যই বিনা বিঘ্নে সহজে সম্পন্ন হয় না। তাই জাতীয় উন্নতির উপায় সৎসাহিত্য সৃষ্টির পক্ষেও বিঘ্নলক্ষিত হইতেছে। এজন্য আমাদের আশাশূন্য হইবার কোন কারণ নাই। কেন না "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।"

দেশের লব্ধ প্রতিষ্ঠ অভ্যুদয় শালী নবীন সাহিত্যকগণ একটু সাবধান হইলেই আমাদের আশা পূর্ণ হইতে পারে। তাঁহারা বাঙ্গালার আসরে সাহিত্যিকরূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি অন্ততঃ মোটামুটিভাবেও সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, তবেই তাঁহাদের দ্বারা প্রকৃত কায হইতে পারে। কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য অধ্যয়ন দ্বারা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ব্যাকরণের অসদ্‌ভাবই রহিয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় ৺ প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "সাহিত্যপ্রবেশ" ব্যাকরণ খানা বহুগবেষণাপূর্ণও বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষে অনেকটা উপকারী বটে কিন্তু তাহা আজকাল কেহ পড়েননা, স্কুল হইতেও তাহা বহিস্কৃত প্রায় হইয়াছে: এই ব্যাকরণ খানার মতে চলিলেও অনেক গোলযোগ হইতে বাঁচা যাইতে পারে। ব্যাকরণ যাহা আছে, তাহার নাম করিলাম, কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্র ত বাঙ্গালায় দেখিতেই পাই না, কাজে কাজেই সংস্কৃতের অনুসরণ ভিন্ন আমাদের গতি নাই। সাহিত্যিকদিগকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের বন্ধন সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে। তাঁহাদের শক্তিতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাঁহারা যদি স্বীয় স্বীয়

শক্তির অপব্যবহার না করিয়া তাহা যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করেন, তবে তাঁহাদের দ্বারাই আমাদের সর্ব্বকল্যাণকর সৎসাহিত্যের সৃষ্টিও পরিপুষ্টি হইতে পারে। তাঁহাদের হাতেই এই মহৎকার্য্যের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, ইহা যেন তাঁহারা সর্ব্বদা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখেন।

শ্রীঅন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি।

পল্লীস্বাস্থ্য কথা।

বিশুদ্ধ জলাভাবে পল্লীগ্রামে যে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা না থাকাতে সময় সময় ভয়ানক মহামারী সমুপস্থিত হইয়া অসংখ্য নরনারীকে কালগ্রাসে পাতিত করে। তদ্দরুণ পল্লী সমাজ নিরন্তর বিপর্য্যস্ত হইতেছে। এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য অর্থব্যয় করিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। আজ কাল প্রত্যেক পল্লিগ্রাম প্রেসিডেণ্ট প্রমুখ এক একজন পঞ্চায়তের পরিদর্শন ও কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। গ্রামের শান্তিরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা তাহাদের যেমন কর্ত্তব্য, তেমন তাহার স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধেও বিশিষ্ট প্রকার মনোযোগ প্রদান করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। দুঃখের কথা, পঞ্চায়তগণ এই গুরুতর বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিতেছেন না। তাহাদের মনোযোগ থাকিলে বোধ হয় এত দিনে দয়াশীল গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য অবশ্যই কার্য্যে পরিণত হইত। আমরা যতদূর জানি প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ৩।৪টী কি ততোধিক পুরাতন বৃহৎ জলাশয় বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তৎসমস্ত আবর্জ্জনা পূর্ণ অথবা বিশুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত। সংস্কারাভাবে একেবারে অব্যবহার্য্য। অর্থাভাবে ও কোন কোন স্থলে মনোযোগের অভাবে সেই সমস্ত জলাশয় গুলির এইরূপ দুরবস্থা। যদি এই সমস্ত জলাশয়ের আবর্জ্জনা বিদূরিত অথবা পঙ্কোদ্ধার করা যায় তাহা হইলে পানীয় জলের অভাব অনেকটা দূর হইতে পারে। গ্রামে গ্রামে নূতন পুকুর খনন করিয়া পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা বহুব্যয় সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে পুরাতন পুকুর গুলির সংস্কার-ব্যয় অপেক্ষাকৃত অতি অল্প। আমাদের বিবেচনায় এই অল্পব্যয়সাধ্য কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পল্লীর পানীয় জলাভাব দূর করা সঙ্গত। এস্থলে একটী কথা উঠিতেছে; এই পুরাতন পুকুর গুলির সত্বাধিকার লইয়া। দেখা যাইতেছে পুকুরগুলি কোন না কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে। দেশের ও নিজের উপকারার্থ সত্ব মাত্র অক্ষুন্ন ভাবে আপন আপন হস্তে রাখিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হস্তে পুকুরগুলি অর্পণ করা সত্বাধিকারিগণের কর্ত্তব্য। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আবশ্যক বোধে স্থলবিশেষে পুকুরগুলির

সংস্কার বিধান এবং জল বিশুদ্ধ রাখিবার উচিত ব্যবস্থা করিবেন। প্রত্যেক পুকুরে চারি খানি ব্যবহারোপোযোগী ঘাট থাকিবে, তাহার একখানি হিন্দু পুরুষ, একখানি হিন্দু স্ত্রীলোকের ও এক খানি মুসলমান পুরুষ এবং একখানি মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। জল রক্ষাকল্পে গ্রাম্য চৌকীদারগণ পঞ্চায়তের তত্ত্বাবধানে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে পাহারা দিবে। জল রক্ষার প্রথম দায়িত্ব পঞ্চায়েতের উপর থাকিবে, দ্বিতীয় দায়িত্ব চৌকীদারের উপর রহিবে। কেহই যথেচ্ছা জল ব্যবহার করিতে পারিবেনা, কেবল পানীয় রূপে ব্যবহার করিতে পারিবে মাত্র।

প্রত্যেক পল্লীতে অধিবাসী সংখ্যা অনুসারে এক কি ততোধিক সংরক্ষিত পুকুর থাকিবে এবং সংরক্ষণের ভার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের উপর সর্ব্বতোভাবে সংন্যস্ত রহিবে। স্ব স্ব মালীকীসত্ব রক্ষাকল্পে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে সময় সময় মৎস্য রক্ষা ও তাহা উত্তোলন করিবার অধিকার সত্বাধিকারিগণের রহিবে, কিন্তু তাহারা পুকুরের পাড়ে কোন প্রকার বৃক্ষাদি সৃজন কি মল মূত্র ত্যাগ করিতে পারিবেনা। গ্রামবাসিগণ নিরাপত্তিতে যে কোন সময়ে পানীয় জল লইতে পারিবে। পঞ্চায়ত সর্ব্বদা জলের সদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা এবং পুকুর পরিস্কৃত আছে কিনা দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মাসান্তে একবার তৎসম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে রিপোর্ট করিবেন। গ্রামবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শ্রমজীবী ও নিরক্ষর, স্বাস্থ্যরক্ষা কিরূপে করিতে হয় তাহা তাহারা একেবারেই জানেনা। তাহাদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী বিধিমতে বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং সেই সমস্ত তাহাদের দ্বারা প্রতিপালন করাইয়া লইতে হইবে।

পানীয় জলের ব্যবস্থার পর গ্রাম্য পয়ঃপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। পল্লীগ্রামে জলনিঃসরণ প্রণালী নাই বলিলেই হয় এবং গ্রাম্য লোকের মধ্যে তাহার আবশ্যকতা অতি অল্পেই উপলব্ধি করেন। ইহারা আপন আপন প্রয়োজনানুসারে বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত খনন করে, অথচ এই গর্ত্তের জল নিঃসারণের কোনই ব্যবস্থা রাখে না। তৎপ্রযুক্ত গর্ত্তে জল জমিয়া নিঃসরণপথ অভাবে অতি অল্প সময় মধ্যে পুতিগন্ধময় হইয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্য একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলে এবং সময় সময় মারাত্মক ব্যারামের সৃষ্টি করে। এই অভিযোগ নিরাকৃত করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে (যেখানে খাল বিল নাই) এক একটা সাধারণ জল নালার সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড নিজব্যয়ে এই পয়ঃপ্রণালীর সৃষ্টি করিবেন। তাহার যথাযথ সংরক্ষণের ভার পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত থাকিবে। প্রয়োজনানুসারে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ব্যয়ে সময় সময় তাহা সংস্কৃত হইবে। এই পয়ঃপ্রণালী এরূপভাবে খনন করিতে হইবে যেন তদ্দারা ছোট ছোট নৌকার চলাচল হইতে পারে এবং এই খনিত মৃত্তিকা দ্বারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পর্য্যন্ত গমনাগমনোপযোগী পথ প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে একদিকে জল নিঃসারণের পথ যেমন উন্মুক্ত হইবে তেমন আবার নৌকাযোগে ও স্থলপথে গমনাগমনের সুবিধাও হইবে। গ্রামবাসী যেখানে

সেখানে গর্ত্ত খনন করিতে পারিবেনা এবং আপন আপন বাড়ী হইতে অপ্রশস্ত জল নালির সৃষ্টি করিয়া তাহা সাধারণ প্রশস্ত জল-প্রণালীর সহিত নিজ নিজ ব্যয়ে সংযুক্ত করিয়া দিবে। এই ব্যবস্থানুসারে প্রত্যেক বাড়ীর সঞ্চিত জল ক্ষুদ্র প্রণালী যোগে বৃহৎ পয়ো-নালিতে নিঃসৃত হইয়া এবং গ্রামের বদ্ধ জল প্রবাহদ্বারা স্থানান্তরে নীত হইবে। এস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে; যথা,—কোন বাড়ীর জল নিঃসরণার্থ ক্ষুদ্র নালি প্রস্তুত করিতে গেলে, অন্য বাড়ীর মালিকের ভূমির উপর দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, এস্থলে অন্য বাড়ীর অধিকারী বাধা বিঘ্ন জন্মাইবে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে পঞ্চায়ত যথাসাধ্য পক্ষাপক্ষের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন এবং আবশ্যক হইলে ভূমির মূল্য স্থির করিয়া দিবেন। এই মূল্য উপকৃত ব্যক্তিকে বহন করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত পয়ঃপ্রণালী সমূহ কোন প্রকার আবর্জ্জনা পূর্ণ না হয় এবং সচল থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য এবং সময় সময় তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে স্থানীয় পঞ্চায়েত বাধ্য থাকিবে।

পল্লীস্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে পায়খানার সুব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন। পল্লিবাসিগণ কেহই এ সম্বন্ধে বড় একটা দৃষ্টি রাখেনা। ইহারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত সংঘটন করিয়া থাকে; এমন কি যে পুকুরের জল পান করিয়া থাকে তাহার পার্শ্বে, কখন কখন বা জলের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যে পর্য্যন্ত এই দর্নীতি প্রশমিত না হয়, তাবৎ পল্লীস্বাস্থ্যের আশা সুদূর পরাহত। পানীয় কি অন্য কোন প্রকার ব্যবহারোপযোগী পুকুর হইতে সুদূরে প্রত্যেক বাড়ীতে এক একটা গর্ত্ত থাকা উচিত, এবং এই গর্ত্ত মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করার পর মাটী ঢাকা দেওয়া অতীব প্রয়োজন। এইরূপে একটী গর্ত্ত পূর্ণ হইলে তাহার নিকটে আর একটী গর্ত্ত করিয়া এই প্রকারে ব্যবহার করিতে হইবে। গৃহস্থবর্গ সহজে এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে তাহাদিগকে আইনতঃ বাধ্য করিবার চেষ্টাও অসঙ্গত নহে। আশঙ্কা হয়, পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থানুসারে পল্লীবাসিগণ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে সহজে স্বীকার করিবেনা, এমতাবস্থায় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড একটা ছোটখাট আইন (By law) করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে গ্রামবাসিগণকে বাধ্য করিবেন। সহজে বাধ্য না হইলে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা থাকিবে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল।

ইতিহাস।

বঙ্গ সাহিত্য ইতিহাসে বড় দবিদ। এ দারিদ্র্য শুধু বাঙ্গালীকে নয়, হিন্দু জাতিকেই ঘিরিয়া রাখিয়াছে। কি জানি কি কারণে এমনি করিয়া একটী জাতি ইতিহাসকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিল, যে আজ ইহার জন্য পবদ্বার ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। ভারতের ইতিহাস পাঠ করিতে হইলে ভারতকে ছাড়িয়া যাইতে হয়। ভারতের বাহিরে যাইয়া তবে ভারতকে জানিতে হয়।

অধুনা ইতিহাস সংরক্ষণের একটী চেষ্টা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। পুরাতন-প্রথা, ঘটককারিকা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখন উপায় কিছু কার্য্য করিয়া থাকিলেও বাস্তবিক সমস্ত জাতিকে এক করিয়া একটী ইতিহাস লিখিবার আকাঙ্ক্ষা দেশে পূর্ব্বে বোধ হয় বড় ছিল না। আজ জগতের অন্যান্য জাতির সংস্রবে আসিয়া আমাদিগের হৃদয়ে ইতিহাসের প্রতি একটী স্নেহ মমতা ও শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিতেছে। বিশেষ যখন নিজেদেব ইতিহাসকে অনেক উপায়ে সংযত ও সংক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া আমরা ব্যথিত অন্তরে তাহাকে "মিথ্যা প্রচারিণী" বলিতে বাধ্য হইতেছি।

এই বর্ত্তমান ইতিহাস লিখিবার চেষ্টার পথে কতকগুলি বাধা আপনি আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। বাহিরের বাধার কথা বলিতেছি না, অর্থাভাবেব কথা বলিতেছি না, উদ্যম আছে মানিয়া লইয়াও দেখিতে পাই কেন যেন আমবা ইতিহাসের সম্মানকে যথার্থরূপে বুঝিনা। একদল ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক আজ কাল সাহিত্য জগতে দেখা দিয়া ইতিহাস রাজ্যে অনেক অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল সংগ্রহ করিতেছেন। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টাও ঠিক সত্যকে পূর্ণ সম্মান দিতে বাধা জন্মাইতেছে, এই সময়ে যখন ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাস বঙ্গে বহু লিখিত হইতেছে তখন তাহাদের দোষগুণেব বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন।

বঙ্গ সাহিত্যে এখন উপন্যাসের যুগ। কত নব নব ধরণের উপন্যাস সম্ভার আসিয়া বাজাব পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সামাজিক, ঐতিহাসিক, ডিটেক্‌টিভ প্রভৃতি গল্পের পুস্তক পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছে। ছোট গল্প না হইলে মাসিকপত্র সম্পাদন অসম্ভব। নাটক, নভেল না থাকিলে পত্রিকার গুরুত্বটাই কমিয়া যায়। আজ কাল এই রুচি অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকারগণও প্রায়ই উপন্যাসের ভেলায় ভাসিয়া মাসিকপত্রিকার মসীলিপ্ত বক্ষে প্রথমে আশ্রয় লাভ করেন।

উপন্যাসের একটী কার্য্য আছে, সাহিত্যে ইহার একটী স্থান আছে। সর্ব্বদেশেই উপন্যাস একটু প্রবল ভাবেই পাঠকমণ্ডলীকে আক্রমণ করে। এই উপন্যাসের অন্য কোনও গুণ বা অগুণ থাকুক না কেন এটী নিশ্চয় যে দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার এটী একটী

পন্থা। জাতীয় রুচি ও চরিত্রকে পুষ্ট করিবার আহার এই উপায়ে সমাজের নিকট বহন করিয়া নেওয়া যায়।

উপন্যাসের এই প্রয়োজনীয়তা, অস্বীকার না করিয়া আজি আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের জাতীয় চরিত্রের উপর কতদূর প্রভাব আছে, সেই বিষয় আলোচনা করিব। ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, নিতান্ত সত্য ঘটনাটীর অবলম্বনে সুসজ্জিত একখানি গল্পের পুঁথি লিখিত হইয়াছে। ইহা বুঝিতে হইবে না যে ইতিহাসের পূর্ণ সংকারের জন্য ঈদৃশ উপন্যাস লিখিত হয়। তাহাই যদি হইল তবে সত্য ঘটনার আশ্রয় লইয়া কল্পিতকে সত্যের মহিমায় ভূষিত করিবার এ চেষ্টাটী কেন লেখক সমাজে থাকিবে?

যদি ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই উদ্দেশ্য হয়, তবে আজ খুব দুঃখের সঙ্গে আমাদিগকে বলিতে হয় যে, এক্ষেত্রে বঙ্গের লেখকগণ প্রকৃত পন্থায় অগ্রসর হইতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে বলিতে গেলে আমরা আমাদের সাহিত্য সম্রাটকে ছাড়িয়াও কথা কহিতে পারি না। মাগুরার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবার সময় রাজা সীতারামের বিষয়ে দুই একটী কিংবদন্তী শ্রবণ করিয়াই তিনি সীতারাম বিষয়ে যে কল্পনার মন্দাকিনী বহাইয়া গিয়াছেন তাহাতে ইতিহাসের বীর সীতারামকে কোন অদৃশ্য দেশে বিধৌত করিয়া লইয়া গিয়াছে। রাজা সীতারাম জাতীয় সম্পদ্, তাহার উপরে কল্পনায় এই মোহিনীশক্তি, উপন্যাস লেখককে ঠিক কর্ত্তব্যের পথে রাখিয়াছে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। সামান্য জনশ্রুতিমাত্র আশ্রয় করিয়া তাঁহার অপ্রতিহত কল্পনা পবনে সাহিত্য সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ তুলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে বাস্তব সীতারামকে পূর্ণ প্রাপ্য সম্ভ্রম দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ। এইরূপে বহু কবি কুলাল চক্রে ঘূর্ণায়মান, রাজা সীতারাম রায়ের মত অনেক ঐতিহাসিক মহাপুরুষ আপনাদের বর্ণ, জাতি, ও স্থান ভুলিয়া বহুরূপীর ন্যায় সাহিত্যালয়ে আশ্রয় পাইয়াছেন!

চট্টলার নবীন কবি নিজের ভাষা ও কল্পনার ভেলায় সিরাজকে এক আজানা দেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে পথেই ধরা পড়িয়াছেন। এমনি ভাবে কে জানে কত লেখক কত ঐতিহাসিক উপন্যাস স্কন্ধে, পরস্বাপহারে দোষী হইতেছেন। আইনমতে লোকের চরিত্রে অযথা দোষারোপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হয়। আজ সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া এই যে পরধন লুণ্ঠনকারীদের দান, ইহাদিগকে কে বিচার করিবে? ইতিহাসের একটা বিচার বৈঠক থাকিলে এ কল্পনার মন্দাকিনী ধীর মন্থরগামিনী হইত। পরস্বাপহরণের জবাব দুই এক ছত্রে হয় না। সম্রাটের লেখনী সম্পদে বঙ্গের প্রাণকে এমনি ভাবে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে যে, বঙ্গ সকল দিক্ ভুলিয়া অবিচার, বিচার বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

ইতিহাস অতীত বিষয়। অতীতকে অপ্রয়োজনীয় ও মৃত বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিলেও সকলেই স্বীকার করেন যে, অতীতের একটা কার্য্যকরী শক্তি আমাদের জাতীয় প্রাণ প্রবাহকে প্রবল করিয়া দিতেছে। ইহার এমন একটী শক্তি আছে যে কবির ভাষায় বলিতে

গেলে বলিতে হয় যে, অতীত তাহার অদৃশ্যলিপি দিয়া পিতামহদের যত কীর্ত্তি কাহিনী আমাদের জীবনের প্রতি পাতায় পাতায়, মজ্জায় মজ্জায় মিশাইয়া লিখিয়া যাইতেছে। এই অতীত, ইতিহাসের সম্পদ। ইতিহাস লোপের সঙ্গে, সমাজের, দেশের একটী শক্তি অন্তর্হিত হয়। এই মূল্যবান সাহিত্যাংশকে নির্ম্মম হৃদয়ে পাষাণ হস্তে যখন সাহিত্যরথিগণ প্রহার করেন তখন ঐতিহাসিকের একটী কর্ত্তব্য আপনি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে গেলে সবাইকে এক পদ অগ্রসরের পূর্ব্বে সম্মুখের স্থানকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া লইতেই বলিতে হয়।

ইতিহাস জাতীয় জীবনীশক্তির ফল্গু। নীরবে, আপন মনে বহিয়া বহিয়া এ অন্তঃসলিলা জাতীয় অনন্ত প্রাণ প্রবাহকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে। কত শত্রু, কত অত্যাচার, কত বীর পদভরেও ইহার ধ্বংশ হয় নাই। জাতির মধ্যে সর্ব্বস্থানে প্রতি গৃহে প্রতি প্রান্তরে ইহার সঞ্জীবনী সুধাধারাকে দেখিতে পাই। ইহার উপর উপন্যাসের অত্যাচারটী ঠিক বিচার বুদ্ধি অনুমোদিত নহে। ইহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া জাতি আপনাকে ভুলিয়া যায়।

অপর পক্ষে আর একদিক দিয়া ইতিহাস ক্ষেত্রে অত্যাচারের অবতারণা হইয়াছে। বঙ্গের ইতিহাস নাই। বর্ত্তমানে লেখকগণের চেষ্টাতে খণ্ড খণ্ড ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অসংবদ্ধ ইতিহাস যদিও লিখিত হইতেছে তথাপিও একটী পূর্ণ বঙ্গের সম্পূর্ণ ইতিহাসের কথা সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে। এমন একটী পূর্ণতার চেষ্টা কবে আসিবে এবং আসিতে কি শ্রম ও কঠোরতার প্রয়োজন এসব প্রশ্ন অল্পই উঠিতেছে। কিন্তু একটী চিন্তার বিষয় আছে। যখন আমরা মানিয়া লই যে জাতীয় জীবন স্পন্দনের ভৃগভস্থ উষ্ণ পদার্থ এই ইতিহাস, তখন উহা একটা হিসাব নিকাশের ভিতর দিয়া অনুমান করিতে হয়।

কিন্তু সম্পূর্ণটীর কথা ত দূরে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যে সকল ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের ন্যায় দুই চারিখানি অসম্বদ্ধ ইতিহাস বঙ্গে উঠিতেছে ও পড়িতেছে তাহাও ঠিক ইতিহাস বলিয়া জাতি গ্রহণ করিতেছে না। তাহা না হইলে ক্ষণস্থায়ী ক্রীড়নশীল ইতিহাস লেখকের এই গ্রন্থরাশি অকাল মৃত্যুকে কেন স্নেহালিঙ্গন দিতেছে? এ কথাটী আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে দেশে ঐতিহাসিকের একটী বিশেষ অভাব আছে। হিন্দু জাতিরই ইতিহাস গর্ব্ব সাজে না। বর্ত্তমানেও সেই অতীত প্রথাই অবলম্বিত হইতেছে। দেশে বড় বড় দশ পাঁচটী ঐতিহাসিকের দর্শন লাভ দুর্লভ। যাঁহারা এই ক্ষেত্রে একটু স্থান নিজদিগের জন্য করিয়া লইতে চান তাহারা আপনাদের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া না গিয়া ইতিহাসে এক অনুমানের গন্ধমাদন বহন করিয়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত হন। এই অনুমানগুলিও তীক্ষ্ণ ইতিহাসের কঠোরতায় পরীক্ষিত হয় না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও বিপদের বিষয় এই যে লেখকগণ লিখিতে বসিয়া অতীতের স্থানে আপনাদের কীর্ত্তিগাথার দীর্ঘ তালিকাবলি হস্তে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হন। তাহারা ভুলিয়া যান যে, তাহার নিজের ইতিহাস দেশের ইতিহাস নয়, দেশ তাহা

চায় না। এ দোষ অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বদেশেই আছে। ইংলণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিকগণ নিজ নিজ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, বীরসিংহ নেপোলিয়ন শত্রু মিত্রের হস্তে অনেক প্রকার নিগ্রহ অনুগ্রহ পাইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ যে এইসবকে ছাঁটিয়া, সমাজকে, শত্রুতাকে, মিত্রতাকে ছাড়িয়া আপনার কীর্ত্তি কাহিনীতে আসিয়া মজিয়াছে। এটা বড় অবজ্ঞার দোষ নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঙ্কিমচন্দ্রের রুচিরাগ রঞ্জিত ইতিহাসকে ক্ষমা করিলেও এই প্রত্নের শেষ পরিণতি পরিতাপের হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ অবস্থায় যখন ইতিহাস লিখিব কি, কি করিয়া লিখিতে হয় আমরা জিজ্ঞাসা করি তখন এই প্রশ্ন সকলের উত্তর দিবার জন্য দেশে একটী ইতিহাস মণ্ডলীর প্রয়োজনীতা দৃষ্ট হয়। কি করিয়া, কোন সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লিখিতে হইবে কোন কোন কার্য্য ইতিহাসকে বিকৃত করিতেছে প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ আলোচনার ও দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনীয়তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীনীলগোপাল চক্রবর্ত্তী বি, এ।

সাগরের প্রতি নোয়াখালী।

(১)

বহু যুগ ধরি বহু দূর হ'তে ল'য়ে পরমাণু অণু,
সুষমা কুড়ায়ে গড়িয়াছ মোর সুন্দর শ্যাম তনু,
এতদিন ধরি সাজাইলে কত মঞ্জুল ফল ফুলে,
নারিকেল তাল গুবাক-গুচ্ছে রঞ্জিলে কূলে কূলে;
উরস আমার করিল দীর্ণ তোমার উর্ম্মিমালা,
নাহিক বাস্তু। ক্ষত দেহে আর মর্ম্মে দহিছে জ্বালা;
কত হর্ম্ম্যবাসী পথের কাঙ্গাল পর্ণকুটীরে বাস,
গোলা ভরা ধান ছিল, আজি হায় নাহিগো অন্নগ্রাস;
আর কেন ফিরে যাও, হে সিন্ধু আর কেন ফিরে যাও,
তোমার বিশাল বক্ষে আমায় লুপ্ত করিয়া দাও!

(২)

মনে পড়ে কিহে বারীন্দ্র তব, অতীত কীর্ত্তি কথা,
বন্যার রূপে করেছিলে গ্রাস লক্ষ তনয় হেথা;

শোকের তুফান দৃশ্য ভীষণ রাক্ষস-লীলা তব,
জননীর কোল করিয়া শূন্য প্রলয় মহোৎসব ;
কত গো-মহিষ মানুষ সহিত ভাসিল আর্ত্ত রবে,
বিত্তহারা বান্ধব হীন ভগ্ন হৃদয় সবে ;
জীয়ন্ত মরা ছিল যারা শেষ তাদেরো জীবন ভারী,
মড়ার উপরে তুলিল খড়্গ দুর্ভিক্ষ মহামারী ;
সুখের স্বপন ভেঙ্গে দিলে যদি নিলে যদি সব নাও,
তোমার বিশাল বক্ষে আমায় লুপ্ত করিয়া দাও !

(৩)

"তিরাশী সনের ভীষণ ঝটিকা" আজিও শিহরি উঠি,
উপাড়ি বৃক্ষ করিল নষ্ট দানবের দল জুটি,
নির্ম্মূল হ'ল গুবাক বংশ, নির্ম্মূল নারিকেল,
কাঁদিল আকুল, সন্তান মোর অন্তরে বাজে শেল ;
কত পণ্যবাহী তরণী তোমায় দিয়ে গেল শেষ ভার,
লক্ষপতির বক্ষঃ ভেদিয়া উঠিলরে হাহাকার !
খেয়ার নৌকা খাইয়াছ কত করিয়া কুক্ষিগত,
নীরব সমাধি লভিল জলধি আমার পুত্র কত !
কাঁদুক পত্নী পুত্র দুহিতা কাঁদুক স্বজন বন্ধু,
সন্দীপ আর হাতীয়ার চর তাই গড়িয়াছ সিন্ধু !

(৪)

ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফলিত যাদের পীত কাঞ্চন ছড়া,
লক্ষ্মী মাসে সে সোনার ফসলে ছিল যে আঙ্গিনা ভরা ;
অতিথি নিত্য হইত তৃপ্ত, রাজভোগে যার গেহে,
অন্নাভাবের দৈন্য শাসন আজি রে তাহার দেহে ;
লাঙ্গল জোয়াল ছাড়িল কৃষক যুগী জোলা ছাড়ে তাঁত,
জোটেনা কর্ম্ম মজুরের দল কাঁদে মাথে দিয়ে হাত ;
কুসীদ স্বর্ণ উত্তমর্ণ চাহিতেছে বার বার,
ঋণের জ্বালায় যতই জ্বলুক পেটের জ্বালা যে তার !
আর কেন ফিরে যাও, হে সিন্ধু আর কেন ফিরে যাও,
তোমার বিশাল বক্ষে আমায় লুপ্ত করিয়া দাও !

(৫)

ক্ষেতের ধান্যে ভরেনা'ক পেট, পরের দুয়ারে আজ,
জঠর জ্বালায় ভিক্ষা প্রার্থী গিয়াছে সকল লাজ ;
নিকৃষ্ট বলিয়া রেঙ্গুনের চাউল ফেলেছে যে ঘৃণা ভরে,
সেই পুত্র আজ অঞ্চল পাতে তার এক মুঠো তরে ;
লক্ষ্মীর ধন বিনিময়ে তার যোগালে দুই এক মুষ্টি,
প্রাণের দুলাল লুটিছে ধরা না খাইয়া মরে গোষ্ঠী ;
তৃণ লতা পাতা যাহা কিছু হায়, আছিল বক্ষে মম,
পোড়া পেটে দিল, তবু না নিভিল ক্ষুধা সে অনল সম ;
ভীষণ ব্যাধির হইল প্রকোপ, ছাইয়া ফেলিল দেশ,
মৃত্যু লভিল শত সহস্র ঘুচিল ভবের ক্লেশ !

(৬)

রামকৃষ্ণ সেবকের দল আনিল অন্ন-থালা
রাজার চিত্ত হইল আকুল দেখিয়া প্রজার জ্বালা ;
অনশন আর গুরু ঋণ ভার করেছে যাদেরে বিকল,
তাদের কণ্ঠে সেটেলমেণ্টে বাঁধিল জরিপ শিকল,
বর্ষে বর্ষে এমনি করিয়া মর্ম্মে মরেছি দহিয়া,
মাতা হ'য়ে এত সন্তানের দুঃখ কত দিন রব সহিয়া ;
বন্ধুর মত এসেছিলে তুমি ওহে সিন্ধু সুমহান্,
বক্ষে তোমার মিশায়ে আমায় করিতে শান্তি দান ;
আর কেন তবে যাও, হে সিন্ধু আর কেন ফিরে যাও,
তোমার বিশাল বক্ষে আমায় লুপ্ত করিয়া দাও।

শ্রীহরনাথ চক্রবর্ত্তী।

"সমবায়-সমিতি" (Co-operative Society)

ও

নোয়াখালীতে তাহার প্রচলন

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষি-প্রধান দেশ। এখানে শতকরা ৭৫ জন লোক কৃষিজীবী। তন্মধ্যে, ক্রুক সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, স্থানবিশেষে শতকরা ৫৬ হইতে ৭৮ জন কৃষক চিরঋণগ্রস্ত। শস্য-হানি (অজন্মা), বিবাহোৎসব, পিতৃকৃত্য-সম্পাদন, অমিতব্যয়িতা ও অজ্ঞানতাই তাহাদের ঋণের কারণ। বিশেষতঃ গ্রাম্য মহাজন যেরূপ সহজে সর্ব্বদা টাকা ধার দিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহাতে পরিণাম না ভাবিয়া ঋণ করতঃ সাময়িক সুখভোগেচ্ছ চরিতার্থ করা যে অন্যায় তাহা আমাদের কৃষকেরা ভাবেনা বা জানে না। ফলে 'সাহুকার' বা মহাজনের দ্বারে চিরতরে, এমন কি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে, তাহারা ঋণে আবদ্ধ থাকে। পরিশেষে সমস্ত বিক্রয় করিয়া মহাজনের ঋণ-পরিশোধে অগ্রসর হয়, নতুবা মহাজনা মকর্দ্দমা করিয়া কৃষকের বাস্তুভিটে ও যথাসর্ব্বস্ব নিজের করতলগত করে। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক শোচনীয় হইতে পারে না। আমাদের কৃষকদিগের দুরবস্থার বিষয় পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন—এ বিষয়ে অধিক বর্ণনা অনাবশ্যক।

গত শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবন্ধু স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ, দেশপূজ্য রানাডে, স্যার ফ্রেডরিক নিকলসন্ ও লর্ড ম্যাকডোনাল্ড্ প্রমুখ কতিপয় ভারতহিতৈষী মহাত্মা ভারতের কৃষকগণের এরূপ দুরবস্থা মোচনে কৃতসংকল্প হয়েন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, জর্ম্মণী, ইটালী ও ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশেও কৃষকেরা একদিন ভারতের কৃষাণের ন্যায় এমন চিরঋণগ্রস্ত ও চিরদুঃখী ছিল। তথায় সমবায়-সমিতি প্রচলিত হওয়ায় কৃষকদিগের অবস্থা ফিরিয়াছে; তাহারা আর এখন উচ্চসুদে টাকা ধার করেনা অথবা যাবজ্জীবন করজোড়ে মহাজনের দ্বারস্থ থাকে না; সমবায়ের ফলে তাহারা এখন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে। অতঃপর ভারতবর্ষেও উপরোক্ত মহাত্মগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতিতে ১৯০৪ সনের ১০ম আইন দ্বারা সমবায়-সমিতির আইন (Co operative Credit Act) বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। সমবায়-সমিতি ভারতের কৃষকের মহদুপকার সাধন করিতেছে এবং আমরা জানি, কৃষকের উপকার হইলেই ভারতের উন্নতি। ইহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায় ৬০০০০০ সভ্য ও ৫ কোটী টাকা মূলধন লইয়া অন্যূন ১২০০০ সমবায়-সমিতি ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সকল স্থানেই অনেক গ্রামে গ্রামে ইহার প্রচলন হইয়াছে। যেখানেই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, গ্রামের মহাজন আর তথায় অত্যধিক সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে সুযোগ পায়না বা গরীব কৃষকের সর্ব্বনাশ করিতে পারে না। হিসাব

করিয়া দেখা গিয়াছে, সমবায়-সমিতি হইতে টাকা ধার লইয়া এদেশের কৃষকেরা বৎসরে ২০০০০০০৲ টাকার পরিমাণ মহাজনের সুদের দাবী হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। ঐ পরিমাণ টাকা তাহারা বৎসরে নিজ তহবিলে জমা করিতেছে। ইহা বাস্তবিকই সৌভাগ্যের লক্ষণ।

নোয়াখালী সুজলা সুফলা হইলেও ভারতের অন্যান্য স্থানের কৃষকগণের ন্যায় এখানকার কৃষকের অবস্থাও নেহাৎ ভাল নহে। নোয়াখালীতে শতকরা বার্ষিক ৩৭॥০ হইতে ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদে মহাজন হইতে টাকা ধার লইতে হয়। প্রতিবৎসর ধান বা পাট বুনিবার সময় হইলে কৃষকেরা গ্রামের মহাজন হইতে ঐ হার সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়। আবার ধান বা পাট কাটিয়া ঐ টাকা পরিশোধ করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে প্রায় সকলেই ধার করিয়া থাকে। কিন্তু সকলেই জানেন, অভাগা কৃষক একবার যখন মহাজনের কাছে টাকা ধার করে, সমস্ত ঋণ সে কদাপি পরিশোধ করিতে পারেনা— ক্ষেত্রের উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়াও সে মহাজনকে সম্পূর্ণ চুকাইতে পারেনা— কিরূপে তাহার হিসাবে প্রতিবৎসর কিছু কিছু করিয়া টাকা বাকী পড়ে—অবশেষে মহাজন মহোদয় তাহার বসত বাটীখানি আত্মসাৎ করিয়া লন। আমার বিশ্বাস—এবং অন্যান্য স্থানে সমবায়-সমিতির কৃতকার্য্যতার কথা শুনিয়া আমার মনে হয়—নোয়াখালীতে যদি গ্রামে গ্রামে এরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে নোয়াখালীর কৃষকগণের অবস্থাও ফিরিবে। আবার তাহাদের দুধভরা বাটী ও 'সোনার থালা' ফিরিয়া আসিবে। ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা, মেদিনীপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জিলায় ঐরূপ বহুতর সমিতি স্থাপিত হইয়াছে—তাহা দেখিয়া আমাদের মনেও আশার সঞ্চার হইয়াছে। অতএব এ বিষয়ে আর বিশেষ না বলিয়া 'সমবায়-সমিতি' কি ও তাহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটী দুচারটী কথা বলিয়া এবারকার প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। আশা করি, দেশের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিমাত্রই এই হিতকর প্রথার প্রচলনে অগ্রগামী ও সহায়পর হইবেন।

যখন কয়েকজন বিশ্বস্ত ও সচ্চরিত্র কৃষিজীবী, শিল্পী বা ব্যবসায়ী লোক গবর্ণমেণ্টের আইনমত ও অনুমতি লইয়া সহরে বা গ্রামে টাকা জমা করিয়া পরে তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে অন্যকে ধার দিয়া তাহার সাহায্য করে, তখন তাহাদের সম্মিলনকে সমবায়-সমিতি (Co-operative Society) কহে। সমবায়-সমিতি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর (Amended Act of 1912), যথা (ক) সসীমদায়িত্বযুক্ত সমবায়-সমিতি (Limited liability); (খ) অসীমদায়িত্বপূর্ণ সমবায়-সমিতি (Unlimited liability). প্রথমোক্ত প্রকার সাধারণতঃ সহরে নানা ব্যবসায়ী লোকদ্বারা পরিচালিত হয়। মেম্বরগণ প্রত্যেকে শুধু নিজ নিজ অংশের পরিমিত টাকার (Share) জন্য দায়ী থাকে ও সুদ পায়। ইহার মূলধন (Capital) (খ) প্রকার সমিতির মূলধন হইতে সাধারণতঃ অনেক বেশী। ইহা (খ) প্রকার সমিতিকে শত শত টাকা কর্জ্জ দেয়, বড় বড় কারবার চালায় অথবা সহরের নানারূপ শিল্পোন্নতির সহায়তা করে। (খ) প্রকার সমবায়-সমিতি গ্রামে 'সমবায়', 'ধর্ম্ম-ভাণ্ডার', 'ব্যাঙ্ক' বা

'গ্রাম্য-ভাণ্ডার' নামে বঙ্গদেশে পরিচিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি ইহাকে 'সমবায়' নামে অভিহিত করিব।

১৯১৩-১৪ সনের রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, নোয়াখালীতে ৫৩৪৩২৲ টাকা মূলধন ও ৪২৯ জন মেম্বর লইয়া ৪টী সসীমদায়িত্বযুক্ত সমবায়-সমিতি (Urban and Central) আছে। আর (খ) প্রকারের অর্থাৎ অসীমদায়িত্বপূর্ণ গ্রাম্য সমবায়-সমিতির সংখ্যা মাত্র ৪২টী; মূলধন ৪৬৩২১৲ টাকা ও মেম্বর-সংখ্যা ১৩৭৫ জন। নোয়াখালীর মোট গ্রামের সংখ্যা ও তাহার লোক সংখ্যা বিবেচনা করিলে দেখা যায় প্রতি ৬৩ গ্রামে ও প্রতি ৩১০২৪ সংখ্যক লোকের জন্য একটী মাত্র গ্রাম্য সমবায়-সমিতি আছে। বস্তুতঃ ইহাতে অতি অল্প লোকেরই উপকার হইতেছে। অতএব কৃষকদিগকে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে নোয়াখালীতে ইহার আরও বহুল প্রচলন আবশ্যক। নোয়াখালীতে (খ) প্রকার সমবায়-সমিতির প্রচলন ও উপকারিতা প্রদর্শনই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অসীমদায়িত্বপূর্ণ সমবায়-সমিতি।

ইহাই সাধারণতঃ গ্রামে প্রচলিত এবং কৃষিজীবিগণ দ্বারা পরিচালিত। কয়েকজন মিলিয়া এরূপ সমবায় স্থাপন করিলে খুব অল্প সুদে ইহা হইতে টাকা ধার করা যায় ও অপরকে ধার দেওয়া যায়—গ্রামের মহাজনের দৌরাত্ম্য হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। [সমবায়ে টাকাপ্রতি মাসিক ৫ পয়সার অধিক সুদ লওয়া নিষিদ্ধ সমবায়ে যখন ইচ্ছা তখন টাকা পাওয়া যায়; কারণ কিছু টাকা সমবায়ে সকল সময়েই জমা থাকে। গ্রামে টাকা নিরাপদে জমা রাখিবার জন্য কোনরূপ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক নাই অথবা এমত বিশ্বস্ত লোক অল্পই পাওয়া যায়, যাঁহার নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়। কিন্তু কোথাও সমবায় প্রতিষ্ঠা করিলে শুধু যে তাহাতে নিরাপদে টাকা গচ্ছিত রাখা যায় এমন নহে, তাহাতে বেশ দুপয়সা সুদও পাওয়া যায়।

সমবায়ের আবশ্যকতা

এরূপ সমবায় খুলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হয় ও আইনমত সমবায় রেজেষ্ট্রী করিতে হয়। রেজেষ্ট্রী করিতে কোন পয়সা লাগে না। দশজন না মিলিলে সমবায় খোলা যায়না। তাহাদের প্রত্যেকের ১৮ বৎসরের অধিক বয়স হওয়া দরকার। তাহারা একই গ্রাম বা তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী হইবে; অথবা তাহারা একই জাতি বা সম্প্রদায় বা একই ব্যবসায়ী লোক হইবে। অতএব দেখা যায়, সমবায় খুলিতে বিশেষ কিছু বাধা বিপত্তি হয়না। ঐরূপ দশজন লোক একত্র হইয়া কো-অপারেটীভ রেজিষ্ট্রারের নিকট

কিরূপে সমবায় খুলিতে হয়?

দরখাস্ত করিলে অতি সহজেই অনুমতি পাওয়া যায়। কারণ গবর্ণমেণ্ট প্রজার উপকারার্থ ঐরূপ সমবায় স্থাপনে সতত বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।

তারপর ইহার মূলধন। প্রথমতঃ যে দশ বা ততোধিক লোক সমবায় স্থাপন করেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কেহ কেহ কিছু টাকা সমবায়ের ফণ্ডে জমা দিতে পারেন (deposit of Members) [কো-অপারেটীভ্ আইনমত সমবায়ে জমা টাকা (Share) অন্য কোন ঋণের জন্য ক্রোক দেওয়া যায়না—Exemption from attachment for private debts] তৎপর যে কেহ সমবায় হইতে টাকা ধার নেয়, তাহাকে ইহার মেম্বর হইতে হয়। তজ্জন্য তাহাকে কিছু ভর্ত্তির ফিস দিতে হয় (Entrance fees of members). ইহা সমবায়ের মূলধনবৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায়। তৃতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট অনেক সময় এরূপ সমবায়ে টাকা ধার দিয়া থাকেন (Loans from Government). কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই দশ বা ততোধিক লোক সহরের কোন সমবায় হইতে (Central Bank) বা অন্য কাহারও নিকট হইতে অনেক টাকা অল্প সুদে কর্জ্জ লইয়া আসে এবং গ্রামে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক সুদে নিজের টাকা কর্জ্জ নেয় ও অন্যান্য প্রার্থিগণকে কর্জ্জ দিয়া থাকে। [সহরের সমবায় সমিতি হইতে সাধারণতঃ শতকরা বার্ষিক ৯।১০৲ টাকা সুদে টাকা পাওয়া যায়] অতএব দেখা যায়, সমবায়ের মূলধন সংগ্রহেও বিশেষ কষ্ট নাই। কারণ, কোন ব্যক্তি বিশেষকে একাকী কেহ সহজে টাকা ধার দিতে স্বীকৃত হয়না সত্য; কিন্তু যখন দশ বা ততোধিক লোক একত্র হইয়া ধার নিতে রাজী হয়, তখন অনেকেই অল্প সুদে টাকা ধার দিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করে না। [উৎসুক পাঠক হয়ত এস্থলে প্রশ্ন করিবেন—আমি অপর নয়জনের সঙ্গে একত্র মিলিয়া টাকা আনিয়া দায়ী হইব কেন? সমবায় টিকিলে ও আমাদের কর্জ্জ দেওয়া টাকা সুদ সহ উশুল করিতে পারিলে, তবে ত আমাদের এই একত্র দায়িত্বের ভয় চলিয়া যাইবে—তাহার গ্যারাণ্টি কি? পাঠক কিঞ্চিৎ নিম্নে ইহার সন্তোষজনক উত্তর পাইবেন] তারপর, অন্য এক উপায়েও মূলধনবৃদ্ধি হইতে পারে। সমবায় কিছুদিন চলিলেই যখন ইহার অনেক মেম্বর দেখা যায়, যখন অনেকে টাকা নিতে ও দিতে থাকে, তখন গ্রামে যাহাদের টাকা সিন্দুকে অনর্থক পড়িয়া আছে, তাহা তাহারা ঐ সমবায়ে জমা দিয়া রাখে ও তাহার জন্য বার্ষিক একটা সুদ পাইয়া থাকে। নিজেরা হাঙ্গামা না করিয়া সমবায়ের হাত দিয়া টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহাদের কষ্ট-সঞ্চিত ধনকে তাহারা নিরাপদ মনে করে। বলা বাহুল্য, সমবায়ের মূলধন সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে বা অন্য কোন ব্যাঙ্কে বা রেজিষ্ট্রারের অনুমোদিত কোন লোকের নিকট বা নিজেদের নির্ব্বাচিত কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখা হয়।

সমবায়ের মূলধন কোথা হইতে আসে?

মূলধন ঠিক হইয়া গেলেই সমবায় হইতে টাকা কর্জ্জ দেওয়া আরম্ভ হয়। সুদের হার খুব কম—তাহা মেম্বরগণ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া নিজেরাই ঠিক করিয়া থাকে

(bye-law). সুদ সাধারণতঃ টাকা প্রতি মাসিক ৫ পয়সা; কিন্তু সমবায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুদের হারও কমাইতে হয়। মেম্বরগণ প্রতিবৎসর সভা করিয়া তাহাদের একজনকে সম্পাদক, একজনকে সভাপতি ও নিজেদের মধ্য হইতে পাঁচ বা ততোধিক লোক লইয়া এক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি (Council of Management) বা 'পঞ্চায়েৎ' নির্ব্বাচন করে। সমবায়ের কার্য্যক্ষেত্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একজন বেতনভোগী কেরাণী ও পিয়ন নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কার্য্যারম্ভে ইহাদের দরকার হয়না—সবকাজ মেম্বরগণই করিয়া থাকেন। তদ্দরুণ তাহারা কোন বেতন পায়না। কিন্তু বৎসরান্তে মেম্বরগণ ইচ্ছা করিলে সম্পাদককে কিছু টাকা পারিশ্রমিক দিলেও দিতে পারে। কর্জ্জপ্রার্থিগণকে সমবায়ে দরখাস্ত করিতে হয়। গ্রামের বা বিশেষ পরিচিত না হইলে কোন লোককে টাকা কর্জ্জ দেওয়া নিষিদ্ধ। মেম্বরগণ যে কেহ, এমনকি 'পঞ্চায়েৎ' গণ ও সমবায় হইতে টাকা ধার নিতে পারেন। সমবায়ের মূলধন মেম্বরদিগের সকলের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। সুতরাং কর্জ্জপ্রার্থীদের অবস্থা টাকা কর্জ্জ দেওয়ার পূর্ব্বে 'পঞ্চায়েৎ'গণ খুব ভাল করিয়া অনুসন্ধান করেন। কি জন্য টাকা কর্জ্জ নেওয়া হয়, টাকা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, জামিন কিরূপ, এ সকল পূর্ব্বে অবগত হইতে হয়। তৎপর সমবায়ের সভা হয়। কর্জ্জ দেওয়ার উপযুক্ত পাত্র, ও কাহাকে কত দেওয়া যাইতে পারে তাহা স্থিরীকৃত হয়।

সমবায়ের কার্য্য-প্রণালী

অতঃপর টাকা কর্জ্জ নেওয়ার কালেও বিশেষ কোন কষ্ট নাই। সমবায়ের বহিতে সহি করিয়া টাকা আনিতে পারা যায়। দলিল হইলেও কোন ষ্ট্যাম্প লাগেনা বা তাহা রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে কো-অপারেটীভ্ আইনমত কোন রেজেষ্ট্রী খরচ দিতে হয়না। সমবায়ের টাকার উপর কোন ইনকাম ট্যাক্স চলেনা। যখন যাহা সুদ দেওয়া হয়, সমবায়ের বহিতে লিখাইতে হয় অথবা নিজের পাশবুকে জমা করিয়া আনিতে হয়। টাকা আপোষেই সাধারণতঃ আদায় হইয়া থাকে--নতুবা বহি দাখিল করিয়া নালিশ করিলেই আইনমত তৎক্ষণাৎ (On prima facie evidence) ডিক্রি মঞ্জুর হয়। কোন ওজর আপত্তি বা শঠতা খাটেনা; দিনের পর দিন ঘুরাঘুরি করিতে হয়না। তারপর টাকা আদায়ের কালে সমবায়ের টাকা পরিশোধ না হইতে খাজনার জন্য ব্যতীত অন্য কেহ ডিক্রি দ্বারা কর্জ্জগ্রহীতার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেনা—(Priority of claim over ordinary creditors) অর্থাৎ সমবায়ের দাবী সকলের অগ্রগণ্য।

টাকা দেওয়ার ও আদায়ের বিশেষ সুবিধা

এ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ লাভ নাই। মেম্বরগণের এখানে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন। কেবলমাত্র লোকের উপকারের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া কতকগুলি কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। এবং সমবায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য মেম্বরদিগকে নানারূপ সুবিধা প্রদান করিয়া থাকেন। এই বিভাগেও গবর্ণমেণ্টের

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য

বিভিন্ন কর্ম্মচারী আছেন। ইনস্পেক্টর প্রায়ই মাসে মাসে গ্রামে আসিয়া হিসাবপত্র দেখিয়া যান—যেন কোনরূপ তছরূপ না হইতে পারে, এবং সমবায়ের কোনরূপ গণ্ডগোল দেখিলে দরকার বোধ করিলে সমবায় উঠাইয়া দিতে পারেন। মেম্বরগণের মধ্যে বিশেষ মত-বৈষম্য হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা মিটাইয়া দেন। সমবায় পরিচালনের জন্য স্থানবিশেষে যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হয় (bye-laws) তাহার সকলই গবর্ণমেণ্টের অনুমতিসাপেক্ষ।

বৎসরান্তে লাভের টাকা হইতে মূলধনের বার্ষিক সুদ, ডিপজিটরের সুদ ও খরচ পত্র বাদ যাইয়া যাহা থাকে (Net profits) তাহা কো-অপারেটিভ্ আইনমত "রিজার্ভ ফণ্ড" (Reserve Fund) নামক এক ফণ্ডে স্বতন্ত্র জমা রাখিতে হয়। এদিকে রিজার্ভ ফণ্ড বৎসরের পর বৎসর বাড়িতে থাকে এবং মেম্বরগণ তখন ইচ্ছা করিলে তদ্দরুণ সুদের হার আরও কমাইয়া দিতে পারেন। রিজার্ভ ফণ্ডও মেম্বর-দিগের সাধারণ সম্পত্তি। ইহার টাকা দ্বারা অনেক সময় স্কুল ও হাসপাতালাদি জনহিতকর কার্য্যে বাৎসরিক বা এককালীন সাহায্য করা হয়। রিজার্ভ ফণ্ডে টাকা থাকিলে একত্র দায়িত্বের জন্য মেম্বরগণের ভয় থাকে না। কাহারও নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে না পারিলে, রিজার্ভ ফণ্ড বর্ত্তমান থাকিতে সমবায়ের লোকসানের কোনরূপ ভাবনা হয় না। কালক্রমে রিজার্ভ ফণ্ড হইতে টাকা উঠাইয়া লইয়া সমবায়ের আদত মূলধন বৃদ্ধি করা যায়। সসীমদায়িত্বযুক্ত সমবায় সমিতিতে লাভের কতেক অংশ মেম্বরদিগকে (Shareis) বার্ষিক ডিভিডেণ্ট (divident) দেওয়া যায়।

লাভের টাকা কি করা হয়?

পাঠক জানেন, সমবায় স্থাপন সময়ে দশ বা ততোধিক লোক একত্রে টাকা ধার করিয়া সমিতির মূলধন গড়িয়াছে। এবং তাহা অংশতঃ পরে কম সুদে অনেককে ধার দেওয়া হইয়াছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যেখানে কর্জ্জ দেওয়া টাকা ফিরিয়া পাওয়া যায় না, সেখানেই একত্র ও অসীম দায়িত্বে (unlimited liability) ভয় আছে। কিন্তু সমবায়ে তদ্রূপ কোন ভয় নাই। যেহেতু টাকা দেওয়ার কালে টাকা আদায় হইবে কিনা, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হয় এবং তাহা সম্পূর্ণ 'পঞ্চায়েতে'র হাতে নির্ভর করে। তার পর দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি এত অল্প সুদেও আপোষে টাকা আদায় না হয় তবে কোর্টের সাহায্যে টাকা আদায় করিবার জন্য—আমরা জানি—গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এমতাবস্থায় টাকা আদায় হইবার ভয় আছে, বলিলে চলিবে কেন? দ্বিতীয় ভয়, যদি টাকা কোনরূপ তছ্রূপ হয়। গবর্ণমেণ্ট মাসে মাসে ইনস্পেক্টর পাঠান, টাকা পয়সা রাখিবার ও খরচ করিবার বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন—সমবায়ের কাজকর্ম্ম নিজেদের দায়িত্ব মনে করিয়া সকলের একযোগে করিতে হয়—এ সব ভাবিলে সমবায়ের স্থিতি ও উন্নতি বিষয়ে কোন ভয়ের কারণ নাই, বলিতেই হইবে। ভালরূপে কাজ চালাইতে পারিলে অল্প দিনের মধ্যেই সমবায়ের মূলঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায়—সমবায় নিজের পায়ে দাড়াইতে সক্ষম হয়। সমবায়ের উন্নতির জন্য মেম্বরদিগের

অসীম ও একত্র দায়িত্বে ভয় কি?

প্রধানতঃ দুইটী গুণ থাকা অত্যাবশ্যক—(১) বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য-ক্ষমতা (যথা টাকা ধার দেওয়া) ; (২) বিশ্বাস। বস্তুতঃ পাড়া-প্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধব যাহাদিগকে লইয়া সমবায় গঠিত করা হয়, তাহাদের মধ্যে সমবায়ের জন্য যতটা বিশ্বাস দরকার, তাহা গ্রামে নানা কাজে আমরা নিত্য যথেষ্ট পরিমাণেই দেখিতে পাই। ভারতের গ্রামে গ্রামে এরূপ সাহায্য বা সম্মিলনের কোন অভাব নাই। অন্যান্য কাজের ন্যায় এই সমবায়-গঠনেও পরস্পর পরস্পরের একটু সহায়তা করিলে ইহার উন্নতি সুনিশ্চিত। আশা করি, 'কো অপারেটীভ্' বা 'সমবায়' এই নূতন নামে কেহ ঐরূপ সম্মিলিত কার্য্যে চমকিত হইবেন না।

সমবায়-সমিতি স্থাপনে যে কৃষিজীবীরা শুধু অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পায় ও মহাজনের ঘর হইতে মুক্তি পায় তাহা নহে, ইহা দ্বারা আরও নানাপ্রকার উপকারিতা লাভ হয়। অনেক কৃপণের ধন সমবায়ের হাতে সুদে খাটিতেছে—অনেক সঞ্চিত ধন ঘরের বাহির হইয়া পরোপকার করিতেছে। কৃষকেরা আবশ্যকমত টাকা পাইতেছে। তদ্দ্বারা তাহারা সময়ে ভাল বীজ, সার, কৃষি-যন্ত্রাদি ও গরু বাছুর কিনিতে সক্ষম হওয়ায় কৃষি কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। সমবায়ের কৃপায় কোনবার ফসল না হইলে ৫ মাইল দৌড়িয়া ।/০ আনা সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে এখন আর গ্রামান্তরে যাইতে হয় না। সমবায় গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। কারণ সমবায়ের সহিত আদান প্রদান করিতে হইলেই মেম্বরদিগকে সামান্য হিসাব বুঝা, সমবায়ের পাশবুক পড়া, ও ইহার প্রোনোট (Pro note) দস্তখত করিতে জানিতে হয়। বিশেষতঃ সমবায় আমাদের নৈতিক উন্নতি পথে এক বিশেষ সহায় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, সমবায়ের মেম্বর না হইলে টাকা কর্জ্জ মিলেনা এবং মেম্বর হইতে হইলেই সর্ব্বাগ্রে সচ্চরিত্র হওয়া দরকার ; নতুবা চোর, মদ্যপ প্রভৃতি বদমায়েস লোককে কেহ কোনদিন টাকা দেয় না। সমবায়ের সহিত কারবার করিতে হইলে সময়ে টাকা পরিশোধ করা (punctuality), সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণ থাকা আবশ্যক। গ্রামে সমবায় থাকিলে লোকে মিতব্যয়ী হইয়া তথায় কিছু টাকা ডিপজিট্ রাখিতে চেষ্টা করে। সমবায়ের রিজার্ভ ফণ্ড্ হইতে নূতন স্কুল স্থাপন, ছাত্রদিগকে বৃত্তি দান, পুষ্করিণী খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ, কুইনাইন বিতরণ প্রভৃতি হিতকর কাজ করা হয়। সমবায়ের মেম্বরগণের মধ্যে মামলা মকর্দ্দমা প্রায়ই সালিশ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এরূপে সমবায় হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের প্রত্যেক কাজেই একটা Co-operation বা ঐক্যভাব দেখা যায়। সমবায় ভারতের আবার সরল সত্য গ্রাম্য জীবন ফিরাইয়া আনিবে ও আমাদের গ্রাম্য লুপ্ত হস্ত-শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন করিবে, অনেকে ইহা আশা করিতেছেন।

সমবায়ের বহুল উপকারিতা

সমবায়সমিতি নানাপ্রকার। উপরে মাত্র ঋণদান সমবায়-সমিতির (Co-operative Credit Society) উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সমবায় দ্বারা অন্যান্য নানাবিধ কার্য্য সম্পন্ন হয়। পাবনা জিলায় ভারেঙ্গা গ্রামে তাঁতীদের এক সমবায় আছে (Co-operative

weavers' Bank) তাহারা সমবায়ের মূলধন দ্বারা পাইকারী দরে সূতা কিনিয়া কাপড় বুনে ও তাহা বিক্রয় করিয়া আবার মূলধন পরিশোধ করে। বেনারস জিলায় রঘুবীর মুচীদিগের এক সমবায় (Raghubir Shoe-makers' Society) আছে। সমবায়ের মূলধন হইতে তাহারা পাইকারী দরে চামড়া কিনিয়া সমবায়ের মেম্বরদিগের মধ্যে ঐ চামড়া সস্তায় বিক্রয় করে। তাহাতে তাহাদের বিশেষ লাভ হয়। ঢাকায় দুগ্ধ বিক্রীর জন্য এক সমবায় (Dacca Co-operative Dairy Society) আছে। ইহার প্রায় ১০টী শাখা। ঢাকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক্ হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া গোয়ালারা গাভী ক্রয় করে, আবার দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা শোধ করিয়া থাকে। ঢাকা সহরের অধিকাংশ দুগ্ধ এই সমবায় দ্বারা আমদানী হয়। সমবায়ের শাসনফলে ঐ দুগ্ধে প্রায় ভেজাল থাকে না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে রায় বেরিলীতে ফল বিক্রেতাদিগের ও মুদীদিগেরও সমবায় (Grocer's Society and fruit-Seller's Society of Rai Bareilly) আছে। নোয়াখালী ও কুমিল্লায় কাপড়াদি আবশ্যকীয় জিনিস সস্তায় ক্রয় বিক্রয়ের নিমিত্ত সমবায় (Co operative Stores) আছে।

সমবায় বিভিন্ন প্রকার

এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মগোলা (ধানের গোলা—Co-operative Grain Banks) নামে আর এক প্রকার সমবায়সমিতি আছে। ঢাকা জিলায় তেওতা গ্রামের ধর্ম্মগোলা সুপ্রসিদ্ধ। অনেক সময় দেখা যায় কৃষকের ঘরে প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য সঞ্চিত থাকে ও মূর্খ কৃষক টাকার লোভে পড়িয়া অল্প মূল্যে ঐ শস্য বিক্রয় করিয়া ফেলে। গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা স্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, স্বাচ্ছন্দ্যের কালে কৃষকেরা তাহাতে শস্য ডিপজিট রাখিবে, পরে অভাব দিনে অল্প সুদে তাহা হইতে ধান ধার লইয়া সহজে বিপদ কাটাইবে; আবার সময়মত সুদসহ ঐ ধার শোধ করিয়া গ্রামের উপকারার্থ গোলা পূর্ণ করিয়া রাখিবে। বলা বাহুল্য, এরূপ সমবায় প্রথা কৃষকদিগের বিশেষ উপকারী। জমিদারগণ ও গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ধর্ম্ম গোলা

অসীমদায়িত্বপূর্ণ সমবায় সমিতি সম্বন্ধে মোটামুটী কতকগুলি কথা বলিলাম। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শাসনকালে ভারতে অনেক বিদেশী প্রথার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। কিন্তু সমবায়-সমিতি বিদেশী আমদানী হইলেও ইহার প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে ইহার যেরূপ অত্যদ্ভূত উন্নতি দেখা যাইতেছে, এরূপ কোন দেশে দেখা যায় নাই। সমবায় চালাইতে বিশেষ ইংরাজী বা বাঙ্গালা বিদ্যার দরকার হয় না। আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে অনেক লোক আছেন যাহারা বেশ একটু লেখা পড়া জানেন, অথচ বিশেষ কোন কাজকর্ম্ম করিতেছেন না। তাঁহারা গ্রামে সমবায় গঠন করিয়া বাস্তবিকই দেশের ও দশের উন্নতি করিতে পারেন। মহাজনের অমানুষিক উৎপীড়ন, গরীব কৃষকের চিরঋণ ও শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা মনে করিয়া স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই হিতকর কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত।*

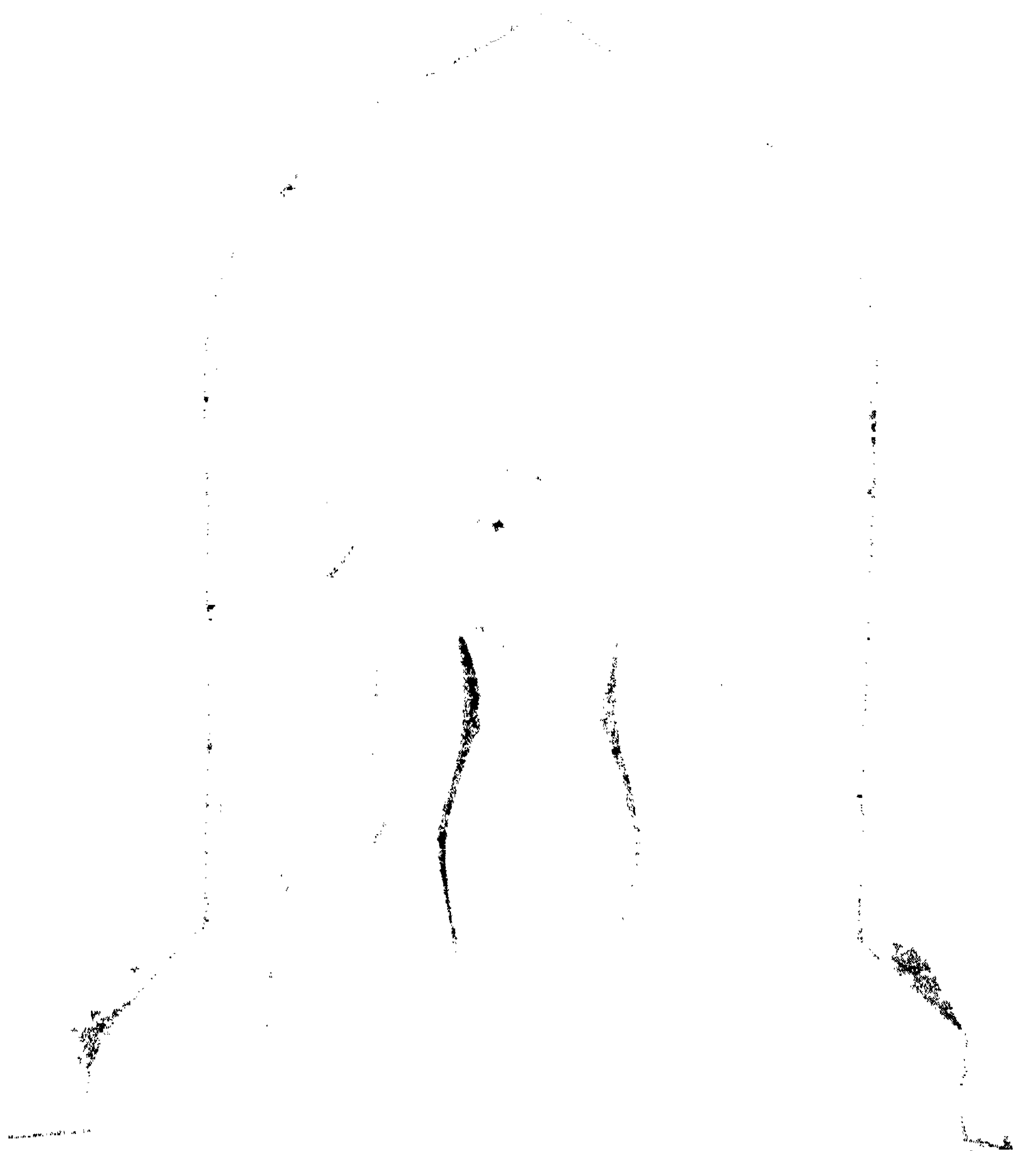
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী।

* "কো-অপারেটীভ্ সোসাইটী" স্থাপন সম্বন্ধে নোয়াখালীর কেহ কোন সংবাদ বিস্তারিত জানিতে চাহিলে, "নোয়াখালীর" কার্য্যাধ্যক্ষ তাহা সাদরে জানাইবেন।

'বিরিঞ্চি'র বাসুদেবমূর্ত্তি

নোয়াখালি জেলায় ফেণি মহকুমা, আসাম-বঙ্গ রেলপথের চট্টগ্রাম-শাখার মধ্যপথে অবস্থিত। উক্ত মহকুমার এক মাইল উত্তরে, বিরিঞ্চিনামক গ্রামে, আমিরাবাদ ও বেদারাবাদ পরগণার প্রধান জমিদারী-কাছারী বর্ত্তমান। বিরিঞ্চি-কাছারীতে একটি বাসুদেব-বিগ্রহ স্থাপিত আছে; কথিত আছে যে, ফেণির সন্নিহিত মুহুরী নদীতে জনৈক ধীবর এই মূর্ত্তিটি প্রথম প্রাপ্ত হয় এবং বিরিঞ্চি-কাছারীতে স্থাপিত করে। তখন উক্ত জমিদারী, ত্রিপুরারাজের অধীন ছিল; সুতরাং, আড়ম্বরের সহিত বিগ্রহটির পূজানির্ব্বাহ হইত। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট গ্রামের উপস্বত্ব হইতে বিগ্রহের পূজার্চ্চনার ব্যয়সঙ্কুলন হইত। ১২৩৭ সালে এই জমিদারী Alfred Courjon নামক জনৈক সাহেবের হস্তগত হয়, এবং তদবধি বিগ্রহের সেবাকার্য্যে অযত্ন হইতে আরম্ভ হয়। ১২৯১ সালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ লাহা-রাজবংশ জমিদারীর মালীক হ'ন। তাহার কিছুকাল পর, লেমুয়া তহসিল কাছারীর সন্নিকটস্থ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর চক্রবর্ত্তী সেবার সুবন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায়ে, মূর্ত্তিটিকে নিজ বাড়ীতে স্থানান্তরিত করেন। কথিত আছে যে, পক্ষ মধ্যেই তিনি, স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া, মূর্ত্তিটি স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি মূর্ত্তিটি বাসুদেব নামে অভিহিত হইয়া, বিরিঞ্চি-কাছারীতেই এক ক্ষুদ্র টিনের ঘরে রক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে। এপর্য্যন্ত বিগ্রহটির কথা বর্ত্তমান জমিদারগণের কর্ণগোচর হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয় না। ভারতীয় তক্ষণ-শিল্পের এরূপ একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও প্রাচীন নিদর্শন তাঁহাদের মফস্বলের কাছারী-বাড়ীতে রক্ষিত আছে, ইহা তাঁহাদের শ্লাঘার বিষয় বটে। আশা করা যায়, রাজবংশের বর্ত্তমান কর্ত্তৃস্থানীয় মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা বাহাদুর এই মূর্ত্তিটির বিষয় অবগত হইলে, ইহার বর্ত্তমান দুরবস্থার অপনোদন হইবে, এবং এই মূর্ত্তিটিকে কেন্দ্র করিয়া, স্থানীয় হিন্দুদিগের সামাজিক এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি সজীবতা লাভ করিবে।

হিন্দুবিদ্বেষী যবন-সেনাপতি কালাপাহাড়ের কৃপায় পূর্ব্ববঙ্গে 'নাককাটা বাসুদেব' প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বিরিঞ্চির বিগ্রহটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা সম্পূর্ণ অক্ষতাঙ্গ। কিংবদন্তী এই যে, কালাপাহাড়ের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার নিমত্তই মূর্ত্তিটিকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। বিগ্রহটির অপর বিশেষত্ব— ইহার চালচিত্রে বিষ্ণুর দশাবতারের মূর্ত্তির পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে দশাবতারের মূর্ত্তি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটী দেখিলে মনে হয়, যেন এইমাত্র শিল্পীর হস্ত হইতে উৎকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। মূর্ত্তিটীতে কোন সন তারিখ নাই। পাদপীঠের নীচেও প্রস্তর খণ্ডের কিয়দংশ এরূপ ভাবে ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে যে, দেখিলে স্পষ্টতঃই অনুমিত হয়, পাদপীঠটি একটি স্তম্ভের সহিত সংলগ্ন ছিল। মূর্ত্তিটী ধূসরবর্ণ মসৃণ একখণ্ড সমগ্র স্লেট-প্রস্তরনির্ম্মিত; দুই ফিট প্রস্থ এবং পাদপীঠ হইতে চারিফিট উচ্চ। মধ্যে বিষ্ণু, দক্ষিণে শ্রী বা লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী। বিষ্ণু



ফেণীর সন্নিকট বিরিঞ্চিতে বাসুদেব মূর্ত্তি।

C. P. Ld , Calcutta.

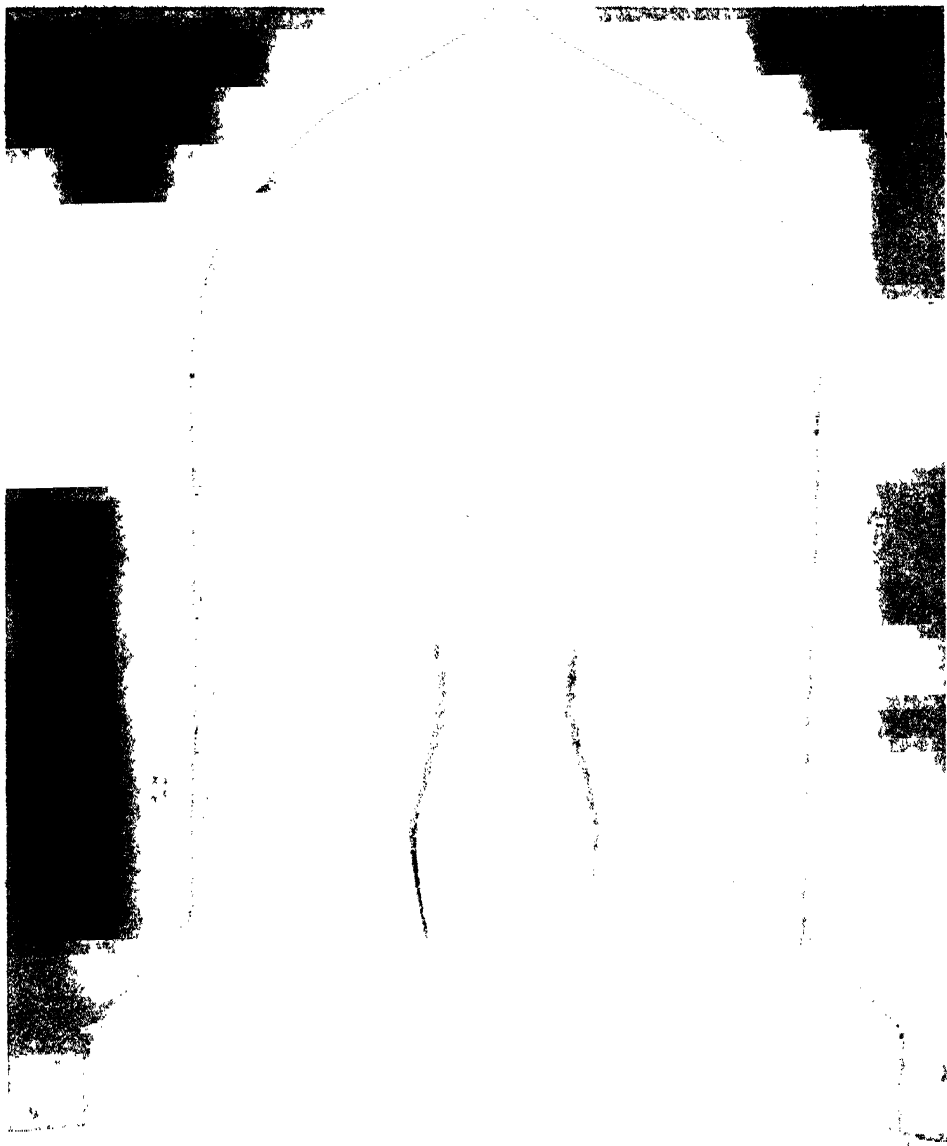
বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান, নিম্নে যুগ্মপাণি পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যাকৃতি গরুড়। পাদপীঠের দক্ষিণে নতজানু রমণীযুগল করযোড়ে স্তব করিতেছে, বামে পূজোপকরণহস্তে অপর রমণী উপবিষ্টা। পাদপীঠস্থ শতদলের উভয়দিকে দুটি মৃণাল উত্থিত হইয়াছে, তাহার বৃন্তে দুটী অর্দ্ধস্ফুট কোরক, তদুপরি বিষ্ণুর নিম্নহস্তযুগল সংন্যস্ত। জানুর নিম্নভাগে মনোহর বনমালা বিলম্বিত। মধ্যভাগের উভয়পার্শ্বে অশ্বমুখকিন্নর নিষণ্ণকরিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। তদুপরি মকর, মকরপৃষ্ঠে যক্ষিণী আরূঢ়া, তাহার অধোদেশ পক্ষ-আকৃতি, উর্দ্ধদেশ নারীর আকৃতি। মূর্ত্তিটির শিরোভাগের দক্ষিণদিকে, বিচিত্র লতাবল্লীর মধ্যে, মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্ম, নৃসিংহ ও বামন মূর্ত্তি;—বামদিকে পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধদেব ও অশ্বারূঢ় কল্কিমূর্ত্তি। প্রত্যেকের হস্তে যথাযোগ্য প্রহরণ বর্ত্তমান, এবং পুরাণোক্ত বর্ণনার সহিত তাহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। সর্ব্বোপরি মাল্যহস্তে উড্ডীয়মানা অপ্সরাযুগল। সৌম্যদর্শন দেবমূর্ত্তির শিরে বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুদ্বয়ে কেয়ূর, হস্তে বলয়, গলদেশে বিচিত্র মাল্য ও মণিরত্নখচিত কণ্ঠহার, বক্ষে কৌস্তুভমণি, তদুপরি দীর্ঘ যজ্ঞসূত্র বিলম্বিত। কটিদেশে কৌপীন তদুপরি মনোহর বহির্বাস। পদদ্বয়ে নূপুর। মূর্ত্তিটী চতুর্ভুজ। দক্ষিণদিকের প্রথম হস্তে গদা, দ্বিতীয় হস্তে পদ্ম, বামদিকের প্রথম হস্তে চক্র, দ্বিতীয় হস্তে শঙ্খ। কিরীটের উর্দ্ধদেশে, কীর্ত্তিমুখের স্থলে ছত্র। বিষ্ণু সমভঙ্গাসনে, এবং পার্শ্বচারিণী লক্ষ্মী ও সরস্বতী ত্রিভঙ্গাকৃতিতে কমলাসনে দণ্ডায়মান। সরস্বতী বীণাবাদনরতা, শ্রীর দক্ষিণ হস্তে বরাভয়মুদ্রা প্রকটিত। উভয়মূর্ত্তি সাভরণা। মূলমূর্ত্তির হস্তচতুষ্টয়ে গদাপদ্মশঙ্খচক্রস্থাপনের ক্রমানুসারে মূর্ত্তিটিকে অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণ বর্ণিত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তির অন্তর্গত ত্রিবিক্রম ও সিদ্ধার্থসংহিতাবর্ণিত উপেন্দ্র-সংজ্ঞক বলা যাইতে পারে। কালিকাপুরাণে বাসুদেব-মূর্ত্তির যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিতও বর্ত্তমান মূর্ত্তিটির প্রভূত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যথা—

"পূর্ণচন্দ্রোপমঃ শুক্লঃ পক্ষিরাজোপরিস্থিতঃ।
চতুর্ভুজঃ পীতবস্ত্রৈস্ত্রিভিঃ সংবীতদেহভৃৎ।
দক্ষিণোর্দ্ধে গদাং ধত্তে তদধো বিকচাম্বুজং।
বামার্দ্ধে চক্রমত্যুগ্রং ধত্তেহধঃ শঙ্খমেবচ।
শ্রীবৎসবক্ষাঃ সততং কৌস্তুভং হৃদি চাদ্ভুতম।

*　　*　　*　　*

"শীর্ষে কিরীটং সদ্যোতং কর্ণয়োঃ কুণ্ডলদ্বয়ম্।
আজানুলম্বিনীং চিত্রাং স্বর্ণমালাং গলস্থিতাম্।
দধান দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রতম্।
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ্ বরদং হরিম্।"

পাষাণনির্ম্মিত এই বিগ্রহটির পরিকল্পনা অতীব সুন্দর। মূর্ত্তিটির প্রশান্ত বদনমণ্ডলে স্বর্গীয় সুষমা পরিব্যাপ্ত। পার্শ্বচারিণী দেবীযুগলের মহিমামণ্ডিত মুখশ্রীতে নারীসুলভ



ফেণীর সন্নিকট বিরিঞ্চিতে বাসুদেব মূর্ত্তি।

C. P. Ld , Calcutta.

বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান, নিম্নে যুগ্মপাণি পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যাকৃতি গরুড়। পাদপীঠের দক্ষিণে নতজানু রমণীযুগল করযোড়ে স্তব করিতেছে, বামে পূজোপকরণহস্তে অপর রমণী উপবিষ্টা। পাদপীঠস্থ শতদলের উভয়দিকে ছুটি মৃণাল উত্থিত হইয়াছে, তাহার বৃন্তে দুটী অর্দ্ধস্ফুট কোরক, তদুপরি বিষ্ণুর নিম্নহস্তযুগল সংন্যস্ত। জানুর নিম্নভাগে মনোহর বনমালা বিলম্বিত। মধ্যভাগের উভয়পার্শ্বে অশ্বমুখকিন্নর নিষণ্ণকরিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। তদুপরি মকর, মকরপৃষ্ঠে যক্ষিণী আরূঢ়া, তাহার অধোদেশ পক্ষ-আকৃতি, উর্দ্ধদেশ নারীর আকৃতি। মূর্ত্তিটির শিরোভাগেব দক্ষিণদিকে, বিচিত্র লতাবল্লীর মধ্যে, মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্ম, নৃসিংহ ও বামন মূর্ত্তি;—বামদিকে পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধদেব ও অশ্বারূঢ় কল্কিমূর্ত্তি। প্রত্যেকের হস্তে যথাযোগ্য প্রহরণ বর্ত্তমান, এবং পুরাণোক্ত বর্ণনার সহিত তাহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। সর্ব্বোপরি মাল্যহস্তে উড্ডীয়মানা অপ্সরাযুগল। সৌম্যদর্শন দেবমূর্ত্তির শিরে বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুদ্বয়ে কেয়ুর, হস্তে বলয়, গলদেশে বিচিত্র মাল্য ও মণিরত্নখচিত কণ্ঠহার, বক্ষে কৌস্তুভমণি, তদুপরি দীর্ঘ যজ্ঞসূত্র বিলম্বিত। কটিদেশে কৌপীন তদুপবি মনোহর বহির্বাস। পদদ্বয়ে নূপুর। মূর্ত্তিটী চতুর্ভুজ। দক্ষিণদিকের প্রথম হস্তে গদা, দ্বিতীয় হস্তে পদ্ম, বামদিকের প্রথম হস্তে চক্র, দ্বিতীয় হস্তে শঙ্খ। কিরীটের উদ্ধদেশে, কীর্ত্তিমুখেব স্থলে ছত্র। বিষ্ণু সমভঙ্গাসনে, এবং পার্শ্বচারিণী লক্ষ্মী ও সরস্বতী ত্রিভঙ্গাকৃতিতে কমলাসনে দণ্ডায়মান। সরস্বতী বীণাবাদনরতা, শ্রীর দক্ষিণ হস্তে বরাভয়মুদ্রা প্রকটিত। উভয়মূর্ত্তি সাভরণা। মূলমূর্ত্তির হস্তচতুষ্টয়ে গদাপদ্মশঙ্খচক্রস্থাপনের ক্রমানুসারে মূর্ত্তিটিকে অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণ বর্ণিত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তির অন্তর্গত ত্রিবিক্রম ও সিদ্ধার্থসংহিতাবর্ণিত উপেন্দ্র-সংজ্ঞক বলা যাইতে পারে। কালিকাপুরাণে বাসুদেব-মূর্ত্তির যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিতও বর্ত্তমান মূর্ত্তিটির প্রভূত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যথা—

"পূর্ণচন্দ্রোপমঃ শুক্লঃ পক্ষিরাজোপরিস্থিতঃ।
চতুর্ভুজঃ পীতবস্ত্রৈস্ত্রিভিঃ সংবীতদেহভৃৎ।
দক্ষিণোর্দ্ধে গদাং ধত্তে তদধো বিকচাম্বুজং।
বামার্দ্ধে চক্রমত্যুগ্রং ধত্তেহধঃ শঙ্খমেবচ।
শ্রীবৎসবক্ষাঃ সততং কৌস্তুভং হৃদি চাদ্ভুতম।

* * * *

"শীর্ষে কিরীটং সদ্যোতং কর্ণয়োঃ কুণ্ডলদ্বয়ম্।
আজানুলম্বিনীং চিত্রাং স্বর্ণমালাং গলস্থিতাম্।
দধান দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রতম্।
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ্ বরদং হরিম্।"

পাষাণনির্ম্মিত এই বিগ্রহটির পরিকল্পনা অতীব সুন্দর। মূর্ত্তিটির প্রশান্ত বদনমণ্ডলে স্বর্গীয় সুষমা পরিব্যাপ্ত। পার্শ্বচারিণী দেবীযুগলের মহিমামণ্ডিত মুখশ্রীতে নারীসুলভ

কমনীয়তা ও করুণা যেন ক্ষরিত হইতেছে। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য-প্রণীত 'শুক্রনীতি' নামক গ্রন্থনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে মূর্ত্তিটিকে রাজসিক শ্রেণীভুক্ত করা যায়। বাহনোপবিষ্ট, সালঙ্কৃত, বিবিধ আয়ুধধারী, উপাসককে বর ও উৎসাহদাতা মূর্ত্তি রাজসিকাখ্য। মূর্ত্তিত্রয়ের অঙ্গাবয়ব সুঠাম, সুশোভন ও সম্পূর্ণরূপ শিল্পশাস্ত্রসঙ্গত। হস্তপদাদির গঠন ও স্থাপনভঙ্গি স্বাভাবিক ও মনোরম। বিষ্ণুমূর্ত্তির উপরিস্থ করদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলির গঠন ও বিচিত্র সংস্থান, অলঙ্কার ও করস্থিত আয়ুধাদির শিল্পচাতুর্য্য, হস্তী দুইটীর বাস্তবসাদৃশ্য, অতীব বিস্ময়জনক। বাসুদেবের ধরণীবদ্ধদৃষ্টি—নেত্রদ্বয় নিমীলিত নহে। শরীরের অবয়বসমূহ পরিপূর্ণ কিন্তু স্থূল নহে। এ বিষয়ে পদদ্বয়ে যে কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা আলোকচিত্র-গ্রহণের অসুবিধাজনিত। দশাবতারের ও পাদপীঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলি অতিশয় সুদর্শন। মূর্ত্তিতে 'লাবণ্যযোজনা' শিল্পশাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বক্ষ্যমাণ বিগ্রহটিতে এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রুটি লক্ষিত হইবে না।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' গোরকপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির যে প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান মূর্ত্তিটির অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও, এই মূর্ত্তি যে তদপেক্ষা সুন্দর, তুলনা করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। বস্তুতঃ, কলিকাতা যাদুঘর, সারনাথ, কণারক, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে আমি বৌদ্ধ ও হিন্দুভাস্কর্য্যে যে সকল শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত এই বিগ্রহটি সম্পূর্ণরূপে একাসনে স্থাপনযোগ্য।

বেদে সূর্য্যের অপর নাম বিষ্ণু। পৌরাণিকযুগে তিনি ত্রিমূর্ত্তির অন্যতমস্বরূপে পূজিত হইতেন, এবং পুরাণাদিতে তাঁহার দশাবতারের বর্ণনা আছে। সুতরাং পৌরাণিক যুগ হইতেই বিষ্ণুমূর্ত্তি-রচনা আরম্ভ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান মূর্ত্তিটি কোন্ যুগে উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা অসম্ভব হইলেও, ইহা প্রাচীন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণের মত এই, বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী গুপ্তরাজগণের (৩২০—৪৮০ খৃষ্টাব্দে) ও তৎপরবর্ত্তী যুগে হিন্দুভাস্কর্য্য চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীকে ডাক্তার কুমার স্বামী তাঁহার 'The Arts and Crafts of India and Ceylon' নামক গ্রন্থে 'the flowering time of Hindu renaissance', অর্থাৎ হিন্দু সভ্যতার চরম-বিকাশের যুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে, এই যুগের ভাস্কর্য্য is 'characterised by the suavity and fullness of its closely clinging transparent draperies'—মূর্ত্তিগুলির সুডোল অঙ্গাবয়ব ও কমনীয়তা এবং স্বচ্ছ গাত্র-সংলগ্ন পরিচ্ছদ দ্বারা এই ভাস্কর্য্য বিশেষভাবে সূচিত হইয়াছে। এই বর্ণনা বিরিঞ্চির বাসুদেব বিগ্রহটির সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রযুজ্য। মনুষ্যাকৃতির গরুড়বাহন বিষ্ণু-মূর্ত্তিগুলি খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছে, ইহাও অনেক পণ্ডিতের মত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব-নামক বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী গাঙ্গবংশীয় নরপতিগণ কর্ত্তৃক শ্রীক্ষেত্রের

জগন্নাথ মন্দির নির্ম্মিত হয়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ (ফর্গুসন সাহেবের মতে খৃষ্টীয় নবম।) শতাব্দীতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত সূর্য্যোপাসক কোন উৎকল নরপতি-কর্ত্তৃক কণারকের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হয়।

বর্ত্তমান বিষ্ণুমূর্ত্তিটির সহিত উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রখচিত অনেকগুলি মূর্ত্তির রচনা-ভঙ্গির সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পুনশ্চ, দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব দশাবতার-স্তোত্র রচনা করেন; তাহার পূর্ব্বেই দশাবতারের রূপভেদ ও প্রকারভেদ সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া, হিন্দু-সাধারণের নিকট বিশেষ-রূপে পরিচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। অতএব, বর্ত্তমান মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিরচিত হওয়াই খুব সম্ভব। জয়দেব কিয়ৎকাল লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ছিলেন, তৎপরই মুসলমানগণের অভ্যুদয়-কাল। তখন স্থাপত্যের উন্নতি হইলেও উহা তক্ষণ-শিল্পের অবনতির যুগ; কারণ, মূর্ত্তিরচনা মুসলমান ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সুতরাং, তৎপূর্ব্বেই এই মূর্ত্তিটি খোদিত হওয়ার সম্ভাবনা। ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে' মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খাটরার বাসুদেব-মূর্ত্তির যে প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কেদার রায়ের আমলের বলিয়া কথিত হয়। কেদার রায় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং আকবর ও মানসিংহের সামসময়িক ছিলেন। তাঁহার যুগে হিন্দু তক্ষণ-শিল্পের কতদূর অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহা ঐ মূর্ত্তিটির সহিত বর্ত্তমান মূর্ত্তিটীর তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। অথচ 'বারভূঞা'র অন্যতম কেদার রায় বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ ভাস্কর দ্বারা মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বিরিঞ্চির বাসুদেব-মূর্ত্তিটি যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে, অর্থাৎ সপ্তশত হইতে পনের শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না; এবং মূর্ত্তিটির রচনানৈপুণ্য দেখিয়া, ইহা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়।

এই প্রাচান ও সুন্দর মূর্ত্তি কোন ভাস্কর-কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ, কাহার দ্বারা প্রথম কোথায় স্থাপিত হইয়াছিল, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য স্বভাবতঃই কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়; কিন্তু তাহা চরিতার্থ করিবার পক্ষে উপাদানের নিতান্তই অসদ্ভাব। একমাত্র এই বলা যাইতে পারে যে, মূর্ত্তিটির দ্বারা প্রমাণিত হয়, ন্যূনাধিক এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এতদঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। অথচ এই স্থানের অতি সন্নিকটে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতোপরি শৈবদিগের একটি প্রধান ও প্রাচীন পীঠস্থান বর্ত্তমান। হিন্দুধর্ম্ম শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন তীব্র বিরোধ কোন কালেই ছিল না; সকল দেবতাই মূলতঃ এক, এই গভীর তত্ত্ব হিন্দু কোন কালেই বিস্মৃত হয় নাই;—মূর্ত্তিটিদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে, বলা যাইতে পারে। কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিলে, এরূপ আরও অনেক কথা মনে উদয় হয়; কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। মোটের উপর, যে হিন্দুভাস্কার্য্য এককালে ভারতীয় সভ্যতাকে জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছিল, বিরিঞ্চির বাসুদেব-মূর্ত্তিটি তাহার একটি অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন, সন্দেহ নাই। *

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল।

* "ভারতবর্ষ" হইতে মুদ্রিত।

"জেনেরাল অংগ্রেয়া"

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ অরাজক। দেশের শাসন-কর্ত্তা নবাব অনেকদূরে রাজধানীতে থাকিতেন। রাজধানী হইতে যতদূরবর্ত্তী স্থান হইত, ততই সেখানে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইত। কারণ, অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী, নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া নবাবের কাণে পৌছিত না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল কর্তৃক বিতাড়িত পাঠানগণ ভীমবেগে মেঘনা নদী পার হইয়া নোয়াখালীর সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। পদবিদলিত ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দংশনোদ্যত দস্যুকে নোয়াখালীবাসিগণ প্রথমতঃ বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইল না।

ত্রিপুরাপতি অনেকবার বাধা দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই বাধা প্রবল স্রোতোমুখে তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল। অমিত বল-দৃপ্ত পাঠান শক্তির তাণ্ডব নৃত্যে,—আসুরিক অত্যাচারে,—অসির ঝনৎকারে, নোয়াখালীবাসীর হৃদয়, বাতাহত লতার ন্যায় মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছিল।

পাঠাণগণ এদেশে রাজত্ব বা প্রভুত্ব করিতে আসিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু তাহাদের আগমনের ফলস্বরূপ অত্যাচারের মাত্রা যে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বলা যায়। যে সময় পাঠান-দিগের বজ্রনাদী কামানের গভীর নির্ঘোষে নোয়াখালীর সমতল ক্ষেত্র কম্পিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে পর্ত্তুগীজদিগের ভৈরব রাবী কামান বঙ্গ-সাগরের নীল-বক্ষঃ কম্পিত করিয়া সন্দ্বীপের উপর গর্জ্জন করিতেছিল। বড় সুযোগ উপস্থিত হইল। পাঠান ও পর্ত্তুগীজ শক্তি সম্মিলিত হইয়া নোয়াখালীর উপকূলে ও সন্দ্বীপ অঞ্চলে দস্যুতা আরম্ভ করিল। মগরাজা আরাকাণপতি মেং এই সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। তিনিও যোগদান করিলেন। সুতরাং ত্রিশক্তি মিলিত হইয়া বঙ্গের কোমল অঙ্গ-স্বরূপ সন্দ্বীপ ও নোয়াখালীর উপকূলে যে অত্যাচার আরম্ভ করিল. তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

এই সময়ে ভুলুয়া রাজ্য যদিও ত্রিপুরা নৃপতিগণের সামন্ত রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, তথাপি ভুলুয়া রাজগণের ক্ষমতা, শৌর্য্য, বীর্য্য একেবারে কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। লক্ষ্মণ মাণিক্য এই সময়ে ভুলুয়ার রাজ-'তক্তে' সমাসীন ছিলেন। তাঁহার অমিত শৌর্য্য বীর্য্যে কেহ তখন ভুলুয়া আক্রমণ করিতে সাহস করিত না। কথিত আছে, তিনি একমণ ওজনের লৌহবর্ম্ম পরিধান করিয়া সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন।

যাহা হউক, হঠাৎ ভুলুয়া নৃপতি লক্ষ্মণ মাণিক্য শুনিতে পাইলেন যে, পাঠান, পর্ত্তুগীজ ও মগ মিলিত হইয়া তাঁহার রাজ্যের মধ্যে অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে এবং সন্দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য পর্ত্তুগীজ সেনাপতি অংগ্রিয়া বীরমদে মত্ত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের লোমহর্ষণ অত্যাচারে প্রজাকুল আকুল হইয়া, ভুলুয়া-পতির নিকট আপনাদের দুরবস্থার কাহিনী জানাইতে লাগিল।

প্রজার দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া ভুলুয়া-পতি লক্ষ্মণ-মাণিক্য এক বিশাল বাহিনী সমভিব্যাহারে শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে জেনেরাল অংগ্রিয়া সম্মিলিত পাঠান, পর্ত্তুগীজ ও মগ সৈন্যের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন্। সন্দ্বীপের দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের বক্ষে লক্ষ্মণ মাণিক্যের নৌবাহিনীর সহিত এই বিশাল সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হয়।

প্রথম আক্রমণেই জেনেরাল অংগ্রিয়া বুঝিল যে, বাঙ্গালী ভীরু নহে। বাঙ্গালীর শীতল ধমনীতে এখনও উষ্ণ রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধে অসংখ্য সৈনিক সাগর বক্ষে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের রক্তস্রোতে বঙ্গোপসাগরের নীলস্রোত লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

অবশেষে বিজয়-লক্ষ্মী লক্ষ্মণমাণিক্যকেই জয়মালা অর্পণ করিলেন। মগ ও পর্ত্তুগীজগণ পলাইয়া গেল। সেনাপতি অংগ্রিয়া আহত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইল। অসভ্য মগ ও বর্ব্বর পর্ত্তুগীজ প্রাণভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। বিজয়োৎফুল্লে লক্ষ্মণমাণিক্য সগৌরবে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাঙ্গালী যে জল যুদ্ধ করিতে জানিত, তাহা লক্ষ্মণমাণিক্য সেই দিন দেখাইয়া গিয়াছেন। হায়! জাতীয় ইতিহাসে আমরা এতই অনভিজ্ঞ যে বঙ্গ-গৌরব লক্ষ্মণমাণিক্যের নাম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা ট্রাফালগারের যুদ্ধ অথবা নীল-নদের যুদ্ধবিবরণ কণ্ঠস্থ করিয়াছি।—কিন্তু আজ মনে হয়, মহাবীর লক্ষ্মণ মাণিক্য নোয়াখালীর "নেলসন্"।

জলযুদ্ধে অশিক্ষিত বলিয়া চিরদিনই আমরা জগতের ইতিহাসে একটা দুরপনেয় কলঙ্ক বহিয়া আসিতেছি। যিনি সেই দিনই আমাদের এই কলঙ্ক ভঞ্জন করিয়া দেখাইলেন যে, বাঙ্গালীর বাহু কখনও দুর্ব্বল নহে, সময় ও সুযোগ পাইলে তাহারা তাহাদের সেই জাতীয় তেজ দেখাইতে পারে, দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবন চরিত এখনও আমরা আলোচনা করিতে পারি নাই।

শ্রীবিপিনবিহারী সরকার ভক্তিরত্ন।

মাহিসওয়ার।

শাহ্জাহানের পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ আরম্ভ হওয়ার পর যখন শাহস্‌জা আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া, এস্‌লামাবাদ অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন তদীয় পীর হজরত শেখ্ পহলনশাহ দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কোথা হইতে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা অপরিজ্ঞাত। কথিত আছে শাহস্‌জার পলায়নের পর তিনি দিল্লী হইতে গঙ্গা পথে মৎস্য পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি কেন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার সন্তোষজনক

কারণ আমরা পাই নাই। সম্ভবতঃ শিষ্যের সাহায্যে পূর্ব্ববঙ্গে থাকিয়া এস্‌লাম প্রচার করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক শাহস্‌জা চট্টগ্রামে অধিক দিবস অবস্থান করেন নাই এবং তাঁহার শেষ দশা কি হইয়াছিল, তাহাও প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া যায় না। শেখ্ পহলনশাহ চট্টগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া, কাঠঘর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তিনি মৎস্য পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার বংশধরগণকে মাহিসওয়ারের বংশ বলে।

আমরা শাহস্‌জাকে চট্টগ্রাম হইতে আরাকাণ অভিমুখে পলায়ন করিতে ইতিহাসে দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ শাহস্‌জার বিশেষ সন্ধান না পাইয়া, অথবা আরাকাণের পার্ব্বত্য প্রদেশ অস্বাস্থ্যকর ও বিপদসঙ্কুল বিবেচনা করিয়া, কিম্বা যে কোন কারণে হউক, তিনি আর তাঁহার অনুসরণ করা সঙ্গত মনে না করিয়া কাটঘরে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক এস্‌লাম প্রচার করিতে থাকেন। সেই স্থান তাঁহার পছন্দ না হওয়াতে, কিছুকাল পরে সপরিবারে নোয়াখালীস্থ খাসভুলুয়ায় গমন করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ভুলুয়ার অনেক স্থান এক্ষণে নদীগর্ভে নিমজ্জিত। সুতরাং কোন স্থানে তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, তাহা চিহ্নিত করা অসম্ভব। তদীয় সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুশশকুর সাহেব কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া, জনসাধারণকে এস্‌লামধর্ম্মের রীতি নীতি শিক্ষা দিতে থাকেন। কিন্তু তথায় তাঁহার যে সামান্য সম্পত্তি ছিল, তাহা নদীগর্ভে নীত হওয়ায় তিনি পঞ্চ পুত্রসহ হাতিয়াস্থ চর আফজল নামক স্থানে গিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ ও ক্রমে ভূসম্পত্তি বিস্তার করেন। তথায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অল্প কয়বৎসরের মধ্যেই সেইস্থানের ভূসম্পত্তি ও ঘরবাড়ী নদীগর্ভে ধ্বংস হওয়ায় তাঁহার পঞ্চ পুত্র (১) তথা হইতে শাহাবাজপুরস্থ খোস্‌মুদী গ্রামে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। তখন উক্ত দ্বীপটীও ভুলুয়ার অন্তর্গত ছিল। এইক্ষণ উহা বরিশাল জেলাভুক্ত হইয়াছে। প্রথম চারি ভ্রাতা ভূসম্পত্তির প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যথেষ্ট ধনসম্পত্তির অধিকারীও হইয়াছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেখ আমানুল্লা শাহ পিতামহের ন্যায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জ্ঞানে পূর্ণছিলেন এবং এস্‌লামের রীতি নীতি শিক্ষা দানেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এস্থানে ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি খোস্‌মুদী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপরিচিত ভুলুয়া পরগণার অন্তর্গত চরমটুয়া নামক স্থানে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। সেস্থানে তিনি তাঁহার মনোনীত কার্য্যে রত হইলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শেখ্ গোলামিশাহের তিন পুত্র ছিল। শেখ্ মুন্‌সী বোর্‌হানুল্লা, করমুল্লা দেওয়ান ও মুন্সী আছমতউল্লা ফৌজদার। মুন্‌সী আছমতউল্লা ফৌজদার নিঃসন্তান ছিলেন। করমুল্লা দেওয়ানের একটিমাত্র কন্যা ছিল। সেখ্ মুন্‌সী বোরহানুল্লার দুই পুত্র ও আট কন্যা মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আহছানুল্লা ফৌজদার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সুখ্যাতি অর্জ্জন

(১) বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ পক্ষে ব্রহ্মযুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র আবুলবরকাত মৌলবী আমিনুল্লা সাহেবের বংশধরগণ এক্ষণে শৈশর্দ্দিও নেদামপুরের সম্ভ্রান্ত বংশ।

শাহ আবদুশ্‌শকুর সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র সেখ্ আমানুল্লা শাহ; শেখ্ আমানুল্লা শাহের পুত্র শেখ্ ফকিরুল্লা ওরফে হাজি ফকির মোহাম্মদ। তৎপুত্রদ্বয় শেখ্ রাজা ও শেখ্ মতিউল্লা। শেখ্ রাজার বংশধর মৌলবী আবদুল্লা মরহুম সাহেব (২)। তিনি আজন্ম সংসারে অনাসক্ত ছিলেন। পরহিতে রত ও ঐস্‌লামিক রীতি নীতি এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দানে জীবন উৎসর্গ করিয়া, ১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার অবস্থা দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে যখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনীশক্তির শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, তখন পুনঃপুনঃ সেজ্‌দায় পতিত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যখন নড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইল, তখন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালনদ্বারা খোদাওন্দ করিমের পবিত্র নাম জপিতে জপিতে সর্ব্বকৃপাময়ের সহিত মিলিত হইলেন।

বর্ত্তমান সময়ে চরমটুয়া ও রায়পুর নিবাসী মিঞাগণ শেখ্ মতিউল্লার কন্যা পক্ষের বংশধর। অল্পদিন হইল আমিও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চরমটুয়া পরিত্যাগ করিয়া প্রতাপগঞ্জ বসতি স্থাপন করিয়াছি।

পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা বিবেচনা করিবেন না যে, আত্মপরিচয় প্রদানার্থ উপরের লিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইল। আমি বাল্যাবধি পিতার নিকট মাহিসওয়ার সম্বন্ধে অদ্ভুত বিবরণ শুনিতে পাইতাম অনেক সময়ে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু ইহাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া কখনও বিবেচনা করি নাই। তিনি এতৎ সম্বন্ধে যাহা অবগত ছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিলে গ্রন্থাকারে পরিণত হইত। সময় সময় চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর অনেক লোককেই মাহিসওয়ারের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু মাহিসওয়ার বংশ কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা কেহই অবগত নহে। নোয়াখালী জিলা স্কুলে যখন আমি শিক্ষক ছিলাম, তখন এতৎসম্বন্ধে আমার জানিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনেকে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি বরাবরই উহাকে অনাবশ্যক মনে করিয়াছি। কোনও কোন ভদ্রলোক আমা হইতে এই বংশাবলী নকল করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহা প্রকাশ করিবার জন্য এস্থানেও কেহ কেহ আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। সম্প্রতি এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় নোয়াখালীর পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচিত হইতে দেখিয়া, পিতৃমুখে শ্রুত বিবরণের যতটুকু আমার স্মরণ আছে তাহার সংক্ষিপ্তসার এবং তাঁহার নিকট যে বংশাবলী ছিল, তাহার কতক অংশ এতৎসঙ্গে প্রকাশ করিলাম। পাঠকবর্গ ইহার সত্যাসত্য বিচার করিবেন।

আবদুল ওয়াহেদ।

---

(২) বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

মাহিসওয়ারের বংশাবলী।

- সেখপহলনশাহ্
  - হজরতশাহ্ আবদুশ্শকুর সাহেব
    - সেখ গোলামিশাহ্
      - সেখ মুন্সী বোরহানুল্লা
        - মুন্সী আহছানুল্লা (ফৌজদার)
          - আবুলবরকাত মৌলবী আমিনুল্লা
        - মুন্সী মোজহারুল্লা (নাজের)
      - করমুল্লা (দেওয়ান)
      - মুন্সী আছমতুল্লা (ফৌজদার)
    - সেখ মাকমশাহ্
    - সেখ দিদারশাহ্
    - সেখ শমসুদ্দীনশাহ্
    - সেখ আমানুল্লাশাহ্
      - সেখ ফকিরুল্লা (হাজি ফকির মোহাম্মদ)
        - সেখরাজ
          - সেখ মইনুদ্দীন
            - সেখ মোহাম্মদ কাজেম
              - মৌলবী আবদুল্লা
                - মৌলবী মোহাম্মদ আমিনুল্লা
                - আবদুল ওয়াহেদ (লেখক)
        - সেখ মতিউল্লা
      - সেখ এনায়েত উল্লা
        - সেখচাঁদ
          - মেহ্দীতুল্লা
            - মুন্সী মোহাম্মদ আছক

ভুলুয়ায় বারাহী।

আর্য্যসেবিত ভারতে যখন বেদের ভাব মলিন হইয়া উঠিল এবং ইহা বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ যাগ যজ্ঞের বাহ্যিক আচারে পরিণত হইল তখন খৃষ্টীয় অব্দের প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধদেব সাংখ্যবাদের রূপান্তররূপে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার ধর্ম্মমত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাণ বেদের বিরোধী। ইহা নাস্তিকতা—শূন্যবাদ বা নীতিবাদ। প্রচারক পরম্পরায় বৌদ্ধধর্ম্ম সুদূর পশ্চিমে কৃষ্ণা বা নীল নদীর তীর পর্য্যন্ত, নীতিবাদ মূলে নাস্তিকতার সঞ্জীবতা রক্ষা করিয়াছিল। এদিকে ভারতে খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ভারতবাসীকে, অদ্বৈত বাদের পথে ঘুরাইয়া, শঙ্করাচার্য্য তন্ত্রোক্ত আস্তিক সংযমী ও সদাচারী করিয়া শূন্যবাদের গুরুতা পরিহারপূর্ব্বক ভক্তি মধুর রস ভারতে সিঞ্চন করেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবলতা ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পূর্ব্বদিকে বিস্তার লাভ করিল। তন্ত্রমত এই যুগে প্রাধান্য লাভ করিল। কালে এই অদ্বৈতবাদ মলিন হইয়া পুনরায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছায়ারূপে পরিগৃহীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রের জঘন্য প্রচার আরম্ভ হইলে রামানুজ ও বল্লভাচার্য্য দাস্য ও বাৎসল্য ভাবের সাধন প্রণালী ভারতে প্রচার করেন। তার পর তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ, ত্রিপুরানন্দ ও সর্ব্বানন্দ তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের সংস্কার করেন। অতঃপর চৈতন্য ও নিত্যানন্দ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের অবতাররূপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। সখীত্ব ভাবে প্রেম সাধনই তাহাদের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রাণ। ইহাদের সমকালে রঘুনন্দন নব্য হিন্দুর স্মৃতির মত প্রচার করেন। স্থূল কথা খৃষ্টধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্ম, শঙ্কর, রামানুজ ও চৈতন্যের ধর্ম্ম শূন্যবাদী বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিবাদ মূলক। মহাবীর নানক, গুরু গোবিন্দ বুদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষে কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন। তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের কবল হইতে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইস্‌লাম ধর্ম্মের কবল হইতে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম, আর্য্য সমাজ ও রামকৃষ্ণপরমহংসের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় খৃষ্টধর্ম্মের কবল হইতে ভারতকে অনেকটা রক্ষা করিয়াছে। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ভারতকে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিপ্লবের বিভিন্ন ধর্ম্ম বিপ্লবের অধীন করিয়াছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ভাষায় সংঘর্ষে বঙ্গভাষায় জন্ম ও অমিত শক্তির স্ফূরণ হইয়াছে। বৈষ্ণবেরা বঙ্গভাষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রশ্রয়ে সকলেই ব্রাহ্মণত্ব ও শাস্ত্র দর্শনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

পুরাণ ও তন্ত্র পরস্পর সমন্বয় ও সাপেক্ষ ভাবে ধর্ম্ম জগতের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। শঙ্করাচার্য্য মনুষ্য লোকে তন্ত্রের মত প্রচারের আদি গুরু। তিনি, গিরীপুরী, বন, ভারতী, প্রভৃতি দশ নামী সন্ন্যাসী এবং তাহাদের ধর্ম্ম মত প্রচারকেন্দ্র আশ্রম বা মঠমন্দিরের অধিষ্ঠাতা। তন্ত্রে প্রধানতঃ শিব ও শক্তি বা দশমহাবিদ্যার সাধনার ক্রমাদির সঙ্গে সঙ্গে উপশক্তি, ডাকিনী, যোগিনী, ভৈরব, ভৈরবীর সাধনার ক্রম আছে। তন্ত্রমতের প্রক্রিয়ার কঠোরতাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমাজ পুষ্টির অন্যতম কারণ।

শঙ্করাচার্য্যের কার্য্য ক্ষেত্রের কেন্দ্র বারাণসী। বারাণসী মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। মগধ ভারতীয় আর্য্যগণের আদি নিবাস ; ব্রহ্মবর্ত্ত ও দেববর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ইহা অপরিচিত ও অপবিত্র বলিয়া গণ্য ছিল। এই অপবিত্রতার অপর কারণ, এই দেশ বুদ্ধ মত প্লাবিত। "বারাণসী পৃথিবীর অতীত স্থল," এই বাক্য দ্বারা বারাণসীর কৌলিন্য সূচিত হইল। কালক্রমে দেবতার সংশ্রব বিহীন বৌদ্ধ ধর্ম্মে বুদ্ধদেবের তিরোধানের ৪।৫ শত বৎসর পরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, বুদ্ধ-বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ "ধ্যানী বুদ্ধ" একমাত্র বুদ্ধমূর্ত্তিরূপে পরিগৃহীত হইল। পরে অমিতাভ, অক্ষোভা, বৈরোচন, রত্ন সম্ভব, ও অমোঘ সিদ্ধি এবং এই পঞ্চতথাকথিত মূর্ত্তির সহিত লোচনা, তারা, প্রভৃতি মহাশক্তির মূর্ত্তি সৃষ্ট হইল। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পঞ্চ শক্তিতে পঞ্চজন বোধিসত্ত্ব হইলেন। ইহাদিগের মধ্যে মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বর প্রধান। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম পরস্পর প্রতিযোগী ভাবে মগধে প্রসার লাভ করিয়া ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন দিকে ও ভারতের বাহিরে প্রসারিত হয় এমন কি ভারত সাগরীয় দ্বীপে ও আমেরিকায় প্রসারিত হয়। পুরাণ, কার্য্য, মূর্ত্তিশিল্প প্রভৃতির দ্বারা স্থায়ী ভাবে ধর্ম্ম প্রচার ও মত প্রচার কার্য্য সংঘটিত হয়। মূর্ত্তি শিল্প ও অপরাপর স্থাপত্য কার্য্য, বুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রথমে বিশেষ ভাবে ভারতে প্রচার করেন। তান্ত্রিকেরাও সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগ উপেক্ষা করে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংযোগে পৃথিবীর স্থাপত্য বিদ্যার প্রসার লাভ হয়।

তন্ত্রের শক্তি ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদি যেরূপ অসংখ্য, বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহাফল হইতে হীনযানের অধঃপতনের সময়ের পর বৌদ্ধ মূর্ত্তি, শক্তি, ডাকিনী যোগিনী ইত্যাদিও সংখ্যাতীত ভাবে দৃষ্ট হইয়াছিল। তন্ত্রের ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই উভয় ধর্ম্ম তবে অন্যের ধর্ম্মকে পরিপাক করিয়া বর্দ্ধিত হইতে সচেষ্ট ছিল। হিন্দুরা পূর্ব্ব হইতেই অনার্য্য ধর্ম্মকে পরিপাক করিতে যাইয়া অনেক অনার্য্য কেন্দ্রগুলিকে স্বীয় ধর্ম্মের পীঠস্থল করিয়া লইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংঘর্ষে আসিয়াও তাহারা সেই নীতি পরিত্যাগ করে নাই এবং গয়া ও শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিহারগুলিকে স্বীয় ধর্ম্মানুবর্ত্তিতায় আনিয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মূর্ত্তিবাদমূলক ধর্ম্ম মত প্রচারোদ্দেশে কলাবিদ্যা পারদর্শী সুনিপুণ স্থপতি সহায়ে মূর্ত্তি গঠন ও নানাদিগ্দেশে তৎসমুহের প্রচারই সমূহ ধর্ম্ম প্রচারের একটা প্রধান কার্য্য। বুদ্ধমত ও তন্ত্র মত প্রচারকগণ বহুশতাব্দী ধরিয়া স্বীয় স্বীয় মত প্রচারের জন্য মূর্ত্তি গঠন করিয়াছিল, এই শিল্প শ্রেণীকে প্রধানতঃ মাগধী শিল্প বলা যাইতে পারে। মগধই এই শিল্পকলার আদি তীর্থ স্থল। মগধ হইতে এই শিল্প প্রচার কার্য্য ক্রমশঃ পূর্ব্ব-দিকে বঙ্গে সংক্রামিত হইয়া ছিল। কিন্তু মধুর ভাবের দ্যোতনা শিল্পিগণ বঙ্গীয় শিল্পরীতি হইতেই পাইয়াছিল। বঙ্গে ও বঙ্গের পূর্ব্বে আসামের তন্ত্রমত ভারতের অপরাপর স্থল হইতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক এই উভয় সম্প্রদায়ই একমূর্ত্তিকে স্বীয় পক্ষে একই নামে বা বিভিন্ন নামে

গ্রহণ করিয়াছিল। পরিশেষে তান্ত্রিকগণের জয় হইয়াছিল। আমাদের প্রবন্ধের উপপাদ্য ভুলুয়ার বারাহী বজ্রবারাহী, বারাহী বা মারিচী নামের যোগিনী পর্য্যায়ভুক্ত। আমাদের তন্ত্র মতে বারাহী উপশক্তিভাবে গৃহীত। বৌদ্ধেরা বারাহীকে চতুর্ভুজা ও ষড়্ভুজা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তান্ত্রিকেরা অষ্টভুজাভাবে সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা যে বারাহীর ধ্যান পাইয়াছি তাহাতে অষ্ট হস্তের চারি হস্তের অস্ত্রশস্ত্রের প্রকাশ পাইয়াছি। প্রবন্ধান্তরে তাহা আলোচিত হইবে। আমার মনে নাই কোন পত্রিকা বা স্থানে বারাহী মূর্ত্তির ৪ হস্ত বা ৬ হস্ত দৃষ্টি করিয়াছি। প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তির অধিকাংশই বৌদ্ধশিল্পির হস্তনির্ম্মিত। প্রত্যেক বুদ্ধ মূর্ত্তির নিম্নস্থ পদ্মের সহিত এই বারাহী মূর্ত্তির নিম্নস্থ পদ্মচিত্র একরূপ এবং বারাহীর চালচিত্রে ৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। হিন্দু ও বুদ্ধ ধর্ম্ম জ্ঞাপক যতগুলি মূর্ত্তি এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে বুদ্ধদেবের বিভিন্ন অবস্থার আকৃতির সাদৃশ্য, তুলনার সামঞ্জস্য ও বৌদ্ধ শিল্পির হস্তের নিপুণতার রুচির একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। প্রায় সকল মূর্ত্তিরই অবস্থানে, বাহনে বা পারিপার্শ্বিক উপদেবতার মূর্ত্তিতে বা চালচিত্রে বুদ্ধ মূর্ত্তির সূচনা করে।

এই বারাহী মূর্ত্তি কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্টের যাদুঘরে ৩৮২০ এবং ৪৬১৮ নম্বর যুক্তমতে মারিচী নামে ৮০০ ও ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিম্মিত ; মাগধী শিল্প শ্রেণীভুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যাদুঘরের একখানা মূর্ত্তি আলীঢ় এবং অপরখানা প্রত্যালীঢ় ভাবে ছদ্মবেশে দণ্ডায়মান। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চেষ্টায় রামপুর বোয়ালিয়ার যাদুঘরে সংগৃহীত মূর্ত্তির মধ্যে মারিচী মূর্ত্তিই (১৩১৯ সনের কার্ত্তিক সংখ্যায় সাহিত্যের চিত্রে) আমাদের উপপাদ্য বারাহী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি এবং ভুলুয়ার বারাহী মূর্ত্তি আলীঢ় ভাবে দণ্ডায়মানা। এই পর্য্যন্ত ৪ খানি মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। ১৩০৩ সনের কার্ত্তিক সংখ্যার ভারতীতে প্রকাশিত জব্বলপুরের মূর্ত্তি লিষ্টিতে ৬১ নম্বরে যোগিনী শ্রেণীতে বারাহীর নাম দৃষ্ট হয়। কলিকাতার যাদুঘরের মূর্ত্তি দুইটি ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মূর্ত্তি অখণ্ডিত। আমাদের ভুলুয়ার বারাহী মূর্ত্তির উর্দ্ধদিকে কিছু খণ্ডিত। প্রবাদ কালাপাহাড় মূর্ত্তির এইরূপ দুরবস্থা করিয়াছে। বিশেষতঃ কালা পাহাড়ের করস্পৃষ্ট মূর্ত্তিই প্রাচীনতার গৌরবে গৌরবান্বিত। এই বারাহী মূর্ত্তি উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল পালিশ কৃষ্ণপ্রস্তরে উৎকীর্ণ এবং অতি উন্নত স্তরের গৌড়ীয় রীতিতে নির্ম্মিত ও সুরুচির পরিচায়ক।

এই বারাহী মূর্ত্তি কিরূপে ভারতের শেষ সীমা ভুলুয়ায় উপস্থিত হইল, তাহাই বক্তব্য রহিয়াছে। ভক্তের নিকট দেবমূর্ত্তি সচলা—ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব বিদ্‌গণের নিকট তাহা নহে। স্বপ্ন, শাপ ও বর—উপন্যাস—ঐতিহাসিকতা নহে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউএনথসান্ বঙ্গদেশে আসেন। তিনি বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মিশ্রণ সন্দর্শন করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শৈব শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক বৌদ্ধ রাজা হর্ষবর্দ্ধনের পরাজয়ে বৌদ্ধ প্রভাব অনেক বিনষ্ট হয়। তখন হইতেই বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তিগুলি

তান্ত্রিকগণের দেবমূর্ত্তি বলিয়া গণ্য হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান কর্ত্তৃক মগধের বৌদ্ধ রাজধানী ওদন্তীপুর ধ্বংশের সহিত ২০০০ প্রধান ভিক্ষুর বিনাশ সংশাধিত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্যের আরম্ভ হয়। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুতবুদ্দিনের সেনানী মগধ ও গৌড় জয় করেন। মুসলমান কর্ত্তৃক মগধ বিজয়ের সমকালে বাৎস্য গোত্রীয় ক্ষত্রিয় বিশ্বম্ভর শূর নামক জনৈক রাজকুমার ২০০ জলযান ও বহুপরিবার ও সৈন্য সামন্তসহ পূর্ব্বাভিমুখে পলায়ন করিয়া চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে শিব দর্শনে উপস্থিত হন। ক্ষত্রশক্তি যে রূপেই হউক স্বাতন্ত্র্য লাভ না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। চন্দ্রনাথ তীর্থ হইতে নৌকাযোগে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বঙ্গোপসাগরের উত্তর পশ্চিম কোণে নাবিকদিগের দিগ্‌ভ্রম হয়। ইতস্ততঃ পোত সঞ্চালনের পরে তাঁহার পোতশ্রেণী বর্ত্তমান "আমিশাপাড়া" গ্রামের পশ্চিমে "নাওএড়ি" গ্রাম হইতে সোনাইমুড়ী রেল ষ্টেশনের পশ্চিম দিকে "বগাদিয়া" ও "ভাগুয়াই" পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ক্রমশঃ নব সঞ্চিত বালুকা স্তরে আবদ্ধ হইতে থাকে। একে স্থল অপরিচিত নাবিকগণ দিগ্‌ভ্রান্ত, তদুপরি মাঘের সমুদ্রজ কুজ্ঝটিকা রাজকুমারের মনে বিপদের সূচনা করে। নৌকা সমূহের গতি স্থগিত হইলে বিশ্বম্ভর শূর অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় ইষ্ট দেবী বারাহীর শরণাপন্ন হন। ইষ্টদেবী মূর্ত্তি নিশ্চয়ই তাঁহার সঙ্গে ছিল। কারণ চিরতরে যিনি স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্ধকার ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতে হইতে আশ্রয় স্থানের অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহার জীবনের শেষ সম্বল ইষ্ট দেবীকে তিনি অস্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন না। বিশেষতঃ তিনি তান্ত্রিক ভক্ত, শিব দর্শনের যাত্রী। অথবা তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম প্রচারের যুগে তন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী। নানা দিগ্‌দেশে স্বীয় মত প্রচারোদ্দেশে বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠতম ভিত্তি ভূমি বারাহী দেবীকে তিনি সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক বিশ্বম্ভর সেই ঘোর বিপদের তীব্র তাড়নার মধ্যে বর্ত্তমান "ভাগুয়াই" গ্রামের নবজাগ্রত চরে সেই রাত্রিতেই বারাহী দেবী স্থাপন করেন। চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের প্রস্তর দ্বারা দেবীর পাদপীঠ প্রস্তুত করা হইয়া ছিল, অদ্যাপি এই প্রস্তর খণ্ড, রেল পথের লৌহ নিয়ন্ত্র, কাষ্ঠের আকারে দৃষ্ট হয়। দেবীর প্রস্তর হইতে এই প্রস্তরের জাতি বিভিন্ন। দেবীর প্রীত্যর্থে ছাগ বলি দেওয়া হয়। রক্ত বিহীন পূজায় তান্ত্রিকের পূজার অঙ্গহানি হয়। সেই দিন ৬১০ বঙ্গাব্দে ১০ই মাঘ অনুমান ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ। রাজা প্রভাতে চতুর্দ্দিকে এক বিশাল দ্বীপশ্রেণী অবলোকন করেন। দেবী যেন তাহাকে এই দ্বীপের আধিপত্য প্রদান করিলেন বলিয়া তাহার ধারণাও হইয়াছিল। পরে তাঁহার এই রাজ্য প্রাপ্তির ঘটনা দৈব ঘটনা বলিয়া দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল। এই নব রাজ্য "ভুলুয়া" নামে আখ্যাত হয়। ভুলুয়া নামের বিষয় প্রবন্ধান্তরে বিবৃত হইবে। বিশ্বম্ভর শূরের বংশ সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে প্রবল পরাক্রমে ভুলুয়া রাজ্য শাসন করেন। সপ্তম পুরুষ মহারাজ লক্ষ্মণ মাণিক্য বঙ্গের প্রসিদ্ধ বার ভুঁঞার অন্যতম। তিনি ভুলুয়ায় আদিশূর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তিনি, বীরত্ব ও কবিত্ব উভয় সম্পদের অধিকারী ছিলেন। ইনি

বীররসপূর্ণ সংস্কৃত "বিখ্যাত বিজয়" নামক কাব্য রচনা করেন। লক্ষ্মণ মাণিক্যের পিতামহ কবিচন্দ্র খাঁও একজন কবি ছিলেন। লক্ষ্মণ মাণিক্য, মগ, ফিরিঙ্গি, মুসলমান ও চন্দ্রদ্বীপের রাজা রাম চন্দ্রের সহিত সপ্তবার পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন, এবং বিজয়লক্ষ্মী তাহার অঙ্কশায়িনী হয়। ইনি ভুলুয়ায় আদিশূররূপে ভুলুয়ার হিন্দু সমাজকে বিক্রমপুরের সমাজের ন্যায় উন্নত করেন। ইনি ভুলুয়ায় বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ভুলুয়ার প্রধান অধিবাসিগণ মিথিলা, বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ ও অবশেষে চট্রগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আগত। ইহাঁর দুই রাণী ছিলেন, পাটরাণীর সন্তানগণ "আদিশূর" এবং অপরা রাণীর সন্তানগণ "পদী"শূর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সামাজিক কারণে দুঃখিত, বিশ্বাসঘাতক চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের যুদ্ধযাগে মিত্রভাবে নীত হইয়া হত হ'ন। লক্ষ্মণ মাণিক্যের পর আটজন রাজা ভুলুয়ায় রাজত্ব করেন। তাঁহারা পরাধীনভাবে রাজত্ব করেন, পরে হৃতরাজ্য হ'ন। এই রাজ বংশীয়গণ এখনো ভুলুয়ায় নানাস্থানে দীনভাবে বাস করিতেছেন। "ভামুয়াই"র নিকটবর্ত্তী সিমুলিয়া গ্রামে বিশ্বম্ভর শূর রাজধানী স্থাপন করেন। তৎপর রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের সময় কল্যাণপুরের রাজধানীই প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজগণের সঙ্গে সঙ্গে বারাহী দেবী স্থানে স্থানে নীতা হ'ন। ঘাটলাবাগ নামক গ্রামে অদ্যাপি "বারাহী গাছ" বলিয়া একটা গাছ আছে তাহা মৃত্তিকার একটা ঢিপীর উপর অবস্থিত। সন্ধ্যার সময় তাহার পূজা হয় এবং চৈত্র সংক্রান্তির সময় একটা মেলা হয়। ভুলুয়ায় নানাস্থানে এইরূপ বারাহীর অধিষ্ঠান স্থানের আবিষ্কার করা কঠিন নহে। আদিম ভুলুয়ায় বারাহীর গৌরব এত প্রসার লাভ করিয়াছিল যে স্বতঃই অনেক গ্রাম বারাহীনগর বারাহীপুর ও দেবস্থানের নামে বারাহীর নাম সংযুক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের বিহির গাঁও গ্রামের নাম কখনে বারাহী গাঁও, ব্রীহির গাঁও না বিহারী গাঁও ঠিক করা কঠিন। কিন্তু পুরাতন কাগজে বিহির গাঁওর দক্ষিণ মাঠ বারাহী নগর মাঠ বলিয়া লিখিত আছে। লক্ষ্মণ মাণিক্যের পরবর্ত্তী রাজা ভদ্ররায়ের পত্নী রাণী শশিমুখী কাশীধামে যাত্রা করেন। স্বীয় কুলপুরোহিত আমিশাপাড়া নিবাসী শাকুটিয়া বংশজ রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে দেবীর জন্য একটী ইষ্টক মন্দির নির্ম্মাণ ও বহু দেবোত্তর সম্পত্তি পুরোহিতকে দেবীর সেবার্থ প্রদান করিয়া ভক্তমন্দিরে বারাহী দেবীকে স্থাপন করেন; তদবধি দেবীমূর্ত্তি এই মন্দিরেই আছে। পুরোহিত বংশের এক শাখা দেবী ও নাথেরাজ সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে দেবীর পূজা নির্ব্বাহ করান। দৌহিত্র অধিকার সূত্রে বিক্রমপুরের মূলপাড়ার চট্টোপাধ্যায় গণের এক শাখা বর্ত্তমানকালে দেবীর এই সম্পত্তি ভোগ করিয়া দেবীর সেবা করাইতেছেন। পুরোহিত কুলের অপর শাখা আমিসাপাড়া ও রসিদপুর গ্রামে বর্ত্তমান আছেন। দেবীর চিত্র দেওয়া গেল।

শ্রীমহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মালশ্রী—গান। *

(খিলপাড়া নিবাসী ভুলুয়ার প্রাচীন জমিদার জগচ্চন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী রচিত, ঘোষকামতা নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রেরিত।

কর্‌লে কিমা ওগো শ্যামা মা, ভুলো'র উপর ডাকাতি।
বারাহী নামেতে ভুলো,
মহিমা জাগ্রত ছিল,
সে ভুলো নিলাম হ'ল মা হলে বিশ্বাস-ঘাতী॥
ভুলো অধিপতি যারা,
করিলি কৌপীন সারা,
থানে বাড়ী করলি ছাড়া নিবালি জলন্ত বাতি॥
দাস জগচ্চন্দ্র বলে,
এই ছিল মা মোর কপালে,
পাথারে পড়িয়ে ডাকি দাঁড়াতে মা, নাহি ক্ষিতি॥

কথা ও কার্য্য।

আজকাল সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকগণের উন্নতি বিধানের জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছে। বলা বাহুল্য এই চেষ্টার মধ্যে আলোচনার অংশই অধিক। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে ইংরাজীতে বলা হয় Depressed class; ইহার ঠিক বাংলা তর্জ্জমা "নিপীড়িত শ্রেণী"; তদ্দারা এইরূপ বুঝা যায় যে সমাজের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ মুচি, মেথর, সাহা, তিলি, মিস্ত্রী, মুজুর, হাড়ি, বাগ্দী, ডোম, চণ্ডাল, জেলে, বেণে, কামাব, কুমার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকগণকে নিরন্তর পদদলিত করিতেছেন; তার প্রমাণ এই যে কেহ তাদের ছোঁয়া জল খায় না। অতএব কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে এই নিপীড়িত জাতিগণেব উন্নতি বিধান করিতে হইলে তাহাদিগকে "জল-চল" করিবার চেষ্টা করা উচিত। ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ যদি তাহাদের ছোঁয়া জল পান করে, তবেই তাহাদের সকল দুঃখ ও যন্ত্রণার অবসান হইবে।

সমাজে আমরা সাধারণতঃ যে ঘৃণা ও সম্মানের ভাব প্রচলিত দেখিতে পাই, তাহা আন্তরিক নহে; কারণ তাহা অর্থের উপর নির্ভর করে। সমাজে যে ব্যক্তি অর্থশালী ও

* শুনিয়াছি জগচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের রচিত অনেক মালশ্রী বা মাল্‌সী সঙ্গীত আছে। ক্রমে সংগৃহীত হইলে প্রকাশ করিব ইচ্ছা রহিল। নোয়াখালী সম্পাদক।

ধনবান্ সেই সকলের সম্মানভাজন হয়। তাহাকে ছুঁইয়া কেহ জল পান না করিলেও তাহাকে সম্মান সকলেই করিয়া থাকে। মুসলমান জমিদারের সম্মুখে তাঁহার ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী মস্তক অবনত করে। সমাজ সংস্কারকগণ নিম্নশ্রেণীস্থ লোকগণকে যে সম্মানের ভাগী করিতে চাহেন, সে সম্মান একমাত্র অর্থ ব্যতীত আর কিছুই প্রদান করিতে পারে না। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে—"টাকার নৌকা পাহাড় দিয়া চলে"। অবশ্য আন্তরিক সম্মান ও প্রেম নির্ভর করে চরিত্রের উপরে; সেখানে জাতিভেদ নাই। মুসলমান ফকীরের "জলপড়া" (মন্ত্রপূত জল) হিন্দু রোগিগণ ভক্তিভরে পান করে। অতএব দেখা যাইতেছে, যাহাদিগকে এখন "নিপীড়িত জাতি" বলা যাইতেছে, তাহাদিগকে অর্থশালী অথবা চরিত্রবান্ হইতে হইবে। আমাদের রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ অথবা বচন-সর্ব্বস্ব সংস্কারকগণ ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দ্বারা নিম্নশ্রেণীস্থ লোকগণের চরিত্রকে মহান্ ও পূজনীয় করিতে পারিবেন না, একথা নিশ্চয়; কারণ, তাহাতে চৈতন্যের মত মহাত্মার প্রয়োজন, তাহাতে রামকৃষ্ণের মত ভক্তের প্রয়োজন। আমাদিগকে যুগ-প্রবাহের সঙ্গে চলিতে হইবে। আজকাল অর্থই প্রবল; বিজ্ঞানই শক্তিমান। শ্রীমদ্ শঙ্কারাচার্য্যের সেই মহতী উক্তি—"অর্থ মনর্থং ভাবয় নিত্যং" আমরা ভুল বুঝিয়াছি; অর্থে আসক্তি জন্মিলেই তাহা অমঙ্গল উৎপাদন করে। দেহ রক্ষার জন্য অর্থ উপার্জ্জন, সঞ্চয় ও ব্যয় করিতেই হইবে। শঙ্করাচার্য্য ত আর বাতাস খাইয়া বাঁচেন নাই। যাহা হউক নিম্নশ্রেণীর লোকগণের দরিদ্রতা প্রযুক্তই তাহারা সমাজে ঘৃণিত হইয়া রহিয়াছে। আজ যদি তাহারা দু'পয়সা রোজগার করিয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাহারও ধার না ধারিয়া থাকিতে পারে, তবেই তাহারা সকলের সম্মান-ভাজন হইতে পারিবে। যদি বাকী খাজনার জন্য জমিদার তাহাদিগকে আর চোখ্ রাঙাইতে না পাবে, যদি সুদের টাকার জন্য মশার কামড়ের মত মহাজনের তাগাদা সহ্য করিতে না হয়, তবেই তাহারা নির্ভয়ে বুক ফুলাইয়া চলিতে পারিবে। সমাজ চিরকালই "শক্তের ভক্ত; নরমের যম"। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকগণের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতে পারি। তাহাদের দুরবস্থা মোচন করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত করিবার যদি কোন উপায় থাকে, তবে এই একমাত্র উপায়;—আর কিছু নাই।

বিগত ১৬ই মার্চ্চ দিল্লীতে যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে এই "নিপীড়িত জাতির উন্নতি" (Elevation of the deparessed classes) বিষয়িণী আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় শ্রীযুক্ত রেগিনেল্ড ক্রেডক্ মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন।

"With regard to the submerged classes whose position in life was due only to poverty, the problem was one of diffusion of wealth. * * * with the development of irrigation, improvements in agriculture and manufactures, * * these

must also better their position ইহার ভাবার্থ এইরূপ ;—"সমাজে ধন সম্পদের বিস্তৃতি দ্বারা নিম্নশ্রেণীর লোকের এই দারিদ্র্য মূলক দুরবস্থা দূরীভূত হইতে পারে। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবস্থা ভাল হইয়া উঠিবে"। এই কথাটী আমাদের অনেক কর্ম্মী পুরুষের মাথায় আসে নাই। তাঁহারা স্কুল-কলেজ খুলিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, কিন্তু মুচি মেথরের ছেলেরা স্কুলে পড়িবার মাসিক বেতন, পুস্তকের মূল্য, জামা জুতার খরচ ইত্যাদি কোথায় পাইবে, তারপর যাহারা কলেজে আসিয়া জুটিল, তাহাদের বোর্ডিং চার্জ্জের সহিত চা, চুরুট, ফুট্‌বল, টেনিসের খরচের টাকা কোন ভূতে যোগাইবে, এই সকল কথা তাঁহারা ত ভাবেন না। তাঁহারা খোঁজ করিলে জানিতে পারিবেন যে কেবল বর-পণের টাকা সংগ্রহ করিতেই গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্থ হয় না ;—বিশ্ববিদ্যালয় যে পণের টাকা চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে তাহা কাহারও হিসাবে আসে না। এক ছেলের পড়ার খরচে দুই মেয়ের বিবাহ খুব চলিয়া যায়। যাহা হউক এই বহুব্যয়-সাধ্য শিক্ষা প্রচারের নিমিত্ত ইস্কুল কলেজ করিয়া, নিম্নশ্রেণীয় লোকদিগকে চাকুরীর জন্য আরও প্রলুব্ধ করা হইতেছে মাত্র। চাষার ছেলে লাঙ্গল গরু বেচিয়া ধার কর্জ্জ করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিল ; তারপর দুইকুল হারাইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিম্নশ্রেণীর লোকগণকে অল্পব্যয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারিব, ততদিন তাহাদের দুর্গতি ঘুচিবে না।

ভারতবর্ষের বার আনা লোক কৃষিশিল্পজীবি। অথচ এই দেশে কৃষি শিল্প বিদ্যালয় একেবারে নাই বলিলেই হয়। শিক্ষার প্রচারের কথা উঠিলেই আমরা পল্লীগ্রামের ঘাড়ে কতগুলি স্কুলকলেজ চাপাইয়া ফিলান্‌থ্রপির (হিতৈষণার) পরাকাষ্ঠা দেখাই। এদিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ও খুব হইতেছে ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বেহার বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়, মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়, আবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। খ্রীষ্টানগণ ও বৌদ্ধগণ আশাকরি আর চুপ করিয়া থাকিবেন না। তারপর ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাদিবার নিমিত্ত ইস্কুল কলেজও স্থানে স্থানে নূতন ফ্যাসানে তৈয়ারী হইতেছে ; বেনারস সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ, আলীগড় মুসলমান কলেজ, দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি, বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এই সকল বিদ্যালয় সেণ্টজেভিয়ার অথবা স্কটিশ্‌চার্চ্চের অনুকরণে গঠিত কিনা তাহা জানিনা। তবে বোধহয় খ্রীষ্টান মিশনারীগণ যে ইস্কুল কলেজের শিক্ষার সঙ্গে বাইবেল ক্লাস, ও ছাত্রগণের থাকিবার জন্য বোর্ডিং খুলিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। যাহাহউক শিক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্মী পুরুষগণের এইসমস্ত আয়োজন প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু দরিদ্রের উদরে ত এই রাজভোগ্য পলান্ন সহ্য হইবেনা। এরমধ্যেই সমাজ দেহে যে গুরুতর ব্যাধি দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ, আমরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপেক্ষা করিয়াছি। বিগত ১১ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিতরণ উৎসব (Convocation for the conferring of degrees) উপলক্ষে ভাইস্ চ্যান্‌সেলার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন,

তাহাতে তিনি এই প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা বলিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটী কথার উল্লেখ করিব। একস্থলে তিনি বলিয়াছেন—

Last year in a somewhat feeble and uncertain voice I ventured to long for days when we could have a Faculty of Commerce and Industry, to assist us in solving problems of material prosperity with the aid of advanced scientific and economic ideas, for propagation of which some provision has already beed made. The time is fast approaching, if it has not long come, when the University must assist in the economic development of the country and in the fostering of material prosperity. Properly-equipped establishments teaching the principles of these subjects will soon be some of the most important parts of all up-to date Universities. We cannot for all times continue to be a imitation of the earlier Universities of the west and give the go-bye to modern ideas that are elsewhere prevailing

তাঁহার এই উক্তির মর্ম্ম এইরূপ ;—"আজ কাল দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাপর বিষয়ের সহিত বাণিজ্য, ব্যবসা, কৃষিশিল্প এই সকল বিষয়ের অধ্যাপনার আয়োজন করিতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিস্ফল হইবে। পাশ্চাত্য দেশের পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুকরণ করিলে আমাদের আর চলিবে না।"

অবশ্য অর্থাভাবে ও অপরাপর নানা অসুবিধার গতিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা সত্ত্বেও কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক অধ্যাপনার আয়োজন করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোটী টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে কি পুষার কৃষি বিদ্যালয়ের মত একশতটী কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারিত না? সেই টাকাতে কি দেশের লোককে বাণিজ্য ব্যবসা শিখাইবার বন্দোবস্ত করা যাইত না? যে টাকা ব্যয় করিয়া রংপুরে ও পাবনায় কলেজ স্থাপিত হইতেছে, তাহাতে কি দশটা এমন কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারিত না, যাহাতে দেশের চাষা ভুসারা তাহাদের নিজের ভাষায় কৃষিবিদ্যা শিখিতে পারে? স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে ইংরেজ-সেনাপতিগণের জীবনচরিত বিতরণের বন্দোবস্ত কি নিতান্ত দরকার? এই সব দেখিয়া মনে হয়, আমরা কচি খুকীর মত আঁচলে চাবির গোছা ঝুলাইয়া গিন্নী সাজিতে চাই। ইহাতেই মনে হয়, আমরা প্রয়োজন বিচার করিনা ;—ইহাতেই মনে হয় আমাদের কথায় ও কার্য্যে এক নহে। যাঁহারা দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য লাট্ দরবারে বক্তৃতা করেন, যাঁহারা কৃষিশিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই সকল স্কুল কলেজ স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করেন, উদ্যোগী হইয়া থাকেন ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। অবশ্য হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কি প্রণালীতে শিক্ষা বিস্তার করিবেন,

কি উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে আমরা জানি না; তবে হিন্দুর পবিত্র তীর্থভূমি কাশীধামে অবস্থিত বলিয়া আমাদের মনে হয় ধর্ম্মশিক্ষা প্রচারই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা মনে করি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিশেষত্ব কখনও পরিস্ফুট হইবে না। কারণ হিন্দু ধর্ম্মানুগত শিক্ষা বিস্তারের এই প্রকারেব পাশ্চাত্য প্রণালী ভারতের সনাতনী প্রকৃতিব অনুমোদিত নহে। ভারতে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ভার এখনও ভারতেব সাধুগণেব উপর অর্পিত আছে। এখনও হিমাচলস্থিত শান্তরসাস্পদ আশ্রমসমূহে সংসার বিরাগী সন্ন্যাসিগণ সনাতন ধর্ম্মের প্রদীপ জ্যোতিঃ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, এখনও বিন্ধ্যগিরির নিভৃত কন্দরে সাধুজন নিত্য বিরাজ করিতেছেন; এখনও প্রয়াগে হরিদ্বারে পঞ্চবটীতে উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসীর সমাগম হয়, ভারতের প্রতি নদীর কূলে কূলে, প্রতিগিরির মূলে মূলে, এখনও শত শত তীর্থ স্থান রহিয়াছে, অধঃপতিত হইলেও এখনও গুরু করণ ও দীক্ষাগ্রহণ প্রথা হিন্দুসমাজ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, এইরূপ অবস্থায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন। ভারতেব ঋষিগণ এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন যাহাতে ভারতে ধর্ম্ম-শিক্ষার কার্য্য আপনা আপনি (automatically) চলিতে থাকে। আমাদেব মনে হয় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তঃ বেতনভোগী রামায়ণের প্রফেসর আসিয়া লেক্‌চার দিয়া যাইবেন, আর চুরুট পায়ী ছাত্রগণ তাহা নোট করিয়া একজামিনেব জন্য প্রস্তুত হইবে। বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্বেষ বর্ত্তমান সময়োপযোগী হইবে কি না তাহাও ভাবিবার বিষয়। এই ভাবিয়াই কি রাজপ্রতিনিধি লর্ডহার্ডিঞ্জ বাহাদুর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উৎসব উপলক্ষে সমবেত শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন :—

Not to let their ambitions be satisfied with merely having a chair of Technology, (which the munificence of an Indian Prince has fittingly endowed in Lord Hardinge's name), but should steadily keep before them the aim of creating colleges or departments of Agriculture and Commerce among other things so that the University may be "a place of many-sided activities prepared to equip the young for all the various walks in life that go to the constitution of modern society, able to lead their countrymen in the path of progress, skilled to achieve new conquests in realms of Science, Arts, industry and social well-being, and armed with the knowledge, as well as the character, so essential for the development of the abundant resources of India." উহার সারমর্ম্ম এই :—

আমি আশা করি আপনারা আপনাদের উদ্যম শিল্প-শিক্ষার জন্য একজন অধ্যাপক নিয়োগেই পর্য্যবসিত না করিয়া যাহাতে কৃষি, শিল্প, ও বাণিজ্যের কলেজ স্থাপনে দেশের যুবকদিগকে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান শিক্ষায় পারদর্শী করতঃ দেশের মঙ্গলসাধন করিতে পারেন তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান হইবেন।

যাঁহার অনুগ্রহে ও চেষ্টায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, আশা করি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁর এই উপদেশ গ্রহণ করিবেন। তিনি শীঘ্রই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন; যাইবার সময় তিনি যে সার কথা কহিয়া গেলেন, তাহা আমাদের সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহার কথাকে আমাদের পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করা উচিত, কারণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব ভিত্তি প্রস্তর তাঁহাব করস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প ভারতের অন্নবস্ত্র সংস্থান করিবে; যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্য হইতে আমরা কৃষি-শিল্প দূরে রাখিব ততদিন আমরা কেবল মরীচিকা ভ্রান্ত পথিকের মত যন্ত্রণা ভোগ কবিব। লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষি ও বাণিজ্য শিক্ষা দিবার আয়োজন কবিতে যে উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশকে আমাদের আদেশস্বরূপ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই উক্তিতে এতদুর মুগ্ধ হইয়াছেন, এবং তিনি ভবিষ্যতেব জন্য এতদূব আশান্বিত হইয়াছেন যে তিনি ১১ই মার্চ্চেব বক্তৃতায় তাহা গোপন রাখিতে পারেন নাই, তিনি বলিয়াছেন—

The thoughts, hopes and aspirations that these words roused in my mind on the banks of the ever-inspiring holy river on that memorable day came back to me with renewed vigour when your Excellency was opening the Commercial Museum in this city a fortnight ago, and bore eloquent and willing testimony to the number and the quality of many articles manufactured in Bengal and entirely unknown to your Excellency. It cannot be denied that a bread-winning education as some sneeringly call it, is necessary for many. But everything learnt as a prepartion for taking part in the commercial or economic battle of life need not be absolutely or necessarily divorced from culture Changing conditions must also bring about change in our ideas if pace is to be kept with times. Bombay which had its Faculty of Commerce before, has just decided also on a Faculty of Agriculture and Benares may soon have hers. How long will Bengal, rich in agricultural resources and not very backward in Commerce and Industry, lag behind?

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব্বেই বাণিজ্য বিষয়ে অধ্যাপনা হইত। সম্প্রতি তথায় কৃষি বিদ্যা শিখাইবার আয়োজন হইয়াছে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও শীঘ্রই বোধ হয় কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক অধ্যাপনা আরম্ভ হইবে। বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এখনও কৃষিবিদ্যা অথবা বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছে। যে প্রকার বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা মনোবৃত্তি সমূহের যথার্থ বিকাশ ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের সহিত অন্নসংস্থান সমস্যার মীমাংসা হয়, সেই প্রকাব শিক্ষাই আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকের প্রয়োজন,

এ কথা অস্বীকার করা যায় না সুতরাং সাধারণ লোকের (তাহারা depressed classই হউক আর নিম্নশ্রেণীই হউক) উন্নতিসাধন করিতে হইলে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত দেশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে করিতে হইবে। যাহারা নিত্য মাতা বসুমতীর স্নেহের দান ফলমূল শস্য সম্পদ লইয়া খেলা করিতেছে যাহারা নিত্য বিচিত্র শিল্প-সম্ভার সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে, যাহারা বিশাল সমাজের অন্ন-সংগ্রহে নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা কেহ কেহ অগ্রাহ্য করিতেছি ; আবার যাঁহারা তাহাদের দুরবস্থার কথা ভাবিতেছেন তাঁহারাও তাহাদের জন্য নিষ্প্রয়োজনীয় কতগুলি বিষয় শিক্ষার আয়োজন করিতেছেন। কাব্য, ইতিহাস, ফিলজফি, ফাইলোলজি, এ সকল থাকুক, যাঁহারা বিত্তাবিলাসী, এ সব তাঁদেরই সাজে। তার পর ধর্ম্মশিক্ষা। দীর্ঘ-সত্র মহারাজ শ্বেতকির আহুতি উদরস্থ করিয়া অনলদেব দীপ্তিহীন ও গ্লানিযুক্ত হইয়াছিলেন ; ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধর্ম্মানুশীলনে তৎপর থাকিয়া তেমনি গ্লানিযুক্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত ভোজনে যেমন মন্দাগ্নি (ডিস্‌পেপ্‌সিয়া) হয়, সেইরূপ। এক্ষণে কিছুই যেন আর হজম করিবার শক্তি নাই। ডাক্তারগণ বলেন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইতে সকল রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। সমাজ দেহের বিশাল অংশ যে কৃষক ও ব্যবসায়ী শ্রেণী তারাই একেবারে বিকল, তাহাদিগকে সুস্থ করিতে না পারিলে সমাজের স্বাস্থ্য লাভ হইবে না। অগ্নিদেবতা যেমন কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যে খাণ্ডব-দাহন করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন, আমরাও তেমনি গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে কৃষি-শিল্পে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়া দেশের দুর্গতি মোচন করিতে সমর্থ হইব। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় কার্লাইল সারকুলারের তাড়নায় যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, তখন এই ধর্ম্ম-শিক্ষার কথা লইয়াই মতভেদ হয়। শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন অস্বীকার করিয়াছিলেন। অন্যান্য সভ্যগণকে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থায় বিশেষ উদ্যোগী ও কৃতসংকল্প দেখিয়া তিনি নিজব্যয়ে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বেঙ্গল টেক্‌নিকেল ইনষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তাহা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্ভূক্ত হয়। এক্ষণে উভয়েই প্রায় বিলুপ্ত। তার পর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল চাকুরীর উমেদার, অথবা ধর্ম্ম ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হয় তবে আমরা বলি, এই কোটী টাকায় চাষাদের জন্য কৃষি বিদ্যালয় ও মিস্ত্রীদের জন্য শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই ভাল হইত।

শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ।

বজ্‌রার মস্‌জিদ।

পূজার বন্ধ। কিন্তু এবার আর বাড়ী যাওয়া অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। অবকাশ-কালের জন্য বিদ্যালয়ের ভার আমার স্কন্ধে চাপাইয়া একে একে সকল বন্ধুগণই স্বীয় স্বীয় গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। প্রথম কয়েকদিন কোন প্রকারে কাটাইলাম। কিন্তু শেষে দিন আর কাটিতে চায় না। দিনগুলি বড় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। নোয়াখালী জিলার পল্লী-দর্শনের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বহুদিন যাবৎ হৃদয়ে উত্থিত হইয়াছিল। এখন এই নির্জ্জন-বাস ও সহরের একঘেয়ে দৃশ্যাবলী নূতন করিয়া আবার সেই আশা হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিল। কিন্তু বহুদূরে যাওয়ার উপায় নাই, খালী বাসা ফেলিয়া এক রাত্রির জন্যও অন্যত্র থাকার আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। তাই নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে দর্শনীয় কিছু আছে কিনা তাহা ভাবিতে লাগিলাম।

রেলপথে নোয়াখালী গমনাগমনকালে অনেক দিন যাবৎ একটি মস্‌জিদ্ দেখিয়া আসিতে-ছিলাম। আমার প্রিয় ছাত্রগণের নিকট সেই মস্‌জিদ সম্বন্ধে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে সেই মস্‌জিদ্‌টি অতি প্রাচীন। নোয়াখালীর প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শনের ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহের ইচ্ছা আমাকে অনেক দিন যাবৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তাই যখন আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ মফিজুদ্দিন আমাকে বজরা দর্শনের নিমন্ত্রণ করিল, তখন আর তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। বজরা যাওয়ার দিন ধার্য্য হইল।

২৯শে অক্টোবর শুক্রবার ভোরে ৫৷৷০টার গাড়ীতে নোয়াখালী হইতে বজরা রওনা হইলাম। বজরা নোয়াখালী হইতে বেশী দূর নয়; মাত্র ১২ মাইল। তাই দেখিতে দেখিতে ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে করিয়াছিলাম বজ্‌রা ষ্টেসন বজরা গ্রামেই, অবস্থিত; কিন্তু শুনিতে পাইলাম যে, যে স্থানে বজরা ষ্টেসন অবস্থিত তাহার প্রকৃত নাম চাঁদপুর। কিন্তু এই লাইনে চাঁদপুর নামে আর একটি প্রধান ষ্টেসন আছে বলিয়া এই ষ্টেসনের নাম বজরা রাখা হইয়াছে। প্রকৃত বজরা গ্রাম এই ষ্টেসন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। ষ্টেসনে অবতরণ করিয়াই দেখিতে পাইলাম, একজন লোক আমাদের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লাইন ধরিয়া তাহার সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। কিছু দূরে যাইয়া একখানা 'কোন্দা' নৌকা দেখিতে পাইলাম। এই নৌকায় আমাদিগকে খাল পার হইয়া বড় রাস্তায় পৌছিতে হইবে।

তখনও বর্ষাকাল। মাঠ সকল জলের নীচে। কাজেই মাঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়ায় সুবিধা ছিল না। সেই নৌকায় একখানা মাঠ ও খালটি পার হইয়া বড় রাস্তায় গিয়া পড়িলাম। এই পথটি অতি সুপ্রশস্ত এবং নোয়াখালী হইতে কুমিল্লা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার একটি শাখাপথ বজরা হইয়া রামগঞ্জের দিকে গিয়াছে। সেই শাখা পথের পশ্চিম পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড দিঘী অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। সেই দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে আমাদের দর্শনীয়

মস্‌জিদ্‌টি সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দর্শকের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক প্রাচীন কীর্ত্তি-গাথা ও বিক্রম-কাহিনী জাগাইয়া তুলিতেছে।

স্থানটি অতি মনোরম। সম্মুখে এক বিস্তৃত অৰ্দ্ধখনিত জলাশয়। অর্দ্ধভাগের তীরভূমি অতি উচ্চ, এবং প্রাচীন অশ্বত্থ ও তিন্তিড়ি বৃক্ষে সুশোভিত। পূর্ব্বতীর সুদীর্ঘ তৃণাবৃত থাকিয়া এক শ্যামল শোভা ধারণ করিয়াছে। দক্ষিণ তীরে শ্রেণীবদ্ধ সুপারী গাছেব অন্তরালে জমীদারদের স্থাপিত বাজীকরদিগের বংশধরগণের পর্ণাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র কুটীরগুলি শোভা পাইতেছে। পশ্চিমতীরে ভগ্নাবশিষ্ট অপূর্ব্ব সোপানাবলী মস্‌জিদের নিম্নপ্রদেশ হইতে জলাশয়গর্ভে অবতরণ করিয়াছে। মসজিদের এক পার্শ্বে ইষ্টক নিৰ্ম্মিত কতকগুলি সমাধি-চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। মসজিদের দক্ষিণ দিক দিয়া এক প্রশস্ত পথ জমীদার বাড়ীর দ্বারদেশে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ জমীদার বাড়ীর সেই সৌন্দর্য্য ও শোভা আর নাই। মনোরম গৃহাবলী-পরিশোভিত স্থান আজ ভগ্নাবশেষ চিহ্নপূর্ণ ও তৃণ গুল্মাবৃত। একদা যে স্থান জনকোলাহল ও আনন্দধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত থাকিত, এখন সেই স্থান বন-বিহঙ্গেব কল-কূজনে মুখরিত। মানব-বাস-ভূমি আজ শ্বাপদ-সেবিত অরণ্যভূমিতে পরিণত। সেই জমীদার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে যে পরিখা খনিত হইয়াছিল, এখন তাহা খালে পরিণত হইয়া কৃষকদেব গমনাগমনের ও ক্ষেত্রে জল সেচনের পথ করিয়া দিতেছে। সেই বাড়ীর চতুর্দ্দিকে, দুই একখানা মাঠ ব্যবধানে, কতকগুলি গ্রাম আছে। সেই গ্রামগুলির নাম অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলাম, যে সেই নামগুলি জমীদারদের পূর্ব্ব কীর্ত্তির আভাস প্রদান কবিতেছে। জমিদারগণেব স্থাপিত তেলিগণের বাসস্থান হেতু, বোধ হয়, একটি নাম হইয়াছে তিলিপাড়া, শীলগণেব আবাস-স্থান বলিয়া, বোধ হয়, অপব একটি গ্রামের নাম হইয়াছে শীলবৃদ্ধি; যেস্থানে জমীদারদেব নিজ আবাস-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই গ্রাম বজবা নামে পরিচিত ছিল।

এই নামের সঙ্গে একটা পৌবাণিক কাহিনী বহুদিন যাবৎ জড়িত হইয়া রহিয়াছে। বজরা শব্দের অর্থ বড় কোষ নৌকা। এক পীর সাহেব এইরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং তাঁহার বজবা তীর সংলগ্ন করেন। তৎকাল অবধি এই স্থান বজরা নামে পরিচিত হয়। অদ্যাপি সেই পীব সাহেবের দরগার চিহ্ন সেখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থানীয় মুসলমানগণের মধ্যে এই স্থান পরম পবিত্র। তাহারা এখানে আসিয়া প্রায়ই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি লাভের জন্য পীর সাহেবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া নানা প্রকার বলি ও উপহার প্রদান করেন। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন পীর সাহেবের সম্মানার্থ এই স্থানে একটি মেলা মিলিত হয়। স্থানটি আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে কয়েক খান উচ্চ ভিটি ভিন্ন এখন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। এইরূপ একটি স্থানে পীর সাহেবের স্মৃতিরক্ষা কল্পে কোন প্রকাব চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত নাই, ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে।

কথিত আছে দিল্লীতে মিঞা অম্বর নামে এক পীর সাহেব ছিলেন। তিনি সংসার বিরাগী ও বিগত-স্পৃহ ছিলেন। সর্ব্বদা ঈশ্বরধ্যানে ও ধর্ম্মালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। রাজধানীর জন কোলাহল ও কর্ম্ম-ব্যস্ত-মানবের অস্থির জীবন তাহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি একটি নির্জ্জন শান্তিময় স্থানের অন্বেষণে এক বজরায় বহির্গত হইলেন। তখন গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানগুলি অতিশয় জনাকীর্ণ ছিল এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান রূপে সর্ব্বদাই বণিক্‌গণের কোলাহলে মুখরিত থাকিত। তাই তিনি বজরা আরোহণে ধীরে ধীরে গঙ্গা নদী প্রবাহের সঙ্গে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গঙ্গা ও মেঘনার সঙ্গম স্থানে, আশে পাশে যে সকল নূতন ভূমি গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে সকল স্থানে তখনও জনমানবের পদচিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না। সে স্থান ঘোর অরণ্যাচ্ছাদিত ও হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি ছিল। এইরূপ স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অবশেষে তিনি বর্ত্তমান বজরা নামে পরিচিত স্থানে আসিয়া তাঁহার তরী তীরসংলগ্ন করিলেন। এই স্থানের নির্জ্জনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। ধ্যান ও ঈশ্বর-চিন্তার সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া এই স্থানকেই তিনি তাঁহার দরগা স্থান বলিয়া নির্ব্বাচন করিলেন। তদবধি এই স্থান মিঞা অম্বর বা পীর অম্বরের দরগা বলিয়া কথিত হয়।

পীর অম্বরের অবস্থান অবধি এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। যে জন-কোলাহলে বিরক্ত হইয়া পীর সাহেব দিল্লী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার সেই জন-কোলাহল আরম্ভ হইল। প্রথম প্রথম সাধু দর্শনে বহুলোক আগমন করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে তাহারা সেখানেই আবাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে জমির অভাব ছিল না। নদী স্রোত প্রবাহিত পলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত নূতন ভূমি বলিয়া স্থানটি অত্যন্ত উর্ব্বর ছিল। গৃহস্থগণ অতি অল্প আয়াসেই যথেষ্ট প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিত। কাজেই দিন দিন সেখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যে স্থান এক সময়ে দুর্ভেদ্য বনরাজিতে আবৃত থাকিয়া ভীমকায় ভয়ঙ্কর প্রাণিগণের আবাস স্থান ছিল তাহা এখন মনোহর শিল্প-নৈপুন্য-পরিপূর্ণ গৃহরাজিতে পরিশোভিত হইয়া নিরীহ নরকুলের লীলা নিকেতন হইয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে এই গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ লোকালয়ে পরিপূর্ণ হইল এবং দিন দিন জঙ্গল কর্ত্তন করিয়া গৃহস্থগণ ভূমি আবাদ করিতে আরম্ভ করিল। কৃষিকার্য্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল, এবং বাণিজ্য কেন্দ্র বা বন্দরের সৃষ্টি হইল।

সেই সময় দিল্লীতে আমান-উল্লা খাঁ ও সোনা-উল্লা খাঁ নামে দুই ভ্রাতা মোগল বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা মোগল সম্রাটের নিকট কিঞ্চিৎ নিষ্কর ভূমি প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে বজরা ও তৎসংলগ্ন স্থান প্রদান করেন। তখন যদিও এই সকল স্থানে মানুষের বসতি হইয়াছিল, তথাপি এক প্রান্তবর্ত্তী স্থান বলিয়া এখানে মোগল আধিপত্য

ততদুর বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ এইস্থান পর্ত্তুগিজ দস্যু ও মগ্‌দের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত, এবং তাহাদের অত্যাচারে সর্ব্বদা প্রপীড়িত হইত। কাজেই মোগল সম্রাট্ তাঁহার অধীনস্থ ও আজ্ঞাধীন এই দুই ভ্রাতাকে সেই ভূভাগ নিষ্কর প্রদান করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

বজরায় আমান উল্লা খাঁ ও সোনা উল্লা খাঁর অখণ্ড প্রতাপ ছিল। তাঁহাদের ভয়ে সকলে অস্থির থাকিত। তাঁহাদের বেতনভোগী বরকন্দাজগণ এবং তাঁহাদের রক্ষিত লাঠিয়ালগণ যখন রণবেশে সুসজ্জিত হইয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে বহির্গত হইত, তখন তাঁহাদের পরাক্রমশালী শত্রুগণও বিপদ্ গণিয়া অনন্য মনে আত্মরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। প্রজাগণ তাঁহাদের কঠোর শাসনে কখনও ঔদ্ধত্য বা চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতে সাহসী হইত না। একদিকে তাঁহারা যেরূপ প্রজাপুঞ্জের ভীতি সঞ্চার করিতেন, অপরদিকে বাৎসল্যগুণে তাঁহারা সকলকেই আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রজাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁহারা একেবারে উদাসীন ছিলেন না। তাহাদের জমীদার পুরী সর্ব্বদা দীন দুঃখীর জন্য উন্মুক্ত-দ্বার ছিল। প্রজাগণের আনন্দ বর্দ্ধনকল্পে সময় সময় নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান করা হইত। তখন সেই বজরা গ্রামে যে আনন্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইত, তাহাতে মগ্ন হইয়া প্রজাগণ বিমল সুখ উপভোগ করিত। প্রতিবৎসর পুণ্যাহের দিনে লোক সমাগমে জমীদার পুরী এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। নহবতের সুশ্রাব্য-বাদনে দিগ্‌দেশ প্রতিধ্বনিত হইত; জন কোলাহলে সমস্ত পুরী মুখরিত ও সঞ্জীবিত হইত।

আমান উল্লা খাঁ ও সোনা উল্লা খাঁ ধর্ম্মপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান মুসলমান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দৈনন্দিন ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহারা কখনও শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই, এবং প্রজাগণ যাহাতে ধর্ম্মকার্য্যে রত থাকে তজ্জন্য সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত মস্‌জিদ এখনও সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রাণতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। নমাজ গৃহে ও প্রাঙ্গণে জুম্মার দিনে সেখানে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইত। এখনও শুক্রবার দিন সেখানে ন্যূনাধিক পাঁচ শত লোক তাহাদের আকুল প্রার্থনা খোদতাল্লার পাদপ্রান্তে সমর্পণ করিয়া বিমল শান্তি অনুভব করে। শুক্রবার দিন এখানে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দলে দলে, আবালবৃদ্ধ সকলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কাহারও হস্তে দুগ্ধপূর্ণ পাত্র, কাহারও হস্তে মিষ্টান্ন, কাহারও হস্তে নারিকেল বা অন্যান্য ফল, কাহারও হস্তে বাতাসা, কাহারও স্কন্ধে ধান, চাউল, বা অন্য কোন শস্য। সকলেই মসজিদে ভোগ প্রদানার্থ উপস্থিত হইয়াছে মস্‌জিদের ক্ষতির আকুলপ্রাণে কাতর-কণ্ঠে যখন উচ্চৈঃস্বরে আজানধ্বনি উচ্চারণ করেন, তখন যে যেখানে থাকে, সকলে সেই মসজিদ গৃহে ধাবমান হয়; দেখিতে দেখিতে শত শত ইসলামভক্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গৃহে ও প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হয়। ভেদাভেদ বিস্মৃত, জ্ঞানী অজ্ঞান, ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ, সকল লোকের এরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ মুসলমান ধর্ম্মের এক সম্মোহন চিত্র।

কারুকার্য্যে খচিত ও চিত্রিত বিচিত্রিত প্রস্তরখণ্ডে পরিশোভিত হইয়া, এই মস্‌জিদটি এখন তরলতার চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছে। গভীর ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া আমান উল্লা খাঁ যখন এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন, তখন তাহাতে এরূপ কোনও তরলতা ব্যঞ্জক সৌন্দর্য্য ছিল না, কিন্তু তাহার গাম্ভীর্য্য সকলের প্রাণে ভক্তির সঞ্চার করিত। এই উপাসনা গৃহটি দৈর্ঘ্যে ৩২ হাত এবং প্রস্থে ১৪ হাত, ইহার উচ্চতা প্রায় ৩০ হাত। গৃহটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণাকৃতি ইষ্টক নির্ম্মিত। প্রাচীরসমূহ প্রায় তিন হাত পুরু। তিনটি গুম্বজ উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়াছে। তাহাদের মস্তকোপরি তিনটি ক্ষুদ্র কলসী স্থাপিত। এই কলসীগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত, কিন্তু এখনও এগুলি অভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। সম্মুখে আটটি, পশ্চাতে আটটি এবং দুই পার্শ্বে আটটি বুরুজ দণ্ডায়মান থাকিয়া উপাসনা গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সম্মুখে তিনটি দরজা। চৌকাটগুলি কাল প্রস্তর নির্ম্মিত, এখনও অবিকৃত রহিয়াছে। মসজিদের সম্মুখে প্রাঙ্গণ ভূমি প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত, একটি মাত্র দ্বার আছে, তদ্দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়।

মসজিদের মধ্য দ্বারের উপরিভাগে এখনও ক্ষুদ্র প্রস্তর গাত্রে আরবী অক্ষরে কয়েকটি ছত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে। অক্ষরগুলি বেশ সুস্পষ্ট। কিন্তু আরবী-ভাষা-জ্ঞান-রহিত আমার নিকট সেগুলি দুর্ব্বোধ্য রেখামাত্র প্রতীয়মান হইল। আমি সেই শিলা লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য মসজিদের মোল্লার সাহায্য প্রার্থী হইলাম। তিনি অতি ভদ্রতার সহিত আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিম্নপ্রদেশ হইতে তিনি সেগুলির প্রকৃত পাঠ স্থির করিতে অসমর্থ হইলেন। আমি দেখিলাম আমার সমস্ত উদ্দেশ্য এখানে পণ্ড হইতে চলিল। আমি ভগ্ন মনোরথ না হইয়া, স্থানীয় জমিদার কর্ম্মচারীদের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। তাহারা সদয় ভাবে আমার অনুরোধে একটি "মৈ" সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। সেই "মৈ"এর সাহায্যে মোল্লা সাহেব সেই উৎকীর্ণ-লিপির পাঠোদ্ধার করিলেন। তিনি সেই লিপির একখানা প্রতিলিপি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিলেন। আমি পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ তাহা এখানে অবিকল তুলিয়া দিলাম।

بسم الله الرحمن الرحيم

لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه و على آله و اصحابه و سلم

حراغ و مسجد و محراب و منبر ؛ ابوبكر و عمر عثمان و حيدر

در امام محمد سه ده دادار * امان ! اله بداود امن بنت عمار

خسرو ... اران ... * بدان مسجد ... ان اى سكر عمار

سنه ۱۱۵۴ هجري

"পরম দয়ালু ও দাতা পরমেশ্বরের নামে আরম্ভ হইল।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই। হজরত মহাম্মদ আল্লার প্রেরিত। তাঁহার উপর ও তাঁহার বংশাবলীর উপর ও তাঁহার অনুবঙ্গগণের উপর শান্তি অর্পিত হউক।

১) আবু বকর, ওমর, ওশমান ও হয়দার ইহার প্রদীপ ও উপাসনাগার, খিলান ও মঞ্চ স্বরূপ।

(২) ন্যায়বান মহাম্মদ শাহের সময়ে আমান উল্লা ঈশ্বরের এই গৃহকে প্রস্তুত করিয়াছে।

৩) বুদ্ধি বলিল, এই তারিখ হইতে ইহার নাম হইয়াছে। হে ঈশ্বরের কৃতজ্ঞ ভক্ত এই উপাসনা-গৃহে উপাসনা কর—সন ১১৫৪ হিজরি।'

এই শিলা লিপি হইতে আমরা অবগত হই যে, ১১৫৪ হিজ্‌রিতে দিল্লীর সম্রাট্ মহাম্মদ শার রাজত্ব কালে, আমান উল্লা খাঁ এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। এখন হিজরি ১৩৩৩ চলিতেছে সুতরাং এই হিসাবে দেখা যায় যে (১৩৩৩—১১৫৪) ১৭৯ বৎসর পূর্ব্বে এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। হিজরি সনের পরিবর্ত্তে, আমরা যদি খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে মোটামটি ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে (১৯১৬—১৭৯) এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে ইতিহাস কাহাকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে ১৭১৯ হইতে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাম্মদ শা দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইল যে বজরার মসজিদ মহাম্মদ শার রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব সেই শিলা-লিপি লিখিত তারিখ আমরা নিঃসন্দেহে প্রকৃত তারিখ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

এই মসজিদ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নোয়াখালীর তৎকালীন শিল্প নৈপুণ্যের গৌরব-স্তম্ভ-স্বরূপ ইহা এখনও অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত কত নূতন মসজিদ কালসাগরে বিলীন হইয়াছে, কত ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও বজরার মসজিদ প্রায় দুইশত বৎসরের সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া মোগল শাসন সময়ে নোয়াখালী স্থপতি বিদ্যায় কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই মসজিদের অনুকরণে নির্ম্মিত, কিঞ্চিৎদূরে অবস্থিত, আরও একটি মসজিদ দেখিতে পাইলাম। কিন্তু নির্ম্মাণ-কৌশলে, কি শিল্পচাতুর্য্যে, কি আয়তনে, কি প্রাচীনত্বে, বজরার মস্‌জিদের সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে না। এই মস্‌জিদের দ্বারদেশের উপরিভাগেও একটি শিলালিপি দেখিতে পাইলাম। তাহাতে আরবী অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে মহাম্মদ রেজা কর্ত্তৃক ১২০৩ হিজরিতে ইহা নির্ম্মিত হয়। এই মহাম্মদ রেজা, বোধ হয়, বজরার জমিদারদের একজন কর্ম্মচারী ছিল। তিনি তাহার সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহারার্থ জমিদারদের অনুকরণে এই ধর্ম্ম গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই মসজিদের অনতিদূরে এখনও একটি বিস্তৃতায়তন বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা স্থানীয় লোকদিগের নিকট পাটওয়ারী বাড়ী

বলিয়া পরিচিত। মহাম্মদ রেজার পুত্র "আকবর পাটওয়ারী" নামে সুপরিচিত ছিল। ইহারা, বোধ হয়, সেই জমিদারের পাটওয়ারী ছিল।

বজরার মস্‌জিদ অপেক্ষা প্রাচীনতর সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ নোয়াখালীতে আরও বিদ্যমান আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। নোয়াখালার প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে হইলে এইরূপ প্রমাণ সংগ্রহের নিতান্ত প্রয়োজন। প্রমাণ-সিদ্ধ ঐতিহাসিক তত্ত্ব যত সংগৃহীত হইবে, ততই নোয়াখালার গৌরব বর্দ্ধিত হইবে, ততই নোয়াখালীর যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইবে; পরম্পরাগত প্রবাদ যত প্রচারিত ও লিখিত হইবে ততই প্রাচীনের প্রতি লোকের অনুরাগ ও মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয় নাই বলিয়া, বঙ্গের খ্যাতনামা ভূস্বামী লক্ষণ মাণিক্যের নাম আমাদের নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তাহার বাসভবন অদ্যাপি অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া "অলীক বাজ পুরীর" ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি বিজ্ঞতর দেশ-হিতৈষী শিক্ষিত লোকগণ নোয়াখালার লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার সাধনার্থ লেখনী ধারণ করেন, তাহা হইলেই আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম্‌ এ, বি, টি,

শেষ বাসনা।

(১)

জীবনের অবসানে শ্রান্ত দেহে যবে
ঘুরিবে আমার প্রাণ বিশ্রাম আশায়,
তখন যেন গো পাবি কুটীর আমার
বাঁচতে সুন্দর বন-বিটপী ছায়ায়।
কানন কুসুমচয় যেন চারিধারে,
শীতল মলয়ানিলে সৌরভ ছড়ায়,
ছোট ছোট পাখীগুলি বসি বৃক্ষ শাখে
সঙ্গীত সুধায় যেন পরাণ জুড়ায়।

(২)

মনে বড় সাধ চঞ্চল সলিলা
তটিনী বহিবে সেই কুটীরের দ্বারে
সাঁঝের বেলায় আসিয়া দেখিব
রবির কিরণ সেথা কিবা খেলা করে।
মৃগশিশুগণ আসিয়া দাঁড়াবে
আনন্দে নাচিয়া মোর ক্ষুদ্র আঙ্গিনায়।

সুকোমল তৃণ দিব মুখে তুলি
দিব হাত বুলাইয়া তাহাদের গায়।
তারকা খচিত সুন্দর আকাশ
হবে চন্দ্রাতপ চারু কুটীরে আমার।
রবি শশী তারা দেখিব বসিয়া
ভাসিবে পরাণ মন আনন্দে অপার।

(৩)

উষারাণী যবে আসিয়া দাঁড়াবে
বিচিত্র সাজেতে আপনি সাজিযে,
স্মরিয়া প্রভুর অপার করুণা
পূজিব তাঁহারে প্রীতিপুষ্প দিয়ে।
দিবা অবসানে কুটীরে আমার
নাহি রবে যবে রবি-কর ভাতি,
ভক্তি-অর্ঘ্য দিযে পূজিব তাঁহারে
যতনে জ্বালায়ে চারু সন্ধ্যাবাতি।
বিভুর চরণে জানাব তখন,
'পূরায়েছ শেষ বাসনা আমার,
শুধু এ মিনতি এ জীবন পরে
পাই যেন স্থান চরণে তোমার।'

শ্রীসুবর্ণলতা দাশ গুপ্তা সরস্বতী।

স্ত্রীশিক্ষা।

অদ্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া "নোয়াখালীর" পাঠকমহাশয় বর্গকে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিগণের অনুশাসনমূলক কিঞ্চিৎ লিপিমুখে নিবেদন করিতেছি।

নারীগণের ইহলোক ও পরলোকের বিশুদ্ধ সুখসাধন একমাত্র পতিসেবা, ইহা অশেষ হিন্দু-শাস্ত্রই সমস্বরে শঙ্খনাদে উদ্ঘোষিত করিয়াছে। পরন্তু এমনও দুই একটি মত দেখা যায় যে, পতিসেবা ব্যতীত কৌমার, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়নে অনুষ্ঠানেও নারীগণের ইহলোকে পূজ্যতা ও পরলোকে ব্রহ্মপদ লাভ ঘটিতে পারে। যথা মহর্ষি হারীত বলেন—

"দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়োঃ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নমগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা বধূনাস্তু উপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিদুপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্য ইতি। (পরাশর মাধব)

অর্থ -স্ত্রীলোক দুই প্রকার, এক ব্রহ্মবাদিনী, দুই সদ্যো বধূ। এই দুয়ের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মবাদিনী, তাহাদের উপনয়ন সংস্কার সায়ংপ্রাতঃ হোম বেদাধ্যয়ন এবং স্বগৃহেই পিত্রাদির নিকট হইতে ভিক্ষান্নদ্বারা প্রাণধারণ করা, ইহাই নিয়ম। আর যাহারা বধূ, তাহাদের বিবাহের দিনে যে কোনওরূপে উপনয়ন মাত্র করাইয়া বিবাহ সংস্কার করাইবে।

ইহাতেই বুঝা যায় যে স্ত্রীলোকের সামান্য লেখাপড়ার কথা আর কি বলিব? বেদাধ্যয়ন পর্য্যন্ত তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রানুমোদিত ছিল। উপর্য্যুক্ত হারীতের বচনে কোনরূপ সময়ের নির্দ্দেশ না থাকায়, বর্ত্তমান সময়েও কেনই বা স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার থাকিবে না, ইহা অনেকের মনে উঠিতে পারে। এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্যই মহর্ষি যম সুস্পষ্ট বচনে স্ত্রীলোকের উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নাদি বর্ত্তমান শ্বেত বরাহ কল্পে নহে, ইহা বলিয়াছেন। যথা---

"পুরাকল্পেতু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা॥
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতাবা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্য্যা বিধীয়তে॥"

(পরাশর মাধব)

অর্থ -স্ত্রীলোকের উপনয়ন সংস্কার বেদাধ্যয়ন সাবিত্রী জপ ইত্যাদি পূর্ব্ব কল্পে অর্থাৎ গত মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বিহিত ছিল। বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্বেতবরাহ কল্পে নহে। পূর্ব্বকল্পেও বেদাধ্যয়ন কার্য্যটি পিতা, খুড়া ও জ্যেঠার কাছেই করিবে। বাহিরের শিক্ষক মাষ্টারের নিকট কখনো নহে। যেমন আত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি কয়েকটীমাত্র।

এখন এই একটি কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সত্যযুগে স্ত্রীলোকের শাস্ত্র-শিক্ষার রীতি ছিল কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে দুষ্মন্ত পত্নী শকুন্তলার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে পারি। দেখিতে পাই অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তকে পদ্মপত্রে যেরূপ ভাষায় পত্র লিখিতেছিল। যথা

"তুজ্ঝ ন আনে হিঅয়ং,
মহউন কামো দিবা বি রত্তিং বি।
নিগ্ঘিন দবেই বলিয়ং,
তুয়ি বুত্তমনোরহাযিং অঙ্গায়িং॥

অর্থ—হে নির্দ্দয়! আমি তোমার হৃদয়ের ভাব জানি না, কিন্তু আমার অঙ্গ সকলের তোমাতেই মনোরথ প্রবৃত্ত হইয়াছে, এজন্য সেই অঙ্গ সকলকে দিবারাত্রি কাম (অভিলাষ) দগ্ধ করিতেছে।

এই লেখা বাস্তবিক শকুন্তলার বলিয়া বোধ হয় না। ইহা কবির কল্পিত নাটকের লক্ষণানুরোধে রসাভিব্যক্তির জন্য প্রকটিত হইয়াছে মাত্র। কেন না মূল মহাভারতে শকুন্তলোপাখ্যানে ইহার নাম গন্ধও নাই। অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, বৃক্ষবাটিকা, মৃগশাবক,

আলবালে জল সেচন ইত্যাদি কিছুই নাই। মহাভারতে আছে কেবল সাদাসিধা এই :— মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ছিলেন না, ফলাহরণের জন্য বনান্তরে গিয়াছিলেন। সেই সময় রাজা দুষ্মন্ত উপস্থিত হইলেন। শকুন্তলা যথাবিধি আতিথ্য সৎকার করিলেন। পরস্পর আলাপে সমস্ত জানা শুনা হইল। উভয়ের দাম্পত্যানুরাগ জন্মিল। রাজা গন্ধর্ব্ব বিধানে পাণিগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিলে শকুন্তলা তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মহর্ষির অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিন্তু রাজা গান্ধর্ব্ব বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ইহা শাস্ত্রদ্বারা প্রতিপাদন করিলেন।

যথা মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৩ অধ্যায়—

"ফলাহারো গতো রাজন্ পিতা মে হত আশ্রমাৎ।
মুহূর্ত্তং সংপ্রতীক্ষস্ব স মংতুভ্যং প্রদাস্যতি॥ ৫॥

অর্থ—(রাজন্) এই মাত্র আশ্রম হইতে আমার পিতা কণ্ব মহর্ষি ফল আহরণার্থ গিয়াছেন। মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, তিনি আমাকে আপনার হস্তে যথাবিধি সংপ্রদান করিবেন। তদুত্তরে দুষ্মন্ত কহিলেন,

"আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব গতিরাত্মৈব চাত্মনঃ।
আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্ত্তুমর্হসি ধর্ম্মতঃ॥ ৭॥
অষ্টাবেব সমাসেন বিবাহা ধর্ম্মতঃ স্মৃতাঃ।
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ॥ ৮।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ।
তেষাং ধর্ম্মান্ যথা পূর্ব্বং মনুঃস্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥ ৯॥
প্রশস্তাংশ্চতুরঃ পূর্ব্বান্ ব্রাহ্মণস্যোপধারয়।
ষড়ানুপূর্ব্ব্যা ক্ষত্রস্য বিদ্ধি ধর্ম্মাননিন্দিতে॥ ১০॥

অর্থ—(দুষ্মন্ত বলিলেন) নিজেই নিজের বন্ধু নিজেই নিজের উপায়, অতএব ধর্ম্মানুসারে নিজেই নিজেকে দান করিতে পার। হে সুন্দরি! স্মৃতিশাস্ত্রে ধর্ম্ম-বিবাহ আট প্রকার। যথা—১ ব্রাহ্ম (নিজের বাড়ীতে বরকে আনাইয়া যথাশক্তি অলঙ্কৃতা কন্যাদান) ২—দৈব (অগ্নিহোত্র যজ্ঞে দীক্ষিত পুরোহিতকে কন্যাদান) ৩—আর্ষ (বর হইতে দুইটী গো গ্রহণ করিয়া কন্যাদান) ৪—প্রাজাপত্য (তোমরা দুইজনে দাম্পত্য ধর্ম্ম আচরণ কর, এই বলিয়া কন্যাদান) ৫—আসুর (বর হইতে ধন গ্রহণ করিয়া কন্যাদান) ৬—গান্ধর্ব্ব (বর ও কন্যা দুইজনের অনুরাগ জন্মিলে পরস্পর তুমি আমার পত্নী হও, তুমি আমার পতি হও, এরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক কন্যার আত্মসমর্পণ। অথবা আমার গর্ভে যে পুত্র হইবে তাহাকে রাজা করিতে হইবে ইত্যাদি যে কোনরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ) ৭—রাক্ষস (যুদ্ধ করিয়া কন্যাহরণ পূর্ব্বক বিবাহ) এবং ৮—পৈশাচ (নিদ্রিতাবস্থায় বা উন্মত্তাবস্থায় বা নির্জ্জনে কন্যা অপহরণ করা) উক্ত পৈশাচ বিবাহ অতি গর্হিত।

উক্ত অষ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে ক্রমে পূর্ব্ব চারিপ্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্রমশঃ ষট্‌প্রকার অর্থাৎ পূর্ব্ব চারিপ্রকার; গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রশস্ত। ইহাতে ধর্ম্ম নষ্ট হয় না ইহা স্বায়ম্ভুব মনুর মত॥ ১০॥

শকুন্তলা বলিলেন—

"যদি ধর্ম্মপথস্ত্বেষ যদি চাত্মা প্রভুর্ম্মম। * * *

যদ্যেতদেবং দুষ্মন্ত! অস্তু মে সঙ্গমস্ত্বয়া॥" ১৭॥

অর্থ—হে দুষ্মন্ত! যদি তাহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ না হয়, যদি আত্ম-সমর্পণ করিতে সমর্থা হই, তবে তোমার সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ হউক। (উক্ত শ্লোক ব্যাস কৃত)

ইহাতে শকুন্তলার পত্র লেখার কথা নাই। এবং শকুন্তলা গান্ধর্ব্ব বিবাহ যে একটা আছে, তাহা জানিত না, সুতরাং বুঝা যায় যে শকুন্তলা শাস্ত্রাধ্যয়ন করে নাই। এই গেল সত্যযুগের কথা।

ত্রেতা যুগে সীতাচরিত্রে দেখা যায়—সীতার সংস্কৃতভাষাজ্ঞান ছিল। কেননা অশোক-বনে হনুমান প্রচ্ছন্নভাবে সীতাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে ছিল যে, আমি সীতার সহিত কোন ভাষায় আলাপ করিব? যথা—

"অহংহ্যতিতনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ।

বাচঞ্চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহসংস্কৃতাং

যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাং।

রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥ (সুন্দরা, ৩০।১৭)

অর্থ—আমি বিশেষরূপে আরও ক্ষুদ্রতনু বানর হইব। এবং বিশুদ্ধ লৌকিক দেশ-ভাষায়ই কথা কহিব। যদি আমি ব্রাহ্মণের মত সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করি, তবে সীতা আমাকেই ছদ্মবেশ রাবণ মনে করিয়া ভীতা হইবেন।

ইহাতেই বুঝা যায় সীতা সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন বা সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারিতেন।

এখন দ্বাপর যুগের স্ত্রী শিক্ষা আলোচ্য—কেহ কেহ মহাভারতের এই শ্লোক দেখিয়া বলেন

"প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা।

অথ কৃষ্ণা ধর্ম্মরাজ মিদং বচনমব্রবীৎ।" (মহাভা, বন, ২৭।২

অর্থ—তৎপরে প্রীতিভাজন সুন্দরী পণ্ডিতা এবং পতিপরায়ণা দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়াছিল।

এই শ্লোকে কৃষ্ণার (দ্রৌপদী) বিশেষণ পণ্ডিতা এই পদটা আছে। অতএব দ্রৌপদীর শাস্ত্র শিক্ষা ছিল। কেননা বেদ বেদান্তগামিনী বুদ্ধির নামই পণ্ডা, সেই পণ্ডা যাহার আছে সেই পণ্ডিতা। কোষকার হেমচন্দ্র বলেন "পণ্ডা তত্ত্বানুগা বুদ্ধিঃ" অর্থাৎ যে বুদ্ধি যথার্থ অর্থকে বিষয় করে তাহার নাম পণ্ডা। যাহাই হউক, ইহাতে দ্রৌপদীর শাস্ত্র শিক্ষা ছিল বলিয়া

স্পষ্টই বুঝা যায় না। এমনও বুঝা যাইতে পারে যে, দ্রৌপদীর বুদ্ধি অতি নির্ম্মলা, বেদ বেদান্ত বিষয় বুঝিতেও কুণ্ঠিতা হয় না। অথবা তাহার বুদ্ধিতে প্রকৃত তত্ত্বকেই বিষয় করে বিপরীত অর্থকে স্পর্শই করেন না। সুতরাং দ্রৌপদীর দৃষ্টান্তে দ্বাপরযুগে স্ত্রীশিক্ষা সমর্থিতা হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণপত্নী রুক্মিণী স্বয়ম্বরের পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ দ্বারা কৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন। সুতরাং তৎকালে স্ত্রীলোকের লেখাপড়ার প্রথা ছিল। রুক্মিণী লেখাপড়া জানিতেন, ইহার মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে তাহা এস্থলে বিবেচ্য। প্রথমতঃ দেখা যায় সর্ব্ববাদিসঙ্গত বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশ ষড়বিংশতি অধ্যায়ে রুক্মিণী হরণ বৃত্তান্ত বেদব্যাস লিখিয়াছেন। তাহাতে কৃষ্ণের নিকটে লোক এবং তদ্বারা পত্র পাঠাইয়াছিলেন ইহার নাম গন্ধও নাই। তৎপরে মহাভারতেরই অন্তর্গত হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্ব ৫৯ অধ্যায়ে রুক্মিণী হরণ প্রসঙ্গ বিস্তৃতরূপে বিবৃত আছে। তাহাতেও বেদব্যাস রুক্মিণী প্রেরিত পত্রবাহকের ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই। তৎপরে এখন শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৫২ অধ্যায়ে রুক্মিণী হরণ বেদব্যাস লিখিয়াছেন—

"তদবেত্যাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী দুর্ম্মণা ভৃশং।
বিচিন্ত্যাপ্তং দ্বিজং কঞ্চিৎ কৃষ্ণায় প্রাহিণোদ্‌ দ্রুতং॥"

অর্থ— অসিতাপাঙ্গী রুক্মিণী শিশুপালের সহিত নিজের বিবাহ হইবে ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া কৃষ্ণকে আনিবার জন্য বিশ্বস্ত এক ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়াছিলেন।

ভগবান্ কৃষ্ণ সমাগত ব্রাহ্মণকে স্বয়ং সমাদরপূর্ব্বক আহারাদি সম্পাদন করাইয়া বিশ্রামের পরে ব্রাহ্মণের নিকটে উপস্থিত হইয়া অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—*

"সর্ব্বং মে কথ্য গুহ্যং চেৎ কিং কার্য্যং করবাম তে।
এবং সংপৃষ্ট সংপ্রশ্নো ব্রাহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনা।
লীলা গৃহীত দেহেন তস্মৈ সর্ব্বমবর্ণয়ৎ॥"

অর্থ—(ব্রহ্মন্।) যদি গোপনীয় কিছু না হয় তবে সকল বৃত্তান্তই আমার নিকটে বলুন। আমি আপনার কি কার্য্য করিব অনুমতি করুন। ভগবান লীলার জন্য গৃহীত দেহ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ তাহাকে সকলই বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিল।

কে? ইহাতে কি বুঝা যায় যে, রুক্মিণী পত্র লিখিয়াছিলেন? কিন্তু রুক্মিণীর উক্তি রূপে নিবদ্ধ ব্যাস রচিত শ্লোকের আভাসে টীকাকার শ্রীধরস্বামী পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা "রুক্মিণ্যুবাচ—

"শ্রুত্বাগুণান্ ভুবন সুন্দর শৃণ্বতাংতে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈ হরতোহঙ্গতাপং।
রূপংদৃশাং দৃশিমতা মখিলার্থলাভং,
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥ (৩৭)

অর্থ—হে অচ্যুত! হে ভুবন সুন্দর! যাহারা তোমার গুণসমূহ শ্রবণ করে, সেই গুণ রাশি তাহাদের কর্ণরন্ধ্র দ্বারা প্রবেশ করিয়া সন্তাপ হরণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ তোমার গুণ শ্রবণ করিলে তাহাদের অঙ্গ শীতল হয়। এবং যাহাদের চক্ষু আছে তাহাদের যে রূপদর্শনে সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়, সেই তোমার গুণ ও রূপের বিষয় শুনিয়া আমার নির্লজ্জচিত্ত তোমাতে আসক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকের আভাস শ্রীধরস্বামী এইরূপ দিয়াছেন। যথা-

"রুক্মিণ্যা স্বয়মেকান্তে লিখিত্বা দত্ত পত্রিকাং।
মুদ্রামুন্মোচ্য কৃষ্ণায় প্রেমচিহ্নমদর্শয়ৎ॥
ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণানুজ্ঞয়া বাচয়তি শৃন্বেতি"

অর্থ—রুক্মিণী নিজে নির্জ্জনে লিখিয়া পত্রখানাকে মুদ্রাঙ্কিত (মোহর) করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু সেই পত্রের মুদ্রা উৎপাটীত করিয়া কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা দেখাইয়াছিল। পরে কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে ব্রাহ্মণ ঐ পত্র পড়িতে আরম্ভ করিল।

টীকাকার উক্ত পত্র লেখা, পত্রে মোহর করা ইত্যাদি কোথায় পাইলেন; ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া পাইলাম না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের শেষ উক্তিতে আছে এই, যথা—

"ইত্যেতে গুহ্যসন্দেশা যদুদেব ময়া হৃতাঃ।
বিমৃশ্য কর্তুংযচ্চাত্র ক্রিয়তাং তদনন্তরং॥" (৫৪)

অর্থ—হে যদুদেব! এই সমস্ত গোপনীয় সংবাদ আমি আহরণ—আনয়ন করিয়াছি, এখন বিবেচনা করিয়া অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন।

এই ব্রাহ্মণের উক্তি পূর্ব্ব শ্লোকের "তস্মৈ সর্ব্বমবর্ণয়ৎ" এবং এই শ্লোকের "গুহ্যসন্দেশ" এই দুইটী পদ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ কেবল সংবাদবাহক মাত্র, পত্রবাহক নহে।

আর যদি পত্রই রুক্মিণী লিখিয়া থাকেন, তবে বলিতে হইবে যে "শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর" ইত্যাদি সকল শ্লোকই রুক্মিণীর রচিত, বেদব্যাসের নহে। তাহা হইলে বড়ই গোলের কথা। যদি "রুক্মিণ্যুবাচ" অর্থাৎ রুক্মিণী কহিয়াছিল; কি কহিয়াছিল? না, শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর ইত্যাদি শ্লোক কহিয়াছিল। সুতরাং সেই সকল শ্লোকই রুক্মিণীর রচিত বলিতে হইবে। যদি তাহাই হয় তবে বেদব্যাস বেচারা কি রচনা করিল? ভাগবতে যত "উবাচ" আছে যেমন "নন্দ উবাচ" "যশোদা উবাচ" "গোপ্যঃউচুঃ" "পক্ষিণউচুঃ" "সর্প উবাচ" "গর্দ্দভ উবাচ" ইত্যাদি বালকবালিকা নন্দ যশোদা গোপী পক্ষী এবং গাধা ইত্যাদি সকলেই লেখা পড়া জানিত, সকলেই সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে জানিত, ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি সত্য সত্যই তাহা রুক্মিণীর রচিত শ্লোক হইত তবে গ্রন্থকার অবশ্যই তাহা মুক্তকণ্ঠে উল্লেখ করিতেন। যেমন "ভগবদ্গীতা, যাহা ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শ্লোকাকারে বলিয়াছেন, তাহা ব্যাসদেব নিজেই বলিয়াছেন, যথা—"ষট্শতানি সবিংশানি শ্লোকানা মাহকেশবঃ" (মহাভা, ভীষ্ম, ৪৩।৪)

অর্থ—গীতাতে ছয়শত বিশটি শ্লোক (৬২০) স্বয়ং কেশবই কহিয়াছেন।

অতএব আমার অনুমান টীকাকার নিজে উক্ত পত্রের কথা লিখেন নাই। কিন্তু রসিক চূড়ামণি কথক মহাশয়েরা বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ও শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনার্থ ঐ পত্র লেখার কথা লিখিয়া দিয়াছেন। আর একটী কথা—যে বেদব্যাস বিষ্ণুপুরাণ রচনা করিয়াছেন, মহাভারতীয় হরিবংশও তাঁহারই রচিত। কিন্তু তিনিই আবার একই বিষয় নিজের লেখার বিপরীত বচনা করিলেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তবেই বলিতে হইবে যে, বিষ্ণু-পুরাণ ও মহাভারতের রচয়িতা এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের রচয়িতা এক বেদব্যাস নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতেব রচয়িতা অপব কেহ বেদব্যাসের নাম দিয়া গ্রন্থ রচনা কবিয়াছেন। এই কথাটাকে "শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ নহে, অর্থাৎ বেদব্যাসেব বচিত নহে, দেবীভাগবতই প্রকৃত মহাপুরাণ, অর্থাৎ বেদব্যাসেব রচিত" এই চির প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তীরই অপর প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে। মহাভাবতের টীকাকাব মহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টই দেবীভাগবতেরও টীকারচনা করিয়াছেন। তিনি দেবীভাগবতের টীকার প্রারম্ভে ঘোরতর বিচাব এবং অনেকানেক বচন প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, দেবীভাগবতই প্রকৃত মহাপুবাণ এবং বেদব্যাসেব রচিত। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ নহে, এবং বেদব্যাসেব রচিতও নহে। জনপ্রবাদ এইরূপ—নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় যে কোনও সংশয়িত বিষয় নিশ্চয় করিবার জন্য "নখী" (হাতচালা) দৈব বিত্মাব প্রথা ছিল। নখী বিত্মাটা এইরূপ —পবিত্র স্থানে একটি ৫।৭ বৎসরের বালক বা বালিকাকে বসাইয়া নখীবিদ্যাবিৎ তাহাদেব মস্তকে ও হস্তের উপরে মন্ত্রজপ কবিতে থাকে। তখন সেই বালক বা বালিকা দক্ষিণ হস্তেব তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সংস্কৃত শ্লোকে উত্তর লিখিয়া দিত। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে উক্ত প্রক্রিয়া করায় নখী দেবতা এই শ্লোকটা লিখিয়াছিল, যথা—

"পদেপদে কঠিনতা নৈষারীতির্ম্মহাত্মনঃ।
"কন্যকুব্জ প্রদেশেতু কৃতো ব্যাসসমেন বৈ॥"

অর্থ—পদেপদে অর্থাৎ আদ্যন্ত সমগ্র গ্রন্থেই সংস্কৃত শ্লোক ভাষায় দুরূহ কঠিনতা, ইহা মহাত্মা বেদব্যাসের রচনার রীতি নহে। পরন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানা কান্যকুব্জদেশীয় ব্যাসসদৃশ কোনও পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে।

ইহার তত্রত্য সকল পণ্ডিতই স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে, সেই কান্যকুব্জদেশীয় ব্যাসতুল্য পণ্ডিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের বচয়িতা কৃষ্ণভক্ত বোপদেব গোস্বামীই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, বেদব্যাস রচনা করেন নাই। কেননা দেবীভাগবত ও মহাভাবতের রচয়িতা বেদব্যাসের লিপি প্রণালী অতি সরল। আর শ্রীমদ্ভাগবতের রচনা তাহার অত্যন্ত বিপরীত। উপর্য্যুক্ত জনরবের উপর নির্ভর করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের রুক্মিণীহরণের প্রসঙ্গে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহা তর্কস্থলে স্বীকার করিলেও ঋষিবাক্য বলিয়া স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ প্রমাণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ—যদি রুক্মিণীদেবী সরস্বতীর অবতার

হইতেন, তবে না হয় স্বীকার করা যাইত যে তিনি লেখাপড়া জানিতেন। কিন্তু সকল পুরাণই রুক্মিণীকে লক্ষ্মীর অবতার বলিয়াই স্বীকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচ্য রহিল; অদ্য এ পর্য্যন্তই।

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ।

বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার

দ্বিতীয় প্রস্তাব *

আজকাল যাঁহারা মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই এফ্ এ পাশ অথবা বি, এ ফেল; সুতরাং তাঁহারা সকলেই পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র অল্প-বিস্তর জানেন। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আই, এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া যান, তাঁহারা অনেকেই হয়তঃ কলেজে বিজ্ঞান-শাস্ত্র পড়েন না। এমন কি বিজ্ঞানকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া আজকাল বি, এ, এম্, এ পাশ করাও চলে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে সুবিধা এখন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে অন্ততঃ এফ্ এ পর্য্যন্ত সকলকেই বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র বেশ ভালরকম পড়িতে হইত। আগেকার দিনে এণ্ট্রান্স পাশ করিতে হইলেও একটু বিজ্ঞান শিখিতে হইত। ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর শ্রেণীতেও পদার্থবিদ্যা ও প্রাকৃতিক ভূগোল পড়ান হইত। এখন সমস্তই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এই বিজ্ঞানের যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় আজকাল এমন গ্রাজুয়েট্ সকল তৈয়ারী হইতেছেন, যাহারা মনে করেন গ্রামোফোণের বাক্সটার ভিতর হইতেই শব্দ বাহির হয়, যাহাদের বিশ্বাস টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া ছেঁদা আছে; বিদ্যুতের পাথার ভিতরে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দেখিয়া যাঁহারা ভয়ে সরিয়া যান। পরীক্ষায় পাশ করিবার সুবিধা করিতে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জ্ঞানের পথে বাধা প্রদান করিয়াছে। এফ্, এ পর্য্যন্ত সকলকেই বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে বাধ্য রাখিলে ক্ষতি ছিল কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক এস্থলে মূলতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কার্য্যতঃ প্রয়োজন বিধায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নব বিধানের সমালোচনা করিতে হইল। আজকালকার মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টারগণ সম্ভবতঃ বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পারদর্শী না হইলেও তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই অন্ততঃ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাংলা পুস্তকগুলির আলোচনা দ্বারা অনেক বিষয় জানিতে পারেন। প্রধান পণ্ডিত যিনি থাকেন, তিনি সাধারণতঃ নর্ম্যাল অথবা ট্রেণিং স্কুলের পাশকরা পণ্ডিত। পূর্ব্বেকার নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষার আদর্শ অপেক্ষা বর্ত্তমান আদর্শ অনেক হীন হইয়াছে, তথাপি আজকাল যাঁহারা নর্ম্যাল স্কুল হইতে পাশ করিয়া মাইনর স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদগ্রহণ করেন, তাঁহারা নিজের বুদ্ধিবলেই বৈজ্ঞানিক বিষয় অনেকটা শিখিয়া লইতে পারেন। তারপর প্রত্যেক গ্রামেই আজকাল বিজ্ঞান-বিশারদ অন্ততঃ দুই একজন গ্রাজুয়েট্ আছেন;

* নোয়াখালীর প্রথম সংখ্যায় (মাঘ ১৩২২) প্রথম প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ তাহারই অনুবৃত্তি। লেখক।

মাইনর স্কুলের শিক্ষকগণ তাঁহাদের নিকট অনেক বিষয়ে সাহায্য পাইতে পারেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি চাষাদিগকে বিজ্ঞানের উচ্চতত্ত্ব সকল শিখাইতে হইবে না। পল্লীগ্রামের শিক্ষকগণ কৃষক ও শিল্পিগণের সহিত সুপরিচিত; নিম্নশ্রেণীর লোকগণের * সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সমস্তই তাঁহারা ভালরূপে জানেন, সুতরাং তাঁহারা যত সহজে কৃষকগণকে ও ব্যবসায়িশ্রেণীর লোকগণকে শিখাইতে পারিবেন, তত সহজে সহরের গ্রাজুয়েট্ বাবুরা পারিবেন না। নগরনিবাসী শিক্ষাভিমানী গ্রাজুয়েট্ বাবুগণ বসন্তের কোকিলের মত বৎসরের মধ্যে দুই মাস যাইয়া গ্রামে থাকেন,—যেমন তেলে-জলে; তাঁহাদের মধ্যে সে সহানুভূতির ভাব সহজে আসে না, যাহাতে তাঁহারা কৃষকের সহিত শস্যক্ষেত্রে, গোপালের সহিত গোচারণ ভূমিতে, পণ্য ব্যবসায়ীর সহিত বিপণি বীথিকায়, অথবা শিল্পকারের সহিত কর্ম্মশালায় দণ্ডায়মান হইতে পারেন। পল্লীগ্রামে মাষ্টার পণ্ডিত মহাশয়গণের সম্মান এখনও আছে। যেখানে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে, সেইখানেই শিক্ষা সহজে সংক্রমিত হয়। অতএব পল্লীগ্রামের শিক্ষকগণকে আমরা বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচার কার্য্যে অনুপযুক্ত অথবা অক্ষম বলিয়া গণনা করিতে পারি না।

পল্লীগ্রামের স্কুলে যাহারা পড়ে, তাহারা অধিকাংশই,—এমন কি কোন কোন স্থলে সকলেই—কৃষক শ্রেণীর লোক। যাঁহারা অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য, তাঁহাদের সন্তানগণ সহরে থাকিয়াই বিদ্যাশিক্ষা করে। এই সকল কৃষিজীবিগণের পুত্রগণকে ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষার জন্য তৈয়ারী করিবার এখন কোন প্রয়োজন নাই। বর্ণ-জ্ঞান হইবার পরে, তাহারা যখন মোটামুটী পুস্তকাদি পড়িতে শিক্ষা করিবে, তখন সাধারণ সাহিত্যের সহিত তাহাদিগকে অঙ্ক ও তাহাদের ব্যবসায়ানুগত বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে কয়েক ঘণ্টা সময় স্কুলে পড়া-শুনা হয়, তাহার মধ্যে নিয়ম করিয়া প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময় যদি শিক্ষক মহাশয়গণ গোপালন, ভূমি-কর্ষণ, কৃষি-কার্য্য, মৎস্যের চাষ, ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছাত্রগণকে শিক্ষা দান করেন, তবে তাহারা এমন কতগুলি বিষয় জানিবে, যদ্বারা তাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পড়িতে না পরিলেও— দু'পয়সা রোজগার করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে খাইয়া থাকিতে পারিবে। তাঁহারা স্কুলের ছাত্রগণকে নানাপ্রকার সহজ-শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালীও শিখাইতে পারেন। কালী, কলম, টিনের অথবা কাঠের বাক্স প্রভৃতি তৈয়ারী করা, ভাঙ্গা ঘটী-বাটী থালা প্রভৃতি ঝালা (জোড়া) দেওয়া, কাঠের জিনিসে পালিশ ও বার্ণিশের কাজ, দর্জ্জির কাজ, পুস্তক বাঁধাই করা প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়োজনীয় অথচ সহজ শিল্পবিদ্যা তাহা-দিগকে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। এই স্থানে একটা কথা বলিয়া রাখি, অনেকে শিল্প-শিক্ষা দিতে যাইয়া সাবান, চুরুট, মোজা, এসেন্স, সুগন্ধি তেল এই সকল প্রস্তুত করিবার কৌশল শিখাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সকল সর্ব্বনেশে বিলাস দ্রব্য পল্লীগ্রামে

* চাষা, মিস্ত্রী, গয়লা, কামার, কুমোর, কলু ইহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর লোক বলা ঠিক নহে, কেবলমাত্র বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এই কথাটী ব্যবহার করিলাম। লেখক।

উৎপন্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে শিক্ষকগণ সকলে সাবধান হইবেন। যাহা প্রয়োজনীয়, কেবলমাত্র তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে। কোন কোন গ্রামে মাইনর স্কুলের সঙ্গে একটা সভাসমিতি আছে, প্রতি শনিবারে তাহার অধিবেশন হয়, ছাত্রগণ তাহাতে রচনা পাঠ করে, বক্তৃতা প্রদান করে, অবশ্য এইপ্রকার সভার উপকারিতা আছে স্বীকার করি, কিন্তু ছাত্রগণকে জীবিকা অর্জ্জনের সহায় স্বরূপ বিদ্যা-শিক্ষা দেওয়া কি তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় নহে? শিক্ষকগণ এই বিষয় একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এখনও অনেক বাংলা পুস্তকাদি পাওয়া যায়। লিখিবার লোকের অভাবও নাই। বিশ কি পচিশ বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর স্কুলে রীতিমত কৃষি বিদ্যাবিষয়ক পুস্তক পাঠ্য ছিল। আমার মনে আছে, আমরা যখন মাইনর স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি (অনুমান ইংরেজী ১৮৯৪) তখন কালীময় ঘটক প্রণীত "কৃষি শিক্ষা" ও গিরিশচন্দ্র বসু প্রণীত "কৃষি-সোপান" পড়িয়াছিলাম। মাইনর শ্রেণীতে আমরা মহেন্দ্রবাবুর পদার্থ-বিদ্যা সম্পূর্ণ পড়িয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বে যোগেশবাবুর পদার্থ বিদ্যা পাঠ্য ছিল। এখন আর সে সকল পুস্তক দেখিতে পাই না। তবে আজকাল কৃষি বিষয়ক অনেক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, ও অনেক পুস্তকাদিও লিখিত হইতেছে।

পল্লীগ্রামের বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রগণ বেলা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করে। এই সময়টা কমাইয়া ১২ টা হইতে ৩টা করিলে ভাল। কারণ তাহাতে ছাত্রগণ তাহাদের পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সহিত নিজ নিজ ব্যবসায়ের কার্য্যে যোগদান করিবার অধিক অবসর প্রাপ্ত হয়। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের পড়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করিবার নিমিত্ত গামের ইস্কুলে ছুটীর পরিমাণ কমাইয়া দিলেও ক্ষতি নাই। অবশ্য এই পরিবর্ত্তন বিষয়ে যদি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অথবা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ আপত্তি করেন, তবে উপায়ান্তর নাই। যাহাহউক ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থা ও ব্যবসায় ভুলিয়া না যায়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিক্ষকগণ ছাত্রকে এত অধিক তাড়া দিবেন না, অথবা এত কাজের চাপ (home task) দিবেন না যাহাতে সে বাড়ীতে পিতামাতার সাহায্যে কোন কাজ করিতে না পারে। আমাদের দেশে কৃষকগণের পুত্র, কন্যা, বধূ সকলেই পরিবারের এক একজন সহায় স্তম্ভ। চাষার পাচটী ছেলে কর্ম্মক্ষম ও বলিষ্ঠ-দেহ হইলে, তার মাসে পঞ্চাশ টাকা মুজুরের খরচ বাঁচিয়া যায়। এমন কাজের ছেলেগুলিকে যদি শিক্ষক মহাশয়গণ দিনরাত ইস্কুলঘরে বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন, যদি ইতিহাস ভূগোলের পড়ায় চাপে তাহারা মাথা তুলিতে না পারে, যদি পাশের আশায় ও ফেলের ভয়ে তাহারা সর্ব্বদা অস্থির হইয়া পড়ে, তবে যে একেবারে মূলেই সর্ব্বনাশ। অনেক বারুই, বেণে, চাষাভূষার ছেলেরা পিতামাতার ও পারিবারিক কার্য্যের সাহায্যের ব্যাঘাত হয় বলিয়া স্কুলে পড়িতে পারে না। অথবা অনেক ছেলে একটু সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াই, নয় দশবৎসর বয়সে যখন একটু কাজ করিবার মত গায়ে জোর হয়, তখন স্কুল ছাড়িয়া দেয়। নিজেদের নিত্য কার্য্যে

নানাপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া, বহুকষ্ট-সঞ্চিত-অর্থ হইতে ছেলের পুস্তকের খরচ, কাগজ কলমের পয়সা ও মাসিক বেতন নিয়ম মত যোগাইয়া যাহারা কখনও উপবাস কখনও বা একবেলা খাইয়া রহিয়াছে, জমিদার মহাজনের খাজনা-সুদের কড়াকড়ির সহিত যাহারা মাষ্টারের তাগাদা সহ্য করিয়া শেষপর্য্যন্ত ছেলেকে স্কুলে রাখিয়াছে ; ছেলে পরীক্ষায় পাশ-করিয়া ঘরে আসিলে পর তাহারা দেখিল হায়! ছেলে যে কলম চালাইতেও শিখে নাই, লাঙ্গল ধরাও ভুলিয়া গিয়াছে,—ছেলে যে চাকুরী করিতেও অসমর্থ,—দাড়ি পাল্লা ধরিতেও নারাজ। এ যে কৃষকও নয়, কেরাণীও নয়—একটা নিস্প্রয়োজনীয় শিক্ষার বোঝা রাবিশের মত তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছে। সে যখন "আরংজীব ধূর্ত্ত ও কপটাচারী, আর লর্ড ডালহৌসী সদাশয় শাসনকর্ত্তা" এই সকল ইতিহাসের কথা মুখস্থ করিয়াছে, যখন সে "কাদায় জন্মে বলিয়া পদ্মকে পঙ্কজ" বলিতে শিখিয়াছে, যখন সে জানে যে সাহেবেরা পাগলা কুকুরকে "ম্যাড্ ডগ" বলে, তখন তার নেংটীর স্থলে পুরাপ্রমাণ ধুতির প্রয়োজন, অনাবৃত গাত্র অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত ; চুলের ফ্যাসানের সঙ্গে সঙ্গে একটু খানি আতর সাবান ও তেলের গন্ধেরও দরকার। শীঘ্রই পিতামাতার বড় সাধের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। আজ কাল কৃষকশ্রেণীর যে অবস্থা হইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয়, যাহাদের প্রধান অবলম্বন সন্তান সন্ততিগণ এইরূপে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় তাদের দুর্দ্দশা হইবে না—ত হইবে কার? যে ধানের ক্ষেতে পূর্ব্বে ত্রিশ মণ ধান হইত, এখন তাহাতে দশমণও হয় না ; লোকে বলে জমি খারাপ হইয়াছে ; মাতা বসুমতীর উপর অনুর্ব্বরতার অপরাধ আরোপ করিয়া সকলেই বিজ্ঞ হইয়াছেন। কিন্তু মাঠে কাজ করিবার লোক কোথায়? চারিদিক যে একেবারে শূন্যময়। যে বিশাল প্রান্তর ভূমি পূর্ব্বে শত শত কৃষকের আনন্দগীতে নিরন্তর পরিপূর্ণ থাকিত, যেই স্থানে অস্তগামী-সূর্য্যকর-রঞ্জিত বিচিত্র-মেঘখণ্ড সমূহের মত গোমহিষ-যথ সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিত, আজ সেখানে কিছুই নাই। যাহাদিগের পদভরে পুলক-চঞ্চলা মাতা বসুন্ধরা নিত্যকম্পিতা হইতেন, যাহাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে বসুমতীর বক্ষে স্নেহ রোমাঞ্চের মত ধান্যযবাঙ্কুর সমূহ উদ্গত হইয়া উঠিত, তাহারা আজ মাকে ছাড়িয়া স্কুল কলেজের দুয়ারে বৃথা ঠেলাঠেলি করিতেছে, আফিস আদালতের দিকে তাড়াতাড়ি ছুটিতেছে। মা তাই বড় অভিমানে আপনার ধনরত্ন সম্পদরাশি লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তাই আজ "ফাগুণে" আর "আমের বনে ঘ্রাণে পাগল" করেনা,—"অঘ্রাণে" আর "ভরা ক্ষেতে" সেই "মধুর হাসি" দেখিনা।

পল্লীগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষালয় সমূহ হইতেই আমাদের দেশের এই দুরবস্থার মূল প্রবাহ উত্থিত হইয়াছে। কার্য্যকরী বিষয় সকল শিক্ষা দিবার কোন বন্দোবস্ত তথায় নাই। গোড়াতেই কেরানী জীবনের দিকে লক্ষ্য। শিক্ষকগণ সেই লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিয়া যাহাতে কৃষক ও শিল্পিগণের জীবন যথার্থ পথে পরিচালিত হয়, তাহার উপায় করিতে পারেন। গ্রামের ছাত্রগণকে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বিদ্যা সমূহ শিক্ষা দিতে হইলে মূল বিজ্ঞান শাস্ত্রের

মোটামুটি কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইতে হইবে। রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যাকে বাদ দিলে চলিবে না। আজকাল মাইনর স্কুলে যে ভূগোলশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে, তাহাতে সাধারণ প্রাকৃতিক ও গণিত ভূগোল এই সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু একটু পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র জানা না থাকিলে এই বিষয়গুলি ছাত্রগণ বুঝিতে পাবে না ; সুতরাং তাহারা অনন্যোপায় হইয়া মুখস্থ বিদ্যায় কার্য্যোদ্ধার অর্থাৎ পাশ করে। তার পর মধ্যইংরেজী শ্রেণীর পাঠ্য সাহিত্য পুস্তকে "বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত", "মেঘ ও বৃষ্টি", ইত্যাদি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধে থাকে সে সকল বিষয় শিক্ষকগণ কিরূপে ব্যাখ্যা কবেন জানিনা। তবে আজকাল অনেকে গল্পের বৈঠকে জগদীশ বসুর উদ্ভিদের সাড়া, হার্টজেব বিদ্যুৎ তরঙ্গ, ম্যাডাম কুরীর রেডিয়াম্, জেপলিন্ সাবমেরিণ, টবপেডো ইত্যাদি নানা বিষয়েব প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বিজ্ঞানের আলোচনার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ কবেন। যিনি এই সকল বিস্ময়কর কাহিনীব বর্ণনা করেন, তিনি যেমন বুঝেন, শ্রোতারাও তদ্রূপ। পল্লীগ্রামের ইস্কুলে এইরূপ মজলিসি বিজ্ঞান শিক্ষাব কথা আমি বলিতেছি না ; প্রকৃত ছাত্রের মত (academically) প্রণালী বদ্ধ ভাবে, পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিয়া (Systematically) বিজ্ঞানের বিষয় সমূহ ধীবে ধীবে শিখাইতে হইবে। নিম্ন শ্রেণী হইতেই শিক্ষা দেওয়া যায়। অবশ্য এইরূপ শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষকগণের কুশলতা ও দক্ষতা থাকায় প্রয়োজন। এইরূপ ভাবে ছোট ছোট ছেলেদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার চেষ্টা যে প্রথমতঃ খুব দুরূহ তাহা স্বীকাব কবি, কিন্তু তাহাতে যখন আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল বিধান করিবে, তখন সেই চেষ্টা পরিত্যাগ কবা কর্ত্তব্য নহে। [Evaporation, Distillation, Condensation, Crystallisation, Chemical change, Precipitation, Filtration, Physical change,] এই সকল বৈজ্ঞানিক প্রণালী সমূহ ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া খুব শক্ত নয়। তাব পব একটুখানি যন্ত্র বিদ্যা (mechanics) শিক্ষা দেওয়াও কঠিন নয় ; সাধাবণ অঙ্কের মাথা যাদেব আছে, তাবা বেশ ধরিতে পারিবে। আজ কাল প্রাকৃতিক ভূগোল ও খগোল পড়াইতেও এইগুলিব দরকার হয়। এখন শিক্ষকগণ কিরূপে তাহা ছেলেদিগকে বুঝান তাহা জানিনা। ক্ষেত্রতত্ত্ব (Geometry) মাইনর স্কুলে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার সঙ্গে যদি চিত্র বিদ্যা (হাতে ও যন্ত্রেব সাহায্যে) শিখান হয়, তবে তাহা শিল্পিব সন্তানগণের খুব কাজে লাগে। Free-hand, Instrumental, Perspective এই তিন বকম চিত্র বিদ্যাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশের কামার কুমোব বা ছুতোরের ছেলেবা দা-কুড়ুল-হাঁড়ী, কলসী অথবা খড়ম-পিঁড়ে তৈয়ারী কবিবার নূতন ফ্যাসান বাহির করিতে জানে না। চিত্রবিদ্যায় অজ্ঞতাই ইহার কাবণ। শুধু চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াও অনেকে বেশ রোজগারের উপায় করিতে পারে।

যাহাহউক আমার তালিকা এখনই যতদূর হইয়াছে, তাহাতেই শিক্ষকগণ হয়ত ভয় পাইবেন, অথবা আমার সকল কথা অগ্রাহ্য করিবেন। যাঁহাব যতদূর ক্ষমতা, যেখানে যাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত, যেখানে যেরূপ সুবিধা তাহা বিবেচনা করিয়া এক বা

ততোধিক বিদ্যা শিখাইবার আয়োজন করিবেন। আজকাল অনেক গ্রামেই হাই-স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল হাই-স্কুলের শিক্ষকগণ যদি মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে এমন দুই একটী কার্য্যকরী বিজ্ঞান-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যাহাতে ছাত্রগণ প্রতিদিন ঘণ্টা খানেক কোন বিশেষ ব্যবসায়, শিল্প অথবা কৃষি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান শিখিবে, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, ছেলেগুলিকে ফুট্‌বল ক্রিকেট্‌ খেলায় না মাতাইয়া, প্রাইজ্‌ ডিষ্ট্রী-বিউসন্‌, এনিভাবসারি, ড্রামাটিক পারফরমেন্স্‌ এই সকল হুজুকে উৎসাহ না দিয়া, যদি তাঁহারা ছেলেদের ও তাহাদের পিতা মাতার প্রকৃত উপকার করিতে ইচ্ছা করেন, যদি দেশের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল ছাত্রগণকে যথার্থরূপে কর্ম্ম-ক্ষেত্রের উপযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এইরূপ আয়োজন করুন, যাহাতে চাষার ছেলে চাকুরী না পাইলেও স্বাধীন ভাবে বাড়ী বসিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে খাইয়া থাকিতে পারে; যেন কামারের ছেলে কেরাণী না হইলেও লোহা পিটিয়া ভাতের যোগাড় করিতে পারে; যেন জেলের ছেলে জজ সাহেব না সাজিয়াও মাছ বেচিয়া চিরকাল সুখে থাকিতে পারে। দেশের লোককে আর মিথ্যা মরীচিকার পশ্চাতে ছুটাইয়া কি হইবে:—এত ছট্‌ফটানি দেখিয়াও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, তবে আর কখন হইবে?

শিক্ষকগণ দরিদ্র হইলেও তাঁহাদের সম্মান অনেক বেশী, দায়িত্ব অতীব গুরুতর, কর্ত্তব্য পবিত্র ও মহান্‌। শিক্ষকগণ সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ করিবেন, এই সম্মান সমাজের চক্ষে নয়,—বিবেক বুদ্ধির সমক্ষে ও সর্ব্বোপরি ভগবানের নিকট। একটা জাতি গঠনের ভার এই শিক্ষকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের উন্নতি অথবা অবনতির জন্য শিক্ষকগণ দায়ী;—জাতির বিকাশ অথবা বিনাশের জন্য শিক্ষকগণ জবাবদিহি। এই দায়িত্ব অস্বীকার করিবার জো নাই। পাঠশালার পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের প্রফেসার পর্য্যন্ত কেহই গা বাঁচাইয়া চলিতে পারিবেন না। ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভাল মন্দ সব বিচার করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতে হইবে।

শিক্ষকগণ যেমন বালক ও যুবকগণকে পরিচালিত করিতে পারেন, তেমনি সাধারণ গৃহস্থগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন উকীল মোক্তারগণ। তাঁহারা গ্রামের গৃহস্থমণ্ডলীর সম্রাট্‌—ডাক্তার অর্থাৎ চিকিৎসক মহাশয়গণের প্রভুত্বও কিছু কম নয়। এই সম্রাট্‌সংঘ কিরূপে তাঁহাদের ক্ষমতায় অপব্যবহার করিতেছেন, কিরূপে তাঁহারা চেষ্টা করিলে গৃহস্থগণকে সুশিক্ষিত করিয়া নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক বিষয় বুঝাইতে পারেন, তাহা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্‌, সি।

প্রতীক্ষায়।

কত না কুসুম করেছি চয়ন পূজিব চরণ তব,
(তাই) সাজায়ে রেখেছি যতন করিয়া হৃদয়-সাজিতে মোর,
দীপটি জ্বালিয়া ধূপের ধূনায় আমোদি রেখেছি ওই।
কুসুম শুখায়, ঝরে পড়ে যায়, সে আর আসেনা সই।
স্নিগ্ধ সৌরভ মিশায় বাতাসে, নিভে যায় মোর বাতি,
গভীরা রজনী সমুখে আমার কেমনে কাটাব রাতি?
বসিয়া রয়েছি প্রতীক্ষায় তার,— চির জনমের সাথী,
চরণে দলিয়া পরাণ আমার কোথায় রয়েছে মাতি;
কতনা কুসুম করেছি চয়ন পূজিতে চরণ তব,
লবেনাকি অর্ঘ্য প্রাণেশ সুদূর, ভবনে আসিয়া মোর?

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন।

পল্লী-কথা

খিলপাড়া।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে সুরেশ্বর সিংহ রাঢ় দেশ হইতে ভুলুয়ায় আগমন করেন। তিনি তাঁহার পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে ভুলুয়ার রাজসরকারে কার্য্য করেন। কাল ক্রমে ভুলুয়ার রাজ সরকারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল সুরেশ্বর সিংহের প্রপৌত্র কবিরত্ন নারায়ণ ভুলুয়ার জমিদারীর কিয়দংশ বন্দোবস্ত করিয়া স্বীয় আবাস স্থাপন করেন। এক্ষণে যেস্থানে খিলপাড়া গ্রাম অবস্থিত তথায় পূর্ব্বে জঙ্গল ও জলাভূমি ছিল। যে সকল জমি চাষকরা হয়না, অথবা যে সকল জমিতে শস্যাদি উৎপন্ন হয় না, নোয়াখালীতে সেই সকল জমিকে "খিল" জমি বলে, বোধ হয় ইহাই খিলপাড়া নামের ব্যুৎপত্তি। পাড়া শব্দের অর্থ পল্লী। কবিরত্ন নারায়ণ সর্ব্বপ্রথমে এই জলাভূমি ও বিল আবাদ করিয়া তাহাকে মনুষ্য বাসের যোগ্য করেন। তাঁহার বংশধরগণ অতি প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ইঁহারা অনেক ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া খিলপাড়া গ্রামে স্থাপিত করেন। এই বংশের শুবনারায়ণ চৌধুরী এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, আজও তাহা "শুবনারায়ণের দিঘী" নামে অভিহিত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে চৌধুরীদের বড় বাড়ীতে যে কাত্যায়নী দেবীর মূর্ত্তি আছে তাহা 'কাত্যায়নী' নামক দিঘী হইতে উদ্ভূত। এই বংশের জগচ্চন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর আমলে সদর খাজানার দায়ে ভুলুয়ার জমিদারী নিলাম হইয়া যায়। কবিরত্ন নারায়ণের প্রথম পুত্র

রামচন্দ্র বর্ত্তমান সোনাইমুড়ী রেল ষ্টেসনের ২ মাইল পশ্চিমে সিমুলিয়া নামক গ্রামে প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করেন।

কুলকল্যাণবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ এই দেশে বিশেষ সম্মানিত। এই বংশীয় ব্রাহ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—হাজরা, ওঝার ও পণ্ডিতবর; ওঝার বংশোদ্ভব খিলপাড়ার স্বনাম প্রসিদ্ধ ৺ গোলকচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পরিবার, ৺রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর পরিবার, ৺উদয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পরিবার ও ৺ দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তীর পরিবার বিশেষ সম্মানিত। হাজরা বংশোদ্ভব অনেক পরিবার খিলপাড়ায় বাস করিতেছেন। খিলপাড়া ও তৎসন্নিহিত শ্রীফলতলার ভট্টাচার্য্য পরিবারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইহারা পণ্ডিতবরের বংশ সম্ভূত ও সম্মানিত; যে সকল প্রাচীন পণ্ডিতগণ অসাধারণ প্রতিভাবলে সুধীসমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এস্থলে তাঁহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

খিলপাড়ার প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিতপ্রবর ৺ রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার মহাশয় অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া স্বর্গধামে গিয়াছেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংস্কৃত চর্চ্চা দ্বারা আপনার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছেন। তিনি অনেক সংস্কৃত পাঠার্থী ছাত্রগণকে নিকটে রাখিয়া অতীব যত্নের সহিত সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন এবং তাহাতে বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার বহুছাত্র আজ পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীফলতলার ভট্টাচার্য্য পরিবারের প্রাচীন খ্যাতনামা পণ্ডিত ৺ শম্ভুনাথ শিরোমণি মহাশয় আপনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া সুধী সমাজে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় পুত্রশোক জনিত দারুণ কষ্টে ভগ্ন স্বাস্থ্য হওয়ায় তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারেন নাই; তাঁহার পুত্র-রত্ন তীক্ষ্ণ মেধাবী, প্রসিদ্ধ তার্কিক, প্রতিভা শালী—পণ্ডিত ৺ হরনাথ তর্কচূড়ামণি মহাশয় পণ্ডিত সমাজে গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপ হইতে উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাঁহার অকাল মৃত্যু ঘটে; তিনি অতিশয় বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন; তেজস্বিতা, গুণগ্রাহিতা ও অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন; বাস্তবিক তাঁহার অকাল মৃত্যু এই পরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে শোক-শেল বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত খ্যাতনামা পণ্ডিত ৺ গৌরীনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে পণ্ডিত সমাজে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। ১২৩৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন; এবং দীর্ঘ ৮৫ বৎসরকাল সুস্থদেহে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপ হইতে উপাধি লাভ করিয়া, সংস্কৃত শিক্ষার্থিগণের জন্য চতুষ্পাঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বিদেশীয় বহু ছাত্রকে অত্যন্ত যত্ন-সহকারে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। শেষ জীবনেও তিনি শাস্ত্রানুশীলন হইতে কখনও বিরত হন নাই।

খিলপাড়ার খ্যাতনামা প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ন্যায়ভূষণ মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে প্রায় অশীতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন; কিন্তু তথাপিও তাঁহার অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা এখনও

পূর্ব্ববৎ প্রতিভাত হইতেছে। জগদীশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের সমাজ ও দেশের হিতার্থে বহু সংস্কৃত পাঠার্থী ছাত্রকে আজ পর্য্যন্তও তিনি নিকটে রাখিয়া, অত্যন্ত যত্ন-সহকারে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার এবম্বিধ উৎসাহ উদ্যম ও অদম্য শাস্ত্রানুরাগ বিশেষ আনন্দের বিষয়; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়—যে সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় এ গ্রামের অতীত গৌরব উজ্জ্বল হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা ক্রমেই নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে। যদি প্রত্যেক পরিবারস্থ অন্ততঃ একটী বালকও সংস্কৃত অধ্যয়নে মনোযোগী হয় তবে সম্ভবতঃ পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় অসাধারণ ধীশক্তি বলে, সুধী সমাজে বরণীয় হইয়াছেন। আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর কালাবধি তিনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে কার্য্য করিয়া পণ্ডিত সমাজে অশেষ গৌরব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতাশক্তি অত্যন্ত প্রশংসনীয়; বর্ত্তমান সময় তিনি কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

সর্ব্ববিদ্যা ঠাকুরবংশের উজ্জ্বলতমরত্ন নোয়াখালীর গৌরব, উদারচরিত ঋষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহোদয় খিলপাড়ার অন্তর্গত পূর্ব্ব সোমপাড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে ইঁহার অগাধ জ্ঞান। ইনি সংস্কৃত ভাষায় "রামাভ্যুদয়" "মহাপ্রস্থান" "ঋতু-চিত্র" প্রভৃতি মহাকাব্য গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় ইনি বারাণসীধামে অবস্থান করিতেছেন, তথায় তিনি ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের অন্তর্গত সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে ও হিন্দু কলেজে অধ্যাপক স্বরূপ—ছাত্রগণকে সংস্কৃত শিক্ষা দান করিতেছেন।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে খিলপাড়া গ্রাম বিশেষ উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী উচ্চশিক্ষার গৌরব স্থল; তিনি এক্ষণে ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ডিপুটীর কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নে, স্থানীয় ধনবানগণের সাহায্যে এবং গ্রামবাসিগণের উৎসাহে, এই গ্রামে "খিলপাড়া হাইস্কুল" নামে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; ইহা আরও গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে যে, এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ, মহোদয় এই গ্রামবাসী। তিনি স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক নিজ গ্রামের উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে এ গ্রামের প্রায় ১৫ জন ছাত্র আই, এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছে। প্রায় ২০।২৫ জন মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভবিষ্যতে গ্রামের উচ্চ শিক্ষিতগণের দ্বারা বিদ্যালয় পরিচালিত হইলে, তাহা নিতান্ত আনন্দের বিষয় হইবে।

চৌধুরী পরিবারস্থ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ নারায়ণ চৌধুরী গবর্ণমেণ্টের ফরেষ্ট বিভাগে বহুদিন কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময় তিনি চট্টগ্রাম জিলায় উক্ত পদে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিয়েট্ অফিসে কতিপয় বৎসর যাবৎ বিশেষ কার্য্য কুশলতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এবম্বিধ কার্য্যদক্ষতা ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ। বর্ত্তমান সময় তিনি কার্য্যোপলক্ষে রাঁচিতে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি ব্যবসায় উপলক্ষে নাগপুরে (বি, এন্, আর) অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অদম্য অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রশংসনীয়; চাকুরী জীবনে তিনি অনেক সময় নানাপ্রকার বাধা, বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছেন। জগদীশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার অপরিসীম সহিষ্ণুতাবলে বর্ত্তমান কর্ম্মজীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছেন।

এই গ্রামে নারিকেল ও সুপারি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয় বটে; কি চাষের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি কিছুমাত্র অবলম্বিত হয় না; কাজেই তাহার কোনও উন্নতি সাধিত হইতেছে না। যদিও এস্থানে ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি যথেষ্ট রহিয়াছে কিন্তু উন্নত প্রণালী অভাবে ধান্য ও রবিশস্য আশানুরূপ উৎপন্ন হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

লেখকগণের প্রতি নিবেদন।

প্রথম সংখ্যার "নোয়াখালীতে" ভূমিকায় আমরা আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছি। লেখকগণের নিকট হইতে আমরা কিরূপ প্রবন্ধ প্রত্যাশাকরি, তাহাও আমরা প্রকাশ করিয়াছি। আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের অভাব নাই। আমাদের দেশের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসের কাহিনীও প্রচুর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা ও বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনার প্রয়াস কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে আশানুরূপ লক্ষিত হইতেছে না। লেখক মহোদয় গণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া বোধ হয় না। সেইজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট নিম্নলিখিত নিবেদন উপস্থিত করিতেছি। আশাকরি তাঁহারা ইহা অগ্রাহ্য করিবেন না। কোন প্রকার অপ্রীতিকর সমালোচনায় আমাদের অভিরুচি নাই। আমরা পাণ্ডিত্যের স্পর্দ্ধা করিনা অতএব আমরা যাহা বলিব, তাহাকে যেন কেহ সংশোধনের চেষ্টা মনে না করেন: পরন্তু তাহা সবিনয় অনুরোধ মাত্র। আশাকরি লেখকগণ তাহা রক্ষা করিবেন।

"নোয়াখালী" ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ইহাকে কেহ যেন সাধারণ মাসিক পত্রিকার মত মনে করিয়া ভুল না করেন। আমরা ইহাতে গল্প অথবা কবিতা প্রকাশ করিতে বড় ইচ্ছা করিনা। তবে যদি নোয়াখালীর প্রাচীন কাহিনী (যেমন "চৌধুরীর লড়াই") অথবা প্রবাদ বাক্য কিম্বা পুরাতন মঠ, দীর্ঘিকা অথবা দেবদেবী মূর্ত্তি প্রভৃতি অবলম্বনে কোন গল্প রচিত হয়, তবে তাহা অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। সাধারণ কবিতা দীর্ঘ না হইলেই ভাল। গল্প ও কবিতাকে আমরা সাহিত্যের বিলাস সামগ্রী বলিয়া মনে করি। তদপেক্ষা আরও অধিক

প্রয়োজনীয় বিষয় যখন রহিয়াছে, তখন লেখকগণের লক্ষ্য গল্প ও কবিতায় নিবদ্ধ থাকুক, এরূপ আমরা ইচ্ছা করিনা। এস্থলে আমরা কতগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিব; তৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের সাধারণ ব্যক্তিগণও নানা প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। অতীত ইতিহাস সংগ্রহ করা অবশ্য কোন কোন স্থলে পরিশ্রম সাধ্য হইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের যাহা অবস্থা সে বিষয়ে ত সকলেই লিখিতে পারেন। নোয়াখালী জেলার প্রধান প্রধান বাজার গুলির বিবরণ (যেমন চন্দ্রগঞ্জ, চৌমুহণী,—সোনাপুর ভবানীগঞ্জ, পরশুরাম ইত্যাদি); সম্ভ্রান্ত তালুকদারগণের বংশপরিচয় ও কীর্ত্তি কাহিনী (যেমন বাবুপুর, দত্তপাড়া, খিলপাড়ার চৌধুরীবংশ, সাহাপুর ও শ্রীরামপুরের, গুহ-রাজা বংশ, পুকুরদিয়ার বসু, রায়পুরের মিঞা ও দালাল বাজারের রায় পরিবার ইত্যাদি) মুসলমান্ ফকীর, হিন্দু সন্ন্যাসী, দরগা পীরস্থান প্রভৃতির বিবরণ; বর্ত্তমান সময়ে বাণিজ্য ব্যবসার অবস্থা; নোয়াখালী জেলার বনজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের নাম, ছুতার মিস্ত্রিদের কার্য্যের উপযোগী নানাপ্রকার কাষ্ঠ ও তাহাদের গুণাগুণ, ঘরদরজা নির্ম্মাণ, পুকুর খাল কাটান, মাছ-ধরা, প্রভৃতি কার্য্যের কৌশল প্রণালী, গ্রাম্য পূজাপার্ব্বণ, আমোদ প্রমোদের বিবরণ, সামাজিক আচার ব্যবহারের দোষগুণ মূলক সমালোচনা, কবি-ওয়ালাদের রচিত গান ও তাহাদের জীবনী, মাঝি মাল্লা, কামার-কুমার, যুগী-জোলা, প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের জীবন যাত্রা প্রণালীর বর্ণনা; এই সকল বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া কত প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে। অবশ্য এই সকল বিষয় সমস্তই নোয়াখালী সম্বন্ধীয় হওয়া চাই ও তাহাতে নোয়াখালীর বিশেষত্ব পরিস্ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এত প্রয়োজনীয় বিষয় ও এত কাজের কথা থাকিতে যদি পুরাতন মামুলী ধরণের ভাব বিহীন কবিতায় ও চুট্‌কী গল্পে আমাদের পত্রিকার পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে হয় তবে এমন দুর্দ্দিনে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে "নোয়াখালীর" উদ্ভব না হইলেই ভাল ছিল। কেহ কেহ হয়ত মনে করেন সাহিত্যচর্চ্চা করিলে দরিদ্রতা আসে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা সাহিত্য চর্চ্চা নহে, সুতরাং ভীত হইবার কোন কারণ নাই। কেহ বা মনে করেন "ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার প্রয়োজন কি" তাহাদিগকে বলি এত "বনের মহিষ" নহে—এ যে "ঘরেরই মহিষ"। সুতরাং তাহা তাড়াইবার চেষ্টা করিতেই হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী একজন যুবক বন্ধুকে একদিন বলিলাম—"আপনাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী বাজারটী সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখুন না"। কি কি বিষয়ে লিখিতে হইবে তাহা বিস্তারিত ভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি হাসিয়া অম্লান বদনে উত্তর করিলেন "আমি ত এ সব কিছুই জানিনা"। অথচ তাঁহার বাড়ী হইতে এই বিখ্যাত বৃহৎ বাজার তিন চারি দণ্ডের পথ মাত্র। বুঝিলাম এই রকম অজ্ঞানতা আমাদের শিক্ষিত পরিবারের ঘরে ঘরে রহিয়াছে। সেই অজ্ঞান মহিষকেই তাড়াইতে হইবে। আমার পূর্ব্ব-কথিত বন্ধু যদি দুদিন পরে ওকালতীতে বসিয়া পসার জমাইতে না পারেন, তবে ত তাহা বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় হইবে না।

এ স্থলে দেশের প্রধান গৌরব উকীল মোক্তার মহোদয়গণের নিকট কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সকলেই প্রায় উকীল, তাঁহারাই দেশের নায়ক; কারণ সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাঁহাদের কারবার। যে কলমের খোঁচায় রামের জমি শ্যামের হইয়া যায়, সেই কলম সাহিত্য ভূমি স্পর্শ করিতে চাহেনা, যে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় বিচারকের মাথা ঘুরিয়া যায়, সেই বুদ্ধি প্রবাহ সাহিত্য ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করেনা। উকীলগণ সাধারণতঃ সাহিত্যের আসরে নামিতে ভয় করেন; মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত প্রভৃতি উকীল কবিগণের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইতিহাস চর্চ্চার অপরাধে 'পসার'-স্বর্গ-ভ্রষ্ট অক্ষয়কুমার ও নিখিল নাথ কমলার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন! চিত্তরঞ্জন ও প্রমথ নাথের মস্তকের উপর লক্ষ্মীর অভিসম্পাত সংহার-খড়্গের মত দোদুল্যমান! এই সকল সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমরা যে ইতিহাস সংগ্রহের সংকল্প করিয়াছি, তাহাতে বিসার্চ্চের প্রয়োজন নাই, পুরাণো ভিটে মাটী খুঁড়িতেও হইবে না, ইম্পীরিয়েল লাইব্রেরীর পুস্তকের গাদায় দিন রাত্রি ডুবিয়া থাকিবার দরকারও নাই, যিনি যাহা দেখিয়াছেন বা দেখিতেছেন যিনি যাহা শুনিয়াছেন বা শুনিতেছেন, যিনি যেই ব্যাপারে বা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তিনি তাহাই শুধু লিখিবেন। সমাজ অথবা সংসারে কেহই ত আর চোখ-কান বুজিয়া চলেন না। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে নানাভাবে ও বিভিন্ন অবস্থায় আলাপ ব্যবহার ও কাজ কর্ম্ম করিয়া উকীলগণ অভিজ্ঞ হইয়াছেন, দেশের খবর তাঁহারা যত জানেন, এত আর কেহই জানেনা। তাঁহারা সমাজের নাড়ী নক্ষত্র সব বুঝিয়াছেন। এমতাবস্থায় তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা আমাদিগের এই সংকল্প সাধনের সাহায্য অধিক পরিমাণে দাবী করিতে পারি। দেশের সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ অন্য কেহ লিখিতে গেলে, একটুখানি কষ্ট করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া যোগাড় যন্ত্র করিয়া লিখিতে হয়; কিন্তু উকীলগণ তাঁহাদের দৃষ্টি প্রভাবে সমস্তই নখদর্পণে দেখিতেছেন, সুতরাং তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, তবে অল্পায়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যে নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে অনেক লিখিতে পারেন। আমরা ভাষার বাহাদুরী, অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, বর্ণনার বাড়াবাড়ি ব্যাকরণের কড়াকড়ি, এ সব কিছুই চাহিনা। সাদাসিদে ঘটনা ও স্বাধীন মত; এই আমরা চাই। দেশের সম্বন্ধে প্রত্যেকের যে খণ্ড-জ্ঞান আছে আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া সংযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি।

যাঁহারা লেখিকা, তাঁহাদের নিকটও আমাদের একটী নিবেদন আছে। লেখিকা-গণের সাধারণতঃ কবিতার দিকেই ঝোঁক দেখিতে পাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা কবিতার তত পক্ষপাতী নহি। নোয়াখালী জেলার বিবাহাদিতে স্ত্রী-আচার, মেয়েলী-ব্রত, ছড়া ও গান, পরিবেশন প্রণালী, রন্ধন, পারিবারিক ব্যবস্থার দোষগুণ বিচার ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ সকলই আমরা তাঁহাদের নিকট বিশেষ ভাবে প্রত্যাশা করি।

সর্ব্বশেষে আমরা আর একটী বিষয় নিবেদন করিতেছি। কোন বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ উপস্থিত হইলে আমরা উভয় পক্ষের প্রবন্ধই প্রকাশিত করিব। কিন্তু সকলেই মনে রাখিবেন বিতর্কের উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধান। অতএব তাহাতে যেন সংযমের অভাব ও জিগীষার ভাব লক্ষিত না হয়।

আশা করি আমাদের এই নিবেদন পত্র ও বিনীত অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না। ইতি।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

সিদ্ধার্থ ও হংস।

বসন্ত প্রভাতে একদা কুমার ভ্রমিছে প্রমোদ-কাননে।
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী তুলিয়া কাকলি চলিছে প্রফুল্ল আননে।
'চ'খের নিমেষে কোথা হ'তে শর বিঁধিল এ হংসের বক্ষে?'
লুটায়ে পড়িতে উঠা'ল কুমার তারে, স্নেহ সজল চক্ষে।
যতনে তীরটি লইল খুলি, বুলা'ল হাতটি ক্ষত স্থানে।
চির সুখী রাজার কুমার দুখ কারে কহে সেও না জানে!
বিঁধিয়া তীর আপন কায়ে, বুঝিল কুমার দুখের স্বাদ।
শুভ্র হংসের শুভ্র বক্ষে রক্ত দাগ! প্রাণে বাজিল বিষাদ।

দৌড়ে এসে প্রবেশিল ঐ দেবদত্ত—পাখীর শীকার করি,
"ফিরা'য়ে দেও পাখী, শর মোর বিঁধেছে ওর বক্ষ বিদারি।"
বক্ষে তুলি হংসে, কহেন কুমার করুণা কোমল পরাণে,
"দয়া ও প্রেম হ'তে হিংসা কভু নহে শ্রেষ্ঠ নিখিল ভুবনে!"

শ্রীনিরুপমা দেবী।

১৩১৬ সনে 'প্রবাসী'তে "সিদ্ধার্থ ও হংস" এই চিত্র দর্শনে লিখিত।

পরিশিষ্ট।

আমাদের বিগত সংখ্যায় কলিকাতাস্থ নোয়াখালী সম্মিলনীর শিল্প বিভাগের পুরস্কারের তালিকায় শ্রীযুক্তা হেমলতা মিত্রের নাম দ্বিতীয় পুরস্কার-প্রাপিকার নামে মুদ্রিত করিয়াছি, বস্তুতঃ উহা প্রথম পুরস্কারের তালিকায় ঘোষণা করা উচিত ছিল।

* * *

আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "নূতন ও পুরাতনের সামঞ্জস্য" শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাস মহাশয়ের "পতুর্গীজ অধঃপতন" শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা" শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত দাস মহাশয়ের "মেঘনা ভীষণতা" ও নোয়াখালী সম্মিলনী দুর্ভিক্ষ কমিটির সেক্রেটারী হইতে দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের হিসাব ও রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানাভাবে মুদ্রিত করিতে পরিলাম না। আগামীবারে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

* * *

আগামী সংখ্যার জন্য যাঁহারা প্রবন্ধাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠের পূর্ব্বে প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন।

* * *

আমরা আগামী সংখ্যায় নোয়াখালীর স্বনামধন্য ৺সুধারাম মজুমদার মহাশয়ের জীবনচরিত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। উক্ত জীবনচরিত সম্বন্ধীয় কোনও প্রবন্ধ কিম্বা আবশ্যক সংবাদ আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব।
